রবীন্দ্রসংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন

রবীন্দ্রসংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন

ডঃ দেবজ্যোতি দত্ত মজুমদার

সাহিত্যলোক
৩২/৭ বিডন স্ট্রীট। কলকাতা ৭০০ ০০৬

Rabindra-Sangeeter Kramabikash O Bibartan
by Dr. Debajyoti Dutta Majumdar

প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৩৯৪ । ডিসেম্বর ১৯৮৭

প্রকাশক : শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ
সাহিত্যলোক । ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট । কলকাতা ৬

প্রচ্ছদ : শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রক : শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ
বঙ্গবাণী প্রিন্টার্স । ৫৭-এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন । কলকাতা ৬

সংগীতপ্রেমী ও রবীন্দ্রসংগীত-সন্ধিৎসু
জনসাধারণের উদ্দেশে—

ভূমিকা

রবীন্দ্রসংগীত জীবন এবং যৌবনের সংগীত। যখন যৌবন ছিল, জীবনে স্বাদ ছিল, সাধ ছিল তখন রবীন্দ্রসংগীত শুনতে পাইনি। আজ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে আকাশবাণীর দৌলতে দিনমান যা শুনছি, তখন শুনলে তা দৈববাণী না হলেও দিব্যবাণীর মতো শোনাত। কিন্তু রবীন্দ্রসংগীত তখনো আমাদের সংগীত-সমাজে ঠিক জাতে ওঠেনি। সংগীত-কুশলীরা ক্লাসিকেল সংগীতের চর্চা করতেন। ওস্তাদের আসরে নিধুবাবুর টপ্পা ছাড়া আর কোন বাংলা গান বড় একটা কল্কে পেত না। বাংলা গানের আসরে দ্বিজেন্দ্রলাল বা রজনীকান্তর গান যদিবা শোনা যেত রবীন্দ্রসংগীত কদাপি নয়। ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা এবং সামাজিক অনুষ্ঠানাদির বাইরে রবীন্দ্রসংগীতের প্রচলন ছিল না বললেই চলে। রবীন্দ্রসংগীতের অনুশীলন হত একমাত্র শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে। আমাদের ছাত্রজীবনে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর জন্যে অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে শান্তিনিকেতনের দল নিয়ে কখনো কলকাতায় গানের আসর বসাতেন। আমরা টিকিট কেটে সে গান শুনেছি। তাও কালেভদ্রে ঘটত, দৈব ঘটনা বলে মনে হত।

মজার কথা এই যে আমরা যেমন একসময়ে রবীন্দ্রসংগীত শুনবার সুযোগ পাইনি রবীন্দ্রনাথও তেমনি শান্তিনিকেতনের বাইরে নিজের গান খুব একটা শোনেননি। বাঙলা দেশ রবীন্দ্রনাথকে কবি হিসাবেই দেখেছে, সংগীত-রচয়িতা এবং সুরকার হিসাবেও যে তাঁর মস্ত বড় একটা পরিচয় আছে সেটা তার জানা ছিল না। গীতাঞ্জলি গীতিমাল্য গীতালিকে সে কাব্য হিসাবে শিরোধার্য করে নিয়েছে কিন্তু সংগীত হিসাবে কণ্ঠে ধারণ করেনি। ভাবলে দুঃখ হয়, আমরা আজ যে অগণিত কণ্ঠে অবিরাম রবীন্দ্রসংগীত শুনছি রবীন্দ্রনাথ জীবদ্দশায় তা শুনে যাননি। আজ এত যার সমাদর তার অনাদরই দেখে গিয়েছেন। মনে বড় দুঃখ ছিল—এমন গানের ডালি সাজিয়ে দিলাম, বাঙালি তার মর্ম বুঝলে না! বাঙালিকে অতটা অরসিক ভাবতে পারেননি। সেজন্যে গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেছেন আমার এ গানের মধ্যে আমি বাঙালির প্রাণের কথা বলে দিয়েছি, এ গান সে না গেয়ে পারবে না।

রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণে বর্ণে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। অবশ্য এর মধ্যেও একটি মস্ত বড় কৌতুক আছে এবং সে কৌতুকটি বড় মর্মান্তিক। রবীন্দ্রনাথের জীবন অবসান হল আর রবীন্দ্রসংগীতের জয়যাত্রা শুরু হল। মৃত্যুর মাত্র চার মাস পরে কলকাতায় রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষার একটি প্রতিষ্ঠান

স্থাপিত হল। অনতিকাল মধ্যে একের পর আরো কয়েকটি। এখন কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে বহুসংখ্যক রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষার প্রতিষ্ঠান; শিক্ষার্থী-সংখ্যা অগণিত। এ ছাড়া আকাশবাণী পরিচালিত সাপ্তাহিক রবীন্দ্রসংগীত-শিক্ষার আসর। জনপ্রিয়তা দিনে দিনে বাড়ছে—কলকাতা ছাড়িয়ে শহরে গঞ্জে, পশ্চিমবঙ্গের বাইরে অন্যান্য রাজ্যে, বাংলাদেশে, এমনকি সাগরপারে যেখানেই একটি বাঙালিসমাজ গড়ে উঠেছে সেখানেই রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীদের সাদর আহ্বান। রবীন্দ্রনাথ এর কিছুই দেখে যাননি। রবীন্দ্রসংগীত রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে আবিষ্কৃত। কিছুদিন পূর্বে একটি প্রবন্ধে আমি বলেছিলাম রবীন্দ্রসংগীত রবীন্দ্রনাথের 'পস্‌থুমাস চাইল্ড'। এজন্যেই বলছিলাম, রবীন্দ্রসংগীতের ইতিহাসটি বড় করুণ। রবীন্দ্রনাথের গানের কলি মনে পড়ে যায়—'মোর মরণে তোমার হবে জয়'। কথাটি যথার্থই সত্য প্রমাণিত হয়েছে। রবীন্দ্রসংগীতের প্রসার এবং সমাদর দিনে দিনে বাড়ছে।

অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে সংগীতের উৎকর্ষ বিচারে জনপ্রিয়তাই একমাত্র লক্ষণ নয়। সংগীতের একটা শাস্ত্র আছে; সংগীতবিজ্ঞানই বলা যেতে পারে। রাগরাগিণী সম্মত রীতিপদ্ধতি অনুযায়ী যদি উৎকর্ষ প্রমাণিত হয় তাহলেই তা গ্রাহ্য। শাস্ত্রীয় মতে রবীন্দ্রসংগীতের বিচার-বিশ্লেষণ এতকাল হয়নি, তার কারণ সংগীতশাস্ত্রীরা রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে তেমন কৌতূহল বা আগ্রহ প্রকাশ করেননি। সুখের বিষয় ইদানীং এ দিক থেকে কিছু লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। কিছু সংখ্যক সংগীতকুশলী রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে গবেষণামূলক আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। সুলক্ষণ বলতে হবে।

তবে মনে রাখতে হবে যে গবেষণাকার্যেরও গুণভেদ আছে। সংগীত সম্বন্ধে আলোচনা নিতান্ত ভাবোচ্ছ্বাস না হয়ে সংগীতবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিতে হওয়া বাঞ্ছনীয়। সে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সাংগীতিক ঐতিহ্যগত আলোচনা খাঁটি সংগীতশাস্ত্রীর পক্ষেই সম্ভব। বর্তমান গ্রন্থের রচয়িতা শ্রীদেবজ্যোতি দত্ত মজুমদার পশ্চিমবঙ্গের সংগীতসমাজে সুপরিচিত; উচ্চাঙ্গ সংগীতে পারদর্শী। সংগীতের প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগবশত বাল্যাবধি বিভিন্ন সংগীতাচার্যদের কাছে তিনি মার্গ সংগীতে তালিম নিয়েছেন। প্রথম পাঠ গৌরীপুররাজ ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মশায়ের কাছে। পরে একে একে নগেন্দ্রনাথ দত্ত, আগ্রা ঘরানার ওস্তাদ বসির খাঁ সাহেব, স্বনামখ্যাত ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী প্রমুখ প্রথিতযশাদের নিকট তিনি শিক্ষালাভ করেছেন। উচ্চাঙ্গ সংগীতে দেবজ্যোতিবাবুর প্রবেশ সুগভীর; প্রয়াগ সংগীত সমিতি কর্তৃক 'সংগীত প্রভাকর' উপাধিতে ভূষিত।

দেবজ্যোতিবাবুর সংগীতসাধনা অতিশয় ব্যাপক। হিন্দুস্থানী সংগীতে পারদর্শীদের ন্যায় তিনি রবীন্দ্রসংগীতের প্রতি উদাসীন থাকেননি। বরং ভারতীয় সংগীতের বিভিন্ন ধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে বলেই রবীন্দ্র-সংগীত সম্পর্কেও তিনি আগ্রহবোধ করেছেন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষাদাতাদের মধ্যে যিনি আজ শীর্ষস্থানীয় সেই শৈলজারঞ্জন মজুমদার দেবজ্যোতিবাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তাহলেও বলব, দেবজ্যোতিবাবুর রবীন্দ্রসংগীতের প্রতি আগ্রহ নিতান্ত পারিবারিক যোগসূত্রঘটিত ব্যাপার নয়। এটিকে তাঁর ভারতীয় সংগীত পরিক্রমার অঙ্গ হিসাবে গণ্য করাই বিধেয়। কারণ একসময়ে তিনি নিজের আগ্রহেই রবীন্দ্রসংগীতে অন্যতম কীর্তিমান পুরুষ অনাদি দস্তিদারের কাছে রবীন্দ্রসংগীতের অনুশীলন করেছিলেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে অনুজের ন্যায় অগ্রজ শৈলজারঞ্জনের সংগীতশিক্ষার বুনিয়াদ তৈরী হয়েছিল ক্লাসিকেল রীতিতে। উচ্চাঙ্গ সংগীতেই অভ্যস্ত ছিলেন। রবীন্দ্র-সংগীতের প্রতি আসক্তি একান্তভাবেই রুচির তাগিদে, এর অভিনবত্বের আকর্ষণে। দেবজ্যোতিবাবু সম্পর্কেও এ কথাই বলা যেতে পারে।

সংগীত বিষয়ক আলোচনায় সংগীতশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞের জ্ঞান আবশ্যক। শাস্ত্রীয় সংগীতে পারদর্শিতা দৃষ্টে দেবজ্যোতিবাবুকে খুব সঙ্গতভাবেই একজন বিশেষজ্ঞের আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। জ্ঞানে গুণে এরূপ ব্যক্তিকেই সংগীত সম্পর্কে সুচিন্তিত মতামত দানের প্রকৃত অধিকারী বলা চলে। খুব সুখের বিষয় যে একজন খাঁটি বিশেষজ্ঞের দৃষ্টি নিয়ে দেবজ্যোতিবাবু 'রবীন্দ্র-সংগীতের ক্রমবিকাশ এবং বিবর্তন' সম্পর্কে শ্রমসাধ্য গবেষণাকার্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এরূপ একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সংগীতজ্ঞ যখন গবেষণাকার্যে লিপ্ত হন তখন তাঁর সুচিন্তিত আলোচনাকে বিশেষজ্ঞের মতামত হিসাবে গ্রহণ করতে কোন আপত্তি থাকে না। বিশিষ্ট সংগীতশাস্ত্রীদের সপ্রশংস অনুমোদনক্রমে তাঁর ঐ গবেষণামূলক সুদীর্ঘ নিবন্ধের দরুণ দেবজ্যোতিবাবু রবীন্দ্রভারতী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পি-এইচ. ডি ডিগ্রী লাভ করেছেন।

দেবজ্যোতিবাবুর গবেষণা নিবন্ধটি এখন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হল। রবীন্দ্র-সংগীত প্রেমিকদের কাছে এটি একটি সুসংবাদ। রবীন্দ্রসংগীত বিষয়ে আলোচনা গ্রন্থ খুব বেশি নেই। একজন সংগীত-বিজ্ঞানী রচিত বর্তমান গ্রন্থটি এ বিষয়ে একটি প্রামাণিক গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হবে বলে আমার ধারণা। দেবজ্যোতি-বাবু সংগীতবিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনার দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে রবীন্দ্রসংগীত মোটামুটি ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতেরই অনুগামী। রাগরাগিণী প্রয়োগে—মিশ্রণে-বর্জনে—যেখানে রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়তার প্রকাশ সে সম্বন্ধে গ্রন্থকার

চিত্তাকর্ষক আলোচনা করেছেন। বলেছেন, সুর আরোপে রাগরাগিণীর শাস্ত্রীয় রূপ প্রকাশের চাইতে রবীন্দ্রনাথ ভাব প্রকাশের উপরে অধিকতর প্রাধান্য দিয়েছেন। সুরে রসে স্বকীয়তার প্রকাশ পেয়েছে সব চাইতে বেশি সংগীত রচনার শেষ পর্বে, বলা যেতে পারে বিশ্বভারতী পর্বে (১৯২১—৪১)। এটিই শান্তিনিকেতনের সব চাইতে প্রাণচঞ্চল যুগ। সে প্রাণচাঞ্চল্য গানের মধ্য দিয়ে যেমন প্রকাশ পেয়েছে এমন আর কিছুতে নয়। নৃত্যনাট্যের সৃষ্টি হয়েছে, নৃত্যছন্দ গানের ছন্দে প্রবেশ করেছে। দুইয়ের সমন্বয় ঘটেছে। এসব আলোচনায় গ্রন্থকার শুধু সুরকারের নয়, রসকারের পরিচয় দিয়েছেন।

হিন্দুস্থানী সংগীতের মুখে কথা নেই, সে কথা কয় সুরে লয়ে তানে। রবীন্দ্রসংগীত কথা বলে, সুরও ভাঁজে। রবীন্দ্রনাথ কথাকে বলেছেন মুখরা। বলেছেন, মুখরার মন পেতে অনেক সাধ্য সাধনা করতে হয়। ঐ সাধ্য সাধনাটা হল সুরের সাধনা। কথা হল রবীন্দ্রসংগীতের কাব্যাংশ, সুরে তার ব্যঞ্জনা। মনে রাখতে হবে যে কম্পোজার বা সুরকারমাত্রই কবি নন, আবার কবিমাত্রই সুরকার নন। রবীন্দ্রনাথ একাধারে কাব্যস্রষ্টা এবং সুরস্রষ্টা। রবীন্দ্রসংগীতের যথার্থ মর্ম তিনিই বুঝবেন যিনি সংগীতের ভাব এবং সুরের সাযুজ্য উপলব্ধি করবেন। কাব্যরসটুকু সুরের যাদুস্পর্শে অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রসংগীতে কথা ও সুরের সামঞ্জস্য নিয়ে গ্রন্থকার বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সুরের প্রয়োগকৌশলে কাব্যিক রসটি কিভাবে ফুটে উঠেছে দৃষ্টান্ত সহযোগে তা ধরিয়ে দিয়েছেন। রবীন্দ্রসংগীতের এজাতীয় আলোচনা খুব বেশি হয়নি। আমি এটিকে একটি মূল্যবান সংযোজন বলে মনে করি। এজাতীয় আলোচনার যোগ্যতা সকলের কাছে আশা করা যায় না। গ্রন্থকার সে যোগ্যতার দাবি করতে পারেন। দেবজ্যোতিবাবু ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র। দেশী বিদেশী কাব্য-সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে। রবীন্দ্রসংগীতের কাব্যরস স্বভাবতই তাঁকে অভিভূত করেছে। কথা ও সুরের মণিকাঞ্চনযোগে যে রসের সৃষ্টি হয় সেখানেই রবীন্দ্রসংগীতের অভিনবত্ব, সেখানেই তার প্রকৃত মহিমা। এ বিষয়টির প্রতি অর্থাৎ রবীন্দ্রসংগীতের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্যটির প্রতি গ্রন্থকার পাঠকবর্গের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছেন। রবীন্দ্রসংগীতপিপাসু এবং রবীন্দ্রসংগীতশিক্ষার্থীদের পক্ষে গ্রন্থটিকে বিশেষ মূল্যবান বলে আমি মনে করি। গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি।

পূরবী
শান্তিনিকেতন

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

নিবেদন

এই পুস্তকটি আমার রবীন্দ্রসংগীত সম্বন্ধে গবেষণার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। অবশ্য পুস্তক রচনা করার সময় গবেষণাপত্রটিকে নানাভাবে পরিমার্জনা করা হয়েছে। ফলে এটি একটি নূতন সৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে বলা চলে।

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সংগীতসৃষ্টিকে বিশ্লেষণ করা এক দুরূহ কাজ, কারণ বাংলা গানের এমন কোনো বিভাগ বোধহয় নেই যা তাঁর সৃষ্টি ও প্রতিভার যাদুস্পর্শে সমৃদ্ধতর না হয়েছে। এদের ভিতর বিশেষ করে তাঁর রাগাশ্রয়ী গান, লোকসংগীত ও কীর্তনাঙ্গ সুরে গঠিত গানের উপর আলাদাভাবে বিস্তৃত গবেষণা ও পুস্তক রচনার অবকাশও রয়েছে।

আমার এই বইয়ে রবীন্দ্রনাথের গোটা সংগীত সৃষ্টি নিয়ে আলোচনা করতে হয়েছে ও বিষয়টি খুব ব্যাপক (রবীন্দ্রসংগীতের ক্রমবিকাশ) বলে সব বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা সম্ভব হয়নি। কারণ, তা হলে বইটি ভারসাম্য হারিয়ে এক বিশাল কলেবর ধারণ করত। শুধু তাঁর রাগাশ্রয়ী গান সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনার চেষ্টা করেছি ; কারণ, এই ধারার গানে তিনি যে স্বকীয়তা ও মুন্সীয়ানা দেখিয়েছেন তার বোধহয় কোনো তুলনা নেই।

আলোচনার সুবিধার জন্য রবীন্দ্রনাথের সংগীতসৃষ্টিকে কালানুক্রমিক ভাবে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যদিও এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে কবির সংগীতসৃষ্টির বৈশিষ্ট্যকে এই তিন যুগে, ঠিক আলাদা আলাদা ভাবে চিহ্নিত করা যায় না—এক যুগের সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য তাঁর পরের যুগেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছুকাল প্রবহমান ও এক যুগের মধ্যেই তিনি অনেকসময় তাঁর সৃষ্টির বিভিন্নতা বা বৈচিত্র্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। সেজন্যে হয়তো এক যুগের বিশেষ কোনো গানকে অন্য যুগের আলোচনার সময় উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। গানের তালিকা প্রণয়ন করার সময় যে-সব গানে তাঁর বিভিন্ন যুগের উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে, সেইসব গানকেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সেজন্যে এইসব তালিকায় কবির সব গানকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

কবির সৃষ্টির কিছুকাল পর্যন্ত তাঁর গানে রাগ ও তালের উল্লেখ পাওয়া যায় ও সেইসব ক্ষেত্রে তালিকাভুক্ত গানে রাগ ও তালের উল্লেখ করতে কোনো অসুবিধে হয়নি—কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছে কবির পরবর্তী সংগীতসৃষ্টির

বেলায় যেখানে গানে রাগ বা তালের কোনো উল্লেখ নেই। কি কারণে কবি পরবর্তী যুগে তাঁর গানে রাগ ও তালের উল্লেখ করতে চাননি, তা তিনি ইন্দিরা দেবীর কাছে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছিলেন ও সেই কথা এই পুস্তকে যথাস্থানে বলা হয়েছে। এই কারণে তাঁর পরবর্তী যুগের গানের তালিকায় অনেক ক্ষেত্রেই রাগ নির্ণয় বা রাগ নির্দেশ করা সম্ভব হয়নি—তবে চেষ্টা করা হয়েছে যথাসম্ভব ব্যবহৃত তালের উল্লেখ করতে কারণ গানের তাল সম্বন্ধে স্বরবিতান থেকে বা গানটি শুনে একটা ধারণা করা তবুও সম্ভব।

কবির গানে রাগ নির্ণয় বা রাগ নির্দেশ সম্বন্ধে একটা কথা এখানে বলে রাখা আবশ্যক যে, তাঁর প্রায় কোনো গানেই কোনো একটি বিশেষ রাগ অবিমিশ্র-ভাবে প্রযুক্ত হয়নি—ইমন রাগের গানে প্রায় সময়ই শুদ্ধ মধ্যম এসে লেগেছে, বেহাগ রাগের গানে লেগেছে কোমল নিষাদ—ভীমপলশ্রী রাগের গানে এসেছে মুলতান ও পটদীপের ছায়া। তাঁর গানে কাফি ও পিলু বা কানাড়া এবং মল্লার গলাগলি করে এসে মিশে আছে। সেজন্যে তাঁর গানে উল্লিখিত রাগসমূহকে বোধহয় মিশ্র রাগ বলে ধরাই অধিকতর সংগত।

তালিকায় উল্লিখিত গানের তাল নির্ণয়ে 'সুরঙ্গমা রবীন্দ্রসংগীত গবেষণা গ্রন্থমালা'র (২ খণ্ড) সাহায্য নেওয়া হয়েছে। গানগুলির কালানুক্রমিক সূচী তৈরী করার ব্যাপারে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচী' (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) গ্রন্থের উপর নির্ভর করতে হয়েছে। কবির জীবনের ঘটনাপঞ্জী শ্রীযুক্ত সুকুমার সেনের 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড) গ্রন্থের উপব ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। রবীন্দ্র-সংগীতেব ভাঙা ও মূল গানের তথ্যাদি শ্রদ্ধেয়া ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর 'রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীসংগম' গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

এই পুস্তক প্রণয়নে যে যে পুস্তকেব সাহায্য নেওয়া হয়েছে তা এক স্বতন্ত্র তালিকায় উল্লিখিত হয়েছে। তাছাড়া যেখানে যেখানে কোনো পুস্তক থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হয়েছে সেখানে সেই পুস্তকের ও তার রচয়িতার নাম উল্লেখ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

এই গবেষণা ও পুস্তক প্রণয়নে নানাভাবে উপদেশ ও পরামর্শ দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন পরমশ্রদ্ধেয় স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ। বিশ্বভারতীর অধ্যাপক প্রয়াত প্রবোধচন্দ্র সেন ও প্রয়াত অমিয়কুমার সেন যথাক্রমে রবীন্দ্রসংগীতে ছন্দ ও রবীন্দ্রসংগীতে প্রকৃতির প্রভাব সম্বন্ধে নানা মূল্যবান তথ্য দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন। এই পুস্তক প্রকাশকালে এঁদের বিয়োগব্যথা নূতন করে অনুভব করছি। আমার অগ্রজ শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদারের কাছ থেকে রবীন্দ্রসংগীত-

সৃষ্টির শেষ যুগের অনেক মূল্যবান তথ্য পেয়েছি।

এই পুস্তক প্রকাশনার ব্যাপারে আমি বিশেষ সাহায্য পেয়েছি প্রখ্যাত সাংবাদিক-সাহিত্যিক শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী ও দেবী পুস্তকালয়ের স্বত্বাধিকারী শ্রীরমাপ্রসাদ সাহার কাছ থেকে—এ কথা আজ কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি।

সংগীতাচার্য শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র এই গবেষণার ব্যাপারে আমাকে বিশেষভাবে উৎসাহ দিয়ে এসেছেন। বস্তুত তাঁর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা না পেলে আমার পক্ষে এ-কাজ করা কখনই সম্ভব হ'ত না।

এর পাণ্ডুলিপি প্রণয়নে ও গানের তালিকা প্রস্তুত করার কাজে আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে আমার কন্যাদ্বয় শ্রীমতী অনুত্তমা ও শ্রীমতী অনুসংগা (ঝুমা ও বুলু)।

এই বইটির পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত পড়ে এর সূচীপত্র তৈরী করে দিয়েছে আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী নবনীতা ভট্টাচার্য ও এর প্রুফ দেখার কাজে সাহায্য করেছে আমার ছাত্রী অধ্যাপিকা শ্রীমতী নন্দিতা রায়। এদের সংগে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সম্পর্ক নয়।

এই বইটি ছাপার সূচনায় কিছু প্রুফ দেখে ও আমাকে নানাভাবে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগের শ্রীসুবিমল লাহিড়ী। তাঁকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

এই বইয়ের একটি মূল্যবান ভূমিকা লিখে আমাকে বিশেষভাবে অনুগৃহীত করেছেন বিশ্বভারতীর অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত। শিল্পী শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় বইটির প্রচ্ছদপট এঁকে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

শ্রীদাশরথি মুখোপাধ্যায় এই বইয়ের প্রুফ সংশোধনের কাজে সহযোগিতা করে এবং শ্রীঅশোক উপাধ্যায় উল্লিখিত ও আলোচিত গানের তালিকা ও নির্দেশিকা তৈরী করে আমাকে সাহায্য করেছেন।

এরূপ একটি তথ্য, উদ্ধৃতি ও স্বরলিপিবহুল পুস্তকের ছাপার কাজ অত্যন্ত দুরূহ ও কষ্টসাধ্য। সাহিত্যলোকের কর্ণধার শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ এরূপ দুরূহ কাজ সম্পন্ন করতে যে শুধু এগিয়ে এসেছেন তাই নয়, বইটির মুদ্রণকার্য যাতে নির্ভুল ও ত্রুটিশূন্য হয় তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। এজন্যে তিনি বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

এরূপ একটি বিশ্লেষণমূলক ও আকরগ্রন্থে তথ্যের কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি থাকা অসম্ভব নয়। কারণ, অনেকক্ষেত্রেই আমাকে বাধ্য হয়ে অন্যের প্রদত্ত তথ্যের উপর নির্ভর করতে হয়েছে। তবে সহৃদয় পাঠকবর্গের কাছ থেকে এই বিষয়ে সাহায্য ও উপদেশ পেলে পরবর্তী সংস্করণে একে যথাসম্ভব ত্রুটিশূন্য করার চেষ্টা করা হবে।

দেবজ্যোতি দত্ত মজুমদার

সূচীপত্র

রবীন্দ্রসংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন

রবীন্দ্রসংগীত সৃষ্টির তৃতীয় বা শেষ যুগ

সূচনা পর্ব

রবীন্দ্রনাথের যখন সংগীত রচয়িতা হিসেবে আবির্ভাব তখন বাংলা গানের কি অবস্থা ছিল।

কোনো সংগীতজ্ঞ বা সাহিত্যিকের অবদানের যদি সঠিক মূল্যায়ন করতে হয় তখন দেখতে হয় যে সৃষ্টির প্রারম্ভে গান বা সাহিত্যকে তিনি কি অবস্থায় পেয়েছিলেন ও যখন তিনি চলে গেলেন তখন তাকে কি স্তরে এনে দিয়ে গেলেন।

বাংলা গানে রবীন্দ্রনাথের অবদান সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করতে হলে প্রয়োজন সে সময়কার ও ঠিক তার পূর্বেকার বাংলা দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির, বিশেষ করে বাংলা গানের মানের পর্যালোচনা করার।

রবীন্দ্রনাথের জন্ম বৎসর ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দ। তার পূর্বের পাঁচটা বছরকে বলা যেতে পারে বাঙালী ও বাংলা সমাজের পক্ষে মাহেন্দ্রক্ষণ। এই সময়ের মধ্যে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপন, দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্ম প্রচার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ ও স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ক আন্দোলন, নীলকরের হাঙ্গামা সিপাহী বিদ্রোহ, হরিশ মুখার্জীর হিন্দু প্যাট্রিয়েট পত্রিকায় নীলকরের হাঙ্গামা-সম্বন্ধে প্রতিবাদ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অভ্যুদয়, জাতীয় নাট্যশালা স্থাপন ও নাট্য সাহিত্য ও অভিনয়ের মধ্য দিয়ে যুগোচিত প্রতিভার আত্ম প্রকাশের প্রয়াস, কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ ও ব্রাহ্মসমাজে নবশক্তির সঞ্চার—এই ঘটনাগুলো প্রত্যেকটিই বাংলা দেশকে মধ্যযুগীয় মনোভাব থেকে বাইরে আসতে সহায়তা করেছিল। রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবও এই মাহেন্দ্রক্ষণে ও বাংলার নবজন্মের প্রত্যূষে। রবীন্দ্রনাথও বলেছেন: "বাংলা দেশের আধুনিক যুগের যখন সবে আরম্ভকাল তখন আমি জন্মেছি। পুরাতন যুগের আলো তখন ম্লান হয়ে আসছে কিন্তু একেবারে বিলীন হয়নি।"

—রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৪ খণ্ড।

রবীন্দ্রনাথের যখন আবির্ভাব তখন বাঙালীর শিক্ষা ও সংস্কৃতির একটা পালা বদলের যুগ শুরু হয়েছে ও সে পালা বদলকে ভালো করে বুঝতে হলে সেই সময়কার ও ঠিক তার পূর্ববর্তী সময়ে প্রবহমান বাংলার ও বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনের একটু পর্যালোচনা করে নিলে ভালো হবে।

ইংরাজ রাজত্বের সূচনায় আমাদের দেশে সংস্কৃতির নানাবিধ সংকট দেখা দিয়েছিল। আমাদের সংস্কৃতির অনেক উপাদান ও উপকরণই তখন বহু ব্যবহারে জীর্ণ। আবার অনেক চিরন্তন উপাদানও তখন পশ্চিম থেকে আমদানী নতুন সংস্কৃতির জৌলসের প্রভায় ম্লান। তখন এই সংকট মোচনের প্রচেষ্টা দুইভাবে

হয়েছিল। কেউ কেউ এই সংকট মোচনের রাস্তা খুঁজলেন, প্রাচীন সংস্কৃতি ও সংস্কারকে আঁকড়ে ধরেই, আবার কেউ কেউ বিদেশী সংস্কৃতির জোয়ারে গা ভাসিয়ে অতিমাত্রায় নব্যপন্থী· হওয়াটাকেই চরমলক্ষ্য বলে মনে করতে শুরু করলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের যখন আবির্ভাব তখন আমাদের সংস্কৃতির নিত্য উপাদানগুলির সাময়িক পরিবর্তন পরিবর্জন, ও বিদেশী সংস্কৃতির গ্রহণযোগ্য উপাদানগুলির স্বীকরণ দ্বারা সংস্কৃতির একটা নতুন যুগোপযোগী কাঠামো সৃষ্টির প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। ইংরেজ আমল ও ডিরোজিয়ো এদের প্রভাবের ফলে 'যা কিছু ভারতীয় তাই অশ্রদ্ধেয় ও অবজ্ঞেয়' সেই ভাবটা বাঙালীরা অনেকটা কাটিয়ে উঠেছেন। এর মূলে ছিলেন ক্যাপ্টেন উইলার্ড, শৌরীন্দ্রমোহন ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৮৩৮ খ্রীঃ ক্যাপ্টেন উইলার্ড একটি বই লিখে ভারতীয় সংগীতের মধ্যে যে অনেক উৎকৃষ্ট ও মহৎ জিনিষ আছে তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে ভারতীয় সংগীতেও যে ভালো ও গর্ব করবার মতো জিনিষ আছে তা বাঙালীদের মনে অনুভূত হতে থাকে ও মধ্যযুগেব উত্তর ভারতীয় সংগীত অর্থাৎ ধ্রুপদ সঙ্গীতের দিকে সকলের নজর পড়ে। কারণ উইলার্ড সাহেব উত্তর ভারতীয় রাজদরবারের সঙ্গীত সম্বন্ধেই বই লিখেছিলেন।

শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রাচীন সংগীত শাস্ত্র গ্রন্থ পাঠ করে নিজেদের রাগ রাগিণীর রূপগুলির সঠিক ও নতুনভাবে বর্ণনা লিপিবদ্ধ করে রাখার ও তা জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের দিকে দৃষ্টি দেন। তিনি সংগীত বিদ্যালয় স্থাপন করেন, বাংলায় পাশ্চাত্য সংগীত প্রচারে বাধা দেন। ভারতীয় সংগীতের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ইংরেজী প্রবন্ধ ও পুস্তক লিখে পৃথিবীর অন্য দেশে ভারতীয় সংগীতের উৎকর্ষতা ও উৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে প্রচার করেন। আমাদেরও যে সংগীত আছে তা প্রমাণ করবার জন্যে তাঁর গবেষণা যদি তিনি লিপিবদ্ধ করে প্রচার না করতেন তবে বিদেশী সংগীতের বন্যায় বাংলার তথা ভারতীয় সংগীত ভেসে যেতো। সংগীত শাস্ত্র অনুযায়ী প্রাচীন বাদ্য যন্ত্র তৈরী করা আর ভারতীয় সংগীতের ঐতিহ্য পৃথিবীর সংগীত মহলে পরিচিত করার জন্যে তিনি যে পরিশ্রম করেছিলেন তাতে তার তীব্র স্বাদেশিকতা ও ভারতীয় সংগীতের প্রতি অনুরাগের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। তবে শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রচেষ্টাকে 'খানিকটা সংরক্ষণশীল বলা চলে· কারণ তাঁর প্রচেষ্টাটা ছিল মুখ্যতঃ ভারতীয় সংগীতের প্রাচীন ঐতিহ্যকে ধরে রাখা।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতেও ভারতীয় তথা বাংলা গানের পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল—তবে শৌরীন্দ্রমোহনের প্রচেষ্টার সঙ্গে তার একটা মূলগত প্রভেদ ছিল। শৌরীন্দ্রমোহন যেমন আহরণ ও সংরক্ষণের দিকেই আজীবন পরিশ্রম করে গিয়েছিলেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতেও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁর প্রভাবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আহরণ ও সংরক্ষণ ছাড়াও নতুন

সৃষ্টি করার দিকে মনোনিবেশ করেছিলেন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ তো নতুন সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলার সংগীতে এক নতুন ধারাই বইয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে শৌরীন্দ্রমোহনের প্রচেষ্টায় প্রধানতঃ ধ্রুপদেরই প্রসার লাভ করে ও সেই সময় অভিজাত ক্ল্যাসিকাল গান চর্চা করার একটা রেওয়াজ তৎকালীন রাজা জমিদারদের মধ্যে খুব চালু ছিল ও মেটিয়াবুরুজে নির্বাসিত অযোধ্যার নবাবের উপস্থিতি এই বিষয়ে আরো সহাযতা করেছিল। তবে শুধু অভিজাত ক্ল্যাসিক্যাল সংগীতের চর্চার জন্যে তখন বাংলা গানকে কিছুটা অবজ্ঞার চোখেই দেখা হোতো ও কিছুটা ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে ও কিছুটা ক্ল্যাসিক্যাল সংগীতের কৌলিন্যের দাপটে বাংলা গান তখন কিছুটা কোণঠাসা হযে পড়েছিল।

তখনকার প্রচলিত বাংলা গান যথা কীর্তন, শ্যামা সংগীত, বাউল গান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল সহরাঞ্চল থেকে পল্লী অঞ্চলে নির্বাসিত। অল্প সংখ্যক ধর্মমূলক গান ছাড়া ভদ্র সমাজে গাইবার মতো বাংলা গান তখন ছিল না বললেই চলে। বালক বয়সে রবীন্দ্রনাথকে কি ধরনের বাংলা গান শিখতে হয়েছিল তার কিছু বর্ণনা তিনি ছেলেবেলাকার কাহিনীতে দিয়েছেন। কিশোরী চাটুজ্যের কাছে শিখেছিলেন পাঁচালী গান 'ওরে রে লক্ষ্মণ এ কি অলক্ষণ, বিপদ ঘটেছে বিলক্ষণ'। বিষ্ণু চক্রবর্তীর কাছে ব্রহ্ম সংগীত ছাড়া অন্যান্য কিছু বাংলা গান শিখেছিলেন, তার নমুনা হোলো :

'এক যে ছিল বেদের মেয়ে
এল পাড়াতে
সাধের উল্কি পরাতে'

অথবা

'এক যে ছিল কুকুর চাটা শেয়াল কাঁটাবন
কেটে করল সিংহাসন'

সেই সময়কার বাংলা গানের অবস্থা সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিম্নোক্ত উক্তিটি বিশেষ প্রাসঙ্গিক হবে বলে এখানে উদ্ধৃত করা হোলো। এটি তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'গীত সূত্রসার'-এ লিপিবদ্ধ রয়েছে—

"খেয়াল ও ধ্রুপদীর সুরে ঈশ্বর বিষয়ক ব্যতিত অন্যান্য উন্নত বিষয়ে বাংলা গান নাই বলিলেই হয়। এটি আমাদের এক বৃহৎ অভাব রহিয়াছে। এইজন্যে এতদিনেও খেয়াল ধ্রুপদ বাঙালীর জাতীয় সংগীত হইতে পারে নাই। আরও হিন্দী গীতের রচনা প্রায়ই নিকৃষ্ট তাহাতে কবিত্ব অতি অল্প এবং এক গীতের বর্ণিত বিষয় সকল ও শিক্ষিত লোকের রুচির উপযোগী নহে।

অতএব আমাদের কবি ও বাঙালী কলাবত উভয়ে একত্র হইয়া ঐ সকল সুরে সর্বদা ব্যবহার্য নানা বিষয়ে উত্তমোত্তম বাংলা গীত রচনা হওয়া উচিত। তাহা হইলে ঐ সকল সুরের প্রতি সর্বসাধারণের আস্থা ও প্রবৃত্তি হইয়া দেশময় বিশুদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞানের বিস্তার নিবন্ধন জাতীয় সভ্যতার উন্নতি হইবে।"

এই সময়ে অনাদৃত বাংলা গানের প্রতি আধুনিক শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ হলো 'সংগীত প্রভাকর' পত্রিকায় লিখিত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কয়েকটি রচনা থেকে। বাংলা গানের প্রতি শিক্ষিত সমাজকে তিনিই প্রথম সচেতন করে তুললেন। তাছাড়া এহেন অবস্থা থেকে বাংলা গানের যে পুনরুজ্জীবন ঘটলো তার মূলে ছিল প্রধানতঃ তিনটি কারণ :

প্রথমতঃ আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার পর সমাজের উপাসনা এবং অনুষ্ঠানাদির জন্যে ব্রহ্মসংগীত রচনার তাগিদ আসে। ঠাকুর পরিবারের অনেকেই এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথও তাঁর অগ্রজদের সঙ্গে এই কাজে হাত দিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় কারণ হলো, জাতীয় জাগরণের উপলক্ষে জাতীয় উদ্দীপনার জন্যে স্বদেশী গান রচনা করার প্রয়োজন।

আর তৃতীয় কারণ হলো, তখনকার যুগের বাংলা নাটকের জন্যে নাট্য সংগীত রচনা করার প্রয়োজনীয়তা।

উনিশ শতকে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার পর সমাজের উপাসনায় সংগীত যখন অচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে ওঠে তখন রবীন্দ্রনাথের অগ্রজরা, বিশেষ করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ব্রহ্মসংগীত রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। সেই সময় ব্রহ্মসংগীত রচনায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বিখ্যাত হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ গানগুলোর, বিশেষ করে ধ্রুপদ গানের কথাগুলো বদল করে সুর ও ছন্দ বজায় রেখে তাতে উপাসনার উপযোগী কথা বসিয়ে ব্রহ্মসংগীত রচনা করেছিলেন। খেয়াল ও টপ্পা পদ্ধতির কিছু গান ব্রহ্মসংগীতে ব্যবহৃত হলেও প্রথম দিকে ধ্রুপদকে অবলম্বন করেই ব্রাহ্ম সমাজের সব গান রচিত হয়েছিল ও এই ধারার গানকে রবীন্দ্রনাথ একটি সার্থক পর্যায়ে নিয়ে যান।

সেই শতকে নাটক করার দিকে অনেকেই মনোযোগী হয়ে নাট্য সংগীতের অভাব লক্ষ্য করেন। সেই অভাব মোচনের জন্যে নাটকের গান ও পদ্য রচনা করা আরম্ভ হয় ও নাটকের জন্যে হালকা চালের গান রচনা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়, কেননা ধ্রুপদ খেয়ালের ভিত্তিতে রচিত গান জনসাধারণ পছন্দ করত না। তাছাড়া বেঠকী গানে তান ও বাটের কাজের আধিক্য থাকায় তা নাটকে ব্যবহার করা সম্ভব হোতো না। কাজেই সেই সব গান ভেঙ্গে ছোট করে নতুন গান রচনা আরম্ভ হয় ও সেই উপলক্ষে টপ্পার তান বাদ দিয়ে হাল্কা ছন্দে ও ঢংএ অনেক গান রচিত হয়। এই ধারার গান সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের অগ্রজদের বিশেষ করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিশেষ অবদান ছিল। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ 'বাল্মিকী প্রতিভা', 'কালমৃগয়া', 'মায়ার খেলা' প্রভৃতি গীতিনাট্য রচনা করে নাট্য সংগীতকে এক বিশেষ রূপ দান করেন।

হিন্দুমেলার জন্মকাল থেকে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ী বিবিধ সংস্কৃতির চর্চা এবং জাতীয় জাগরণের একটি প্রধান কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

শিশু বয়সে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অগ্রজদের উৎসাহে হিন্দুমেলা এবং সঞ্জীবনী

সভার অধিবেশনে সক্রিয় ভাবে যোগদান করেছিলেন। এ যুগে যদিও রবীন্দ্রনাথ প্রকৃত স্বদেশী সংগীত রচনা করেন নি তবু অগ্রজদের রচনার সুরটি তাঁর মনে গেঁথে গিয়েছিল। হিন্দুমেলার জন্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ রচনা করেন 'মলিন মুখ চন্দ্রমা ভারত তোমারি', সত্যেন্দ্রনাথ লিখলেন 'মিলে সবে ভারত সন্তান', গগনেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'লজ্জায় ভারতযশ গাহিব কি করে'। হিন্দুমেলার জন্যে অবশ্য রবীন্দ্রনাথ কোন স্বদেশী গান রচনা করেননি, তবু সেই যুগে তাঁর রচিত একটি গানকে স্বদেশী সংগীত আখ্যা দেওয়া হয়েছে, সেটি হলো জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পুরু বিক্রম নাটকে ব্যবহৃত 'জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ' গানটি। তবে মনে হয় রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম স্বদেশী সংগীত হলো 'তোমারি তরে মা সঁপিনু এ দেহ' যা প্রকাশিত হয়েছিল খুব সম্ভবতঃ ১২৮৪ সনে ভারতী পত্রিকায়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা বোঝা যায় যে রবীন্দ্রনাথের যখন আবির্ভাব তখন বাংলা গান রচনার একটা পালা বদলের যুগ শুরু হয়েছে। বাংলা গানের প্রতি বাঙালী জনসাধারণের আস্থা অনেকটা ফিরে এসেছে। বাংলা গান মানেই অবজ্ঞেয় কিছু এই ভাবটা দূর হচ্ছে। সমাজে উপাসনার জন্যে ভালো ধর্মমূলক গান ও বাংলা নাটকের জন্য উপযুক্ত বাংলা গানের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। হিন্দু মেলাকে কেন্দ্র করে জাতীয়-সঙ্গীত রচনার তোড়জোড় চলছে। সর্বত্র একটা রব উঠেছে 'বাংলা গানে নূতন সৃষ্টি চাই' ও সেই দাবীর সঙ্গে সুর মিলিয়ে তাঁর গ্রন্থ গীতসূত্রসারে শ্রীকৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখলেন:

"সুর রচকগণ গানের সুর বসাইবার সময় তাহার ভাবার্থের প্রতি কখনো মনোযোগ করেন না এবং রাগ রাগিণীর অবলম্বন ভিন্ন গীতে সুর বসাইবার প্রথা না থাকাতে প্রায়ই গানের প্রয়োজনীয় রসের যথোচিত বিকাশ হয় না।...হিন্দুস্থানী সঙ্গীতবিৎ কলাবিৎগণের এই সংস্কার বদ্ধমূল যে রাগরাগিণীর পুরাতন স্বরবিন্যাস ব্যতীত সংগীত উত্তম হইতে পারে না। সেই জন্যেই ওস্তাদী রাগ-রাগিণী ছাড়া নূতনতর স্বরযোজনা করার প্রথা নাই। আসল কথা এই যে কলাবতী সংগীত রচয়িতাদের মধ্যে তেমন প্রতিভাসম্পন্ন স্বর কবি কেহ জন্মান নাই, যিনি রাগ-রাগিণী ব্যতীত রসভাবে পূর্ণ নূতনতর স্বর যোজনা করিতে পারেন।"

মনে হয় যেন শ্রীকৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বর্ণিত এই অভাব মোচনের জন্যেই স্বর কবি রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। তারপর তিনি তাঁর একক প্রচেষ্টায় বাংলা গানের এই দৈন্য দূর করে তাকে সমৃদ্ধির কোন উচ্চশিখরে পৌঁছে দিয়ে গেছেন তার ইতিহাস বোধহয় অনেকের জানা আছে।

২

সংগীত সৃষ্টিতে কবির পূর্বসূরী অর্থাৎ শ্রীধর কথক, নিধুবাবু, লালন ফকীর, রাজা রামমোহন রায়, ও বাংলা দেশে প্রচলিত বিভিন্ন ধারার গানের, বিশেষ করে কীর্তন ও বাউল সংগীতের প্রভাব।

রবীন্দ্রনাথের সংগীত (সৃষ্টি) মানস গঠনে তিনটি ধারা বিশেষভাবে কার্যকরী হয়েছিল এবং সে কটি ধারা হলো অভিজাত ক্ল্যাসিক্যাল সংগীত। বাংলাদেশে প্রচলিত নানা ধারার সংগীত, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ও বিদেশী সংগীত।

রবীন্দ্রনাথ ভারতের অন্যান্য প্রদেশে প্রচলিত কিছু গান ভেঙ্গে ছিলেন যথা, সরলাদেবীর সাহায্যে মহিশূরী গান ভেঙ্গে 'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে', শিখ ভজন 'বাদে বাদে রম্যবীণা' বা 'গগনোমে থাল' ভেঙ্গে বাংলা গান। কিছু কানাড়ী ভাঙ্গা গান ও সাবিত্রীদেবী কৃষ্ণাণের মুখ থেকে কিছু মাদ্রাজী গান শুনে তা ভেঙ্গে বাংলা গান রচনা করেছিলেন। বিলাতী গান ভেঙ্গে তাদের সুরের আদর্শে কিছু গান রচনা করেছিলেন ও তা ব্যবহার করেছিলেন তাঁর প্রথমদিককার রচনা 'বাল্মিকী প্রতিভা' ও 'কালমৃগয়া' নাটকে। কিন্তু ক্ল্যাসিক্যাল সংগীত, বাংলার প্রখ্যাত সংগীত রচয়িতাদের রচনা ও বাংলাদেশে প্রচলিত নানা সংগীতের ধারার তুলনায় উপরোক্ত দুই ধারার সংগীতের প্রভাব নগণ্য বললেই চলে।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের সংগীত সৃষ্টিতে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রভাব খুব প্রবল ও তার প্রথম যুগের রচিত ব্রহ্ম সংগীতগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয় কোনো হিন্দুস্থানী গান ভেঙ্গে বা হিন্দুস্থানী গানের আদর্শে রচিত হয়েছে। এই ধারার গানের প্রভাব তাঁর গানে কতোখানি রয়েছে তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী রচিত 'রবীন্দ্রসংগীতে ত্রিবেণী সঙ্গম' বইখানা পড়লেই বোঝা যাবে। রবীন্দ্রসংগীতের উপরে এই ধারার গানের প্রভাব সম্বন্ধে যথাস্থানে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা যাবে।

এবার আমরা আলোচনা করব রবীন্দ্রনাথের সংগীতমানস গঠনে তাঁর পূর্বসূরী অর্থাৎ বাংলা গান রচয়িতা নিধুবাবু শ্রীধর কথক, দাশরথি রায়, কবিওয়ালা রামরাম বসু এদের প্রভাব সম্বন্ধে।

ভারতবর্ষের যে আদর্শ ও সংস্কৃতি তাকে সারা পৃথিবীতে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে তাকে পুনরুদ্ধার করতে হলে যে আমাদের মুখ পল্লীর দিকে ফেরাতে হবে সেইটুকু বুঝতে রবীন্দ্রনাথের বেশী সময় লাগেনি। সুতরাং সর্বসাধারণের বিশেষ করে সমাজের উপরতলায় যাদের স্থান তাদের মনকে লোকসংগীতের দিকে ফেরাবার প্রয়োজন অনুভব করে তিনি বাংলাদেশে প্রচলিত নানা লোক সংগীত সংগ্রহের চেষ্টা করেন ও শুধু নতুন সৃষ্টিই নয় বাংলাদেশে অবহেলিত লুপ্ত প্রায় বিভিন্ন ধারার সংগীতের পুনরুদ্ধারও তার আর এক কীর্তি। এই

কাজকে তিনি কতোখানি গুরুত্ব দিয়েছিলেন তা রবীন্দ্র-সংগীতজ্ঞ শ্রীযুক্ত অনাদিকুমার দস্তিদারকে লেখা একখানা চিঠি পড়লেই বোঝা যাবে। সেই চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, "স্বরলিপি যদি তোমার আয়ত্ত হয় তা হলে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ থেকে লৌকিক সংগীত তুমি সংগ্রহ করে আনতে পারবে। সেই একটি মস্ত বড় কাজ আমাদের সামনে রয়েছে। এই কাজের ভার তুমি নেবে বলে সংকল্প কর।" কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে শ্রীযুক্ত অনাদি দস্তিদার পারিবারিক ও ব্যক্তিগত কারণে শান্তিনিকেতন থেকে কোলকাতা চলে আসায় এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি তাঁর পক্ষে করা সম্ভবপর হয়নি।

বৈচিত্র্যময় অনেক কিছুকে আত্মস্থ করে বাংলার সংগীত নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এসে রবীন্দ্রনাথে একটা পরিণত রূপ গ্রহণ করেছিল। রবীন্দ্রনাথের সংগীত মানস গঠনে ও রবীন্দ্র সংগীতের ক্রমবিকাশে বাঙালীর নিজস্ব গীত সম্পদ যথা তর্জা, পাঁচালী, যাত্রা, কবিগান, কথকতা, আখড়াই গান প্রভৃতির প্রভাব যথেষ্ট রয়েছে। রবীন্দ্রনাথও বলেছেন : "নদীমাতৃক বাংলাদেশের প্রাঙ্গণে যেমন ছোট বড় নদী নানা স্রোতের জালে বিছিয়ে দিয়েছে তেমনি বয়েছিল গানের স্রোত নানা ধারায়। বাঙালীর হৃদয়ে সে রসের দৌত্য করেছে নানা রূপ ধরে। যাত্রা, পাঁচালী, কথকতা, কবির গান, কীর্তন মুখরিত করে রেখেছিল সমস্ত দেশকে। লোকসংগীতের এতো বৈচিত্র্য আর কোনো দেশে আছে কিনা জানিনে।"

—সংগীত, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৪ খণ্ড।

রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে কবি তাঁর অনুচর কিশোরী চাটুজ্যের কাছ থেকে কতকগুলো পাঁচালী গান শিখেছিলেন। দাশরথি রায় ছাড়াও পাঁচালী গানের পরিচয় তিনি পান কিশোরী চাটুজ্যের কাছ থেকে। এই বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতি গ্রন্থে এইভাবে বর্ণনা করেছেন : "সন্ধ্যাবেলায় রেড়ির তেলের ভাঙা সেজের চারদিকে আমাদের বসাইয়া সে (ঈশ্বর নামে এক ভৃত্য) রামায়ণ মহাভারত শোনাইত। চাকরদের মধ্যে আরো দুই চারিটি শ্রোতা আসিয়া জুটিত···এদিকে রাত হইতেছে আমাদের জাগরণকালের মেয়াদ ফুরাইয়া আসিতেছে।

পরিণামের অনেক বাকী। এ হেন সংকটের সময় হঠাৎ আমাদের পিতার অনুচর কিশোরী চাটুজ্যে আসিয়া দাশু রায়ের পাঁচালী গাহিয়া অতি দ্রুত গতিতে বাকি অংশটুকু পূরণ করিয়া গেল ; কৃত্তিবাসের সরল পয়ারের মৃদুমন্দ কলধ্বনি কোথায় বিলুপ্ত হইল—অনুপ্রাসের ঝকমকি ও ঝঙ্কারে আমরা একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম।"

অন্যত্র বলেছেন : "সেই কিশোরীর কাছে অনেকগুলি পাঁচালীর গান শিখিয়াছিলাম 'ওরে ভাই জানকীরে দিয়ে এসো বন, প্রাণ ত অন্ত হল আমার কমল আঁখি, রাঙা জবায় কী শোভা পায় পায়, কাতরে রেখো রাঙা পায়, মা অভয়ে ভাবো শ্রীকান্ত নরকান্তকারীরে নিতান্ত কৃতান্ত ভাবান্ত হবে ভবে'—এই

গানগুলিতে আমাদের আসর যেমন জমিয়া উঠিত এমন সূর্যের অগ্নি উচ্ছ্বাস বা মণির চন্দ্রময়তার আলোচনায় হইত না।"

এই সব পাঁচালী গান ছাড়াও নিধুবাবু, শ্রীধর কথক, কবিওয়ালা রামরাম বসু প্রমুখ গুণীদের গানও তিনি পছন্দ করতেন ও গাইতেনও। তাঁর প্রথম দিককার রচিত কিছু প্রেম সংগীতে নিধুবাবুর বৈঠকী গানের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। রামরাম বসুর 'মনে রইল সই মনের বেদনা' ও শ্রীধর কথকের 'ভালো বাসিবে বলে ভালো বাসিনে', গানগুলো তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের বন্ধু অক্ষয় চৌধুরীর কাছ থেকেও তিনি কিছু বাংলাদেশের বিচিত্র ও উদ্ভট গান শুনেছিলেন ও সংগ্রহ করেছিলেন।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে কথকতার যথেষ্ট সমাদর ছিল। এমনকি বাঁধা মাহিনার কথকও নিযুক্ত ছিল। বাড়ীর এই প্রভাব রবীন্দ্রনাথের উপরে পড়া খুব অস্বাভাবিক নয়। রবীন্দ্রনাথও বলেছেন: "কথকতা যেন অলঙ্কার শাস্ত্রমতে ন্যারেটিভ শ্রেণীভুক্ত। তার কাঠামো গদ্যের হলেও স্ত্রী-স্বাধীনতা যুগের মেয়েদের মতোই গীতকলা তার মধ্যে অনায়াসেই অসঙ্কোচে প্রবেশ করত। মনে তো পড়ে একদিন তাতে মুগ্ধ হয়েছিলুম।"

—সংগীত, রবীন্দ্র রচনাবলী ১৩ খণ্ড।

এ ছাড়া আরো দুটি ধারার বাংলা গান তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল ও সেগুলো হলো যথাক্রমে বাউল ও কীর্তন গান।

শিলাইদহে থাকাকালীন কবির সুযোগ হয়েছিল বাউল লালন ফকীর, গগন হরকরা, ফিকির চাঁদ এদের সঙ্গে ও এদের গানের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার। বাউলরা অত্যন্ত সহজ ভাষায় ও সুরে ধর্মের অত্যন্ত গূঢ় কথা প্রকাশ করে থাকেন ও এই ধারার গান রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। এই বাউল গান সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "একবার যদি বাউলের সুরগুলি আলোচনা করিয়া দেখিত দেখিতে পাইব যে তাহাতে আমাদের সংগীতের মূল আদর্শটা বজায় আছে অথচ সে সুরগুলো স্বাধীন।"

ক্ষণে ক্ষণে এ রাগিণী ও রাগিণীর আভাস পাই, কিন্তু ধরিতে পারা যায় না। অনেক কীর্তন ও বাউলের সুর বৈঠকী গানের একেবারে গা ঘেঁসিয়া গিয়াও তাকে স্পর্শ করে না। ওস্তাদের আইন অনুসারে এটা অপরাধ। কিন্তু বাউলের সুর যে একঘরে। রাগ-রাগিণী যতই চোখ রাঙাক সে কিসের কেয়ার করে।"

—সংগীত, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৪ খণ্ড।

"বাউলের গান শিলাইদহে খাঁটি বাউলের মুখে শুনেছি ও তাদের পুরাতন খাতা দেখেছি। নিঃসংশয়ে জানি বাউল সংগীতের একটা বিশিষ্টতা আছে যা চিরকালের আধুনিক।…আমার অনেক গান বাউল ছাঁচের। কিন্তু জাল করতেও চেষ্টা করিনি। সেগুলো স্পষ্টতর রবীন্দ্রবাউলের রচনা।"

—মুহম্মদ মনসুরুদ্দিন, হারামণি, পরিশিষ্ট।

উপরোক্ত লেখা থেকেই বোঝা যাবে যে বাউল গান ও বাউল ধর্ম রবীন্দ্রনাথকে কতোখানি গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল, যার জন্যে তিনি নিজেকে 'রবীন্দ্রবাউল' বলে পরিচয় দিতেও কুণ্ঠিত হননি। তিনি তাঁর অনেক নাটকে বাউলের বিশেষ ভূমিকা আরোপ করেছিলেন ও সেই সব ভূমিকায় নিজে অভিনয় করে গিয়েছেন। তাঁর সৃষ্ট সঙ্গীতের ভাণ্ডারে বাউল গানের সংখ্যাও নিতান্ত নগণ্য নয়। তবে অন্যান্য ধারার বাংলা গানের মতো বাউল গানেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৃষ্টির শেষ যুগে একটা স্বকীয়তা এনেছিলেন ও সেটা রবীন্দ্র সঙ্গীতের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আলোচনার সময় বিশেষ ভাবে প্রকাশ পাবে।

বাংলাদেশের কীর্তনগানও কবিকে বিশেষ ভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল। তাঁর প্রথম বয়সের রচনা 'ভানুসিংহের পদাবলী' কীর্তনেরই নামান্তর—তা বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাবে রচিত।

কীর্তন গান বহু কাল আগে থেকেই বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল কিন্তু জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সমবেতভাবে কীর্তন গানের প্রবর্তন করেন প্রভু শ্রীচৈতন্য এবং প্রভু নিত্যানন্দ। এ সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

"চৈতন্য যখন পথে বাহির হইলেন তখন বাংলাদেশের গানের সুর পর্যন্ত ফিরিয়া গেল। তখন এককণ্ঠ বিহারী বৈঠকী সুরগুলো কোথায় ভাসিয়া গেল। তখন সহস্র হৃদয়ের তরঙ্গ হিল্লোলে সহস্র কণ্ঠ উচ্ছ্বসিত করিয়া নূতন সুরে আকাশ ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। তখন রাগরাগিণী ঘর ছাড়িয়া পথে বাহির হইল, এক জনকে ছাড়িয়া সহস্র জনকে বরণ করিল। বিশ্বকে পাগল করিবার জন্য কীর্তন বলিয়া এক নূতন কীর্তন উঠিল। যেমন ভাব তেমনি তাহার কণ্ঠস্বর—অশ্রুজলে ভাসাইয়া সমস্ত একাকার করিবার জন্য ক্রন্দন ধ্বনি—বিজন কক্ষে বসিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া একটি মাত্র বিরহিণীর বৈঠকী কান্না নয়, প্রেমে আকুল হইয়া নীলাকাশের তলে দাড়াইয়া সমস্ত বিশ্ব জগতের ক্রন্দনধ্বনি।" (রবীন্দ্র সাহিত্যে পদাবলীর স্থান—ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার।)

জনসাধারণের কাছে কীর্তনের উপরোক্ত আবেদন ছাড়াও কীর্তনের অন্য যে দিকটি তাকে সবচেয়ে বেশী আকৃষ্ট করেছিল সে হচ্ছে তার সুরে এবং কথায় সম্মিলিত 'অর্ধ নারীশ্বর রূপ' এই সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন :

"বাণীর প্রতি বাঙালীর অন্তরের টান। সেজন্যে ভারতের মাঝে এই প্রদেশই বাণীর সাধনা সবচেয়ে বেশী করেছে। কিন্তু বাণীর মধ্যে তো মানুষের প্রকাশের সম্পূর্ণতা হয় না, এই জন্য বাংলাদেশে সংগীতের স্বতন্ত্র পংক্তি নয়। বাণীর পাশেই তার আসন।" এর প্রমাণ স্বরূপ তিনি কীর্তনের উল্লেখ করেছেন। বলেছেন : "কীর্তন অপরূপ সংগীত, যুগল ভাবে গড়া, পদের সঙ্গে মিলন হয় তবেই এর সার্থকতা। পদাবলীর সঙ্গে তার রাসলীলা, স্বাতন্ত্র্য সে সইতে পারে না।"

রবীন্দ্রনাথের উপর মধুকান বা মধুসূদন কিন্নর, শিবু কীর্তনিয়া এদের

বিশেষ প্রভাব ছিল। বাংলা দেশে প্রচলিত কীর্তনের পাশাপাশি ঢপ কীর্তন নামে কীর্তনের আর একটি ধারার সৃষ্টি হয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই কীর্তনের ধারার প্রবর্তক ছিলেন যশোরের মধুসূদন কিন্নর বা মধুকান। ছিন্ন পত্রাবলীতে তাঁর বাল্যকালে এই ধারার গান শোনার অভিজ্ঞতা এই ভাবে বর্ণিত হয়েছে, "সেজদাদাদের ঘরে তোষাখানা ছিল এবং চিন্তা বলে একটা চাকর শীতকালের সকালে গুন গুন স্বরে গান করতে করতে কয়লার আগুনে জ্যোতিদাদার জন্যে মাখন দিয়ে রুটি তোষ করত—তখন আমাদের গরমকাপড় ছিল না এবং একখানা কামিজ পরে সেই আগুনের কাছে বসে শীত নিবারণ করতুম এবং সেই সশব্দ বিগলিত নবনী সুগন্ধি রুটি খণ্ডের ওপোর লুব্ধ দুরাশা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চুপ করে বসে চিন্তার গান শুনতাম। সে সুরটা এখনো মনে আছে, তাকে মধুকানের সুর বলে।"

রবীন্দ্রনাথ পদাবলী ও ঢপ উভয়ের মিশ্রণে তাঁর কীর্তন গীতশৈলীর সৃষ্টি করেন। তার রচিত কীর্তন প্রকৃতির গান পদাবলী এবং ঢপ কীর্তন—এই দুটো শ্রেণীর কীর্তনের মাঝামাঝি শৈলী। পরিবেশনের দিক থেকে ঢপ কীর্তনের সহজ সরল রীতিকেই তিনি গ্রহণ করেছিলেন।

অবশ্য শেষ যুগে তিনি কীর্তন ও বাউলের এক মিলিত মিশ্র ও মৌলিক রূপের সৃষ্টি করেন এবং কীর্তন গান নয় এমন সব গানে কীর্তনে প্রযুক্ত অলঙ্করণের প্রয়োগ করেন।

এইবার আমরা আলোচনা করবো সংগীতজ্ঞ রবীন্দ্রনাথের উপর সংগীত রচয়িতা রাজা রামমোহন রায়ের প্রভাব সম্বন্ধে। এই প্রভাবটা প্রত্যক্ষভাবে না পড়লেও পরোক্ষভাবে এর গুরুত্ব কম নয়।

রাজা রামমোহনকে যুগপ্রবর্তক ও ভারত পথিক বলা হয়ে থাকে। তাঁর বহুবিধ কর্মধারা সম্বন্ধে নানা স্থানে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে, কিন্তু তাঁর বিপুল কর্মযজ্ঞের অন্তরালে তাঁর জীবনের আর একটি দিক ও অবদান অনেকটা উপেক্ষিত হয়ে আছে, সেটা হলো তার সংগীত সৃষ্টির দিক। অথচ রাগ সংগীতের উপর ভিত্তি করে ব্রহ্ম সংগীত রচনা ও প্রবর্তনের প্রধান কৃতিত্ব হলো রাজা রামমোহন রায়ের। এজন্য তাকে ভারতীয় অন্যান্য সংস্কৃতির সঙ্গে সংগীতের ক্ষেত্রেও যুগপ্রবর্তক বলা যেতে পারে।

রাজা রামমোহন তৎকালীন প্রচলিত ধ্রুপদ পদ্ধতির সংগীতকে নূতন রূপ দান করে সমাজের বিশেষ স্তরে প্রবাহিত হতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন। তিনি ভারতীয় রাগ রাগিণীর সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচয় লাভ করে ও তার রূপায়ণে দক্ষতা অর্জন করে রাগভিত্তিক বাংলা গান রচনা শুরু করেন। প্রথম আত্মীয় পরিজনদের গৃহে ও পরে ব্রাহ্মসমাজ গৃহে গুণী সংগীতজ্ঞদের দ্বারা নিয়মিত সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এর সুফল কিন্তু পরবর্তীকালে খুব ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারীরূপে দেখা দিল। ব্রাহ্ম সমাজের প্রার্থনা

অনুষ্ঠানের সঙ্গে সংগীত বিশেষ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হয়ে রইল ও এর জন্যে সংগীত ব্রাহ্মসমাজের সব অধিবেশনেরই একটা প্রধান আকর্ষণ হয়ে দাঁড়াল। এই সংগীতের আকর্ষণেই অনেকে ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত শুরু করলেন ও তা ব্রাহ্মধর্ম প্রসারে বিশেষ সহায়ক হয়ে দাঁড়াল।

ব্রাহ্মসমাজে রামমোহন যে ব্রাহ্মধর্মাশ্রয়ী রাগভিত্তিক গানের প্রবর্তন করলেন তার প্রধান ধারক ও বাহক হয়ে দাঁড়ালেন বিষ্ণু চক্রবর্তী। তাঁর সঙ্গে আদি ব্রাহ্মসমাজের অত্যন্ত নিবিড় সম্পর্ক ছিল ও তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন এই সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ ছিল। তিনি আজীবন ব্রাহ্মসমাজের সব অধিবেশনে উপস্থিত থেকে সংগীত পরিবেশন করে গেছেন। ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে এই সুদীর্ঘ পরিচয় ও সহযোগিতার ফলে বিষ্ণুচরণ হয়ে দাড়ান ব্রাহ্মসমাজের প্রাচীন যুগের সঙ্গে নবীন যুগের মহান সেতুস্বরূপ।

তাঁরই প্রচেষ্টায় রামমোহন প্রবর্তিত রাগভিত্তিক ব্রাহ্মসংগীত আধুনিক কালের সঙ্গে যুক্ত হলো। এই দুই যুগের মধ্যে সংযোগ বিধান করে বিষ্ণুচরণ সংগীতের ক্ষেত্রে যে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করলেন, তার দুই প্রান্তে দুই মহান যুগ পুরুষ। এক প্রান্তে ভারত পথিক রাজা রামমোহন, অন্যপ্রান্তে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। বিষ্ণুচরণের মাধ্যমে রামমোহনের সাঙ্গীতিক ঐতিহ্য রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত পৌঁছে গেল।

৩

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতমানস গঠনে তার পারিবারিক আবহাওয়ার প্রভাব

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ঠাকুরবাড়ী বাংলাদেশের শিক্ষা সংস্কৃতির এব পীঠস্থানে পরিণত হয়েছিল। এই ঠাকুরবাড়ীর আবার দুটি ধারা ছিল। একটি ধারার ধারক ও বাহক ছিলেন পাথুরীয়াঘাটার শৌরীন্দ্রমোহন ও যতীন্দ্র-মোহন ঠাকুর। আর এক ধারার ধারক ও বাহক ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সেই যুগে ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে যখন যা কিছু ভারতীয়, তাই অপাঙ্‌ক্তেয় এরূপ একটা ভ্রান্ত ধারণা শিক্ষিত যুব সমাজের মধ্যে এসে গিয়েছিল। তখন তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠলেন শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর। তিনি বই লিখে এর প্রতিবাদ করলেন ও জনমানসে ভারতীয় শিক্ষা সংস্কৃতিতে ভারতীয় সংগীতের যে একটা বিরাট অবদান ও স্থান আছে তা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করলেন। বস্তুতঃ পাথুরীয়াঘাটার ঠাকুরবাড়ীর সংস্কৃতিমূলক আলোচনার ধারা ছিল প্রধানতঃ সংরক্ষণশীল—অর্থাৎ যা কিছু ভারতীয় তাই ভালো ও তাকেই সংরক্ষণ করতে হবে এইরূপ মনোভাবই প্রাধান্য লাভ করেছিল। কিন্তু ঠাকুর-

বাড়ীর সংস্কৃতিমূলক আন্দোলনের ধারাটা ছিল একটু ভিন্নমুখী। ভারতীয় শিক্ষা সংস্কৃতির যা কিছু ভালো তা সংরক্ষণ করার সঙ্গে সঙ্গে ভালো ভালো নতুন জিনিষ তা ইংরেজী বা বিদেশী সাহিত্য সংস্কৃতিই হোক তা গ্রহণ করার তাঁরা পক্ষপাতী ছিলেন। এই বিষয়ে তাঁরা ভারতীয় নব্যযুগের স্রষ্টা রাজা রামমোহন রায়ের যোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন। এই ধারার প্রধান প্রবক্তা ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁরই প্রভাবে ও প্রচেষ্টায় জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ী তখন বাঙ্গালীদের নবজাগরণের একটি উৎস বা কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছিল। এই বিষয়ে ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন: "ঠাকুরবাড়ীকে কেন্দ্র করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাংলাদেশের আচার ব্যবহার জীবনাদর্শ সাহিত্য, সঙ্গীত এবং শিল্প-কলা নবীন প্রেরণায় বিচিত্রভাবে পল্লবিত এবং পুষ্পিত হইয়াছিল। ঠাকুরবাড়ীর প্রতিভা শুধু বাংলাদেশের নহে, ভারতবর্ষেরও জাতীয় সংস্কৃতির ও সৌন্দর্য-বোধের উদ্বোধনে অপরিসীম সহায়তা করিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলাদেশের শিক্ষিত চিত্তে যে জাতীয়তাবোধের ও স্বাদেশিকতার উদ্দীপনা জাগিয়াছিল তার মূলেও জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর প্রেরণা অল্প ছিল না।"

রবীন্দ্রনাথও বলেছেন: "পিতৃদেব মেজদাদা ছাড়া আর কাউকে বাড়ীর বাইরে পড়তে পাঠাননি। তিনি আমাদের বাড়ীটাকেই একটা যথার্থ বিদ্যালয় বানিয়ে তুললেন। যদিও দ্বারকানাথের ঐশ্বর্য আমাদের পরিবারে আর রহিল না। তবু পিতৃদেব সাংসারিক সব ব্যয় যথাসম্ভব সংকুচিত করে জ্ঞানী ও গুণীদের জন্যে দ্বার উন্মুক্ত করে রাখলেন। নিত্য তাদের সমাগমে এই বাড়ীর আবহাওয়া চিন্ময় হয়ে উঠলো। সাহিত্য সঙ্গীত অভিনয় কলা বিদ্যা সব কিছু শিক্ষার আয়োজন আমাদের বাড়ীতেই ছিল।

—অনুলেখন, ক্ষিতিমোহন সেন, রবীন্দ্রন থেব শিক্ষামন্দির।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুত্র-কন্যারা প্রায় সকলেই সাহিত্য, সংগীত, দর্শন, শিল্পকলা ইত্যাদি নানা বিষয়ে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, মহর্ষির ভাইয়েরাও এই বিষয়ে যোগ্য অংশীদার ছিলেন। এই সাংস্কৃতিক পরিবেশে লালিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ তার অসাধারণ প্রতিভা ও গ্রহণ করবার ক্ষমতার জোরে উত্তরকালে সংগীত ও সাহিত্যে এতটা পারদর্শী হয়ে ওঠেন। পিতৃ-পিতৃব্যের সাহিত্য ও সংগীতপ্রীতি অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর স্রোতোধারার মতো পুত্রদের শিল্পী ও সাহিত্যিক মনের অভ্যন্তরে প্রবাহিত হয়েছিল এবং পরে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথে এসে সাগর থেকে মহাসাগরে রূপান্তরিত হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের সংগীত সৃষ্টির মানস গঠনে পরিবারের যে তিনজন পুরুষ সব চেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তাঁরা হলেন—পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। এখন তাঁদের প্রভাব সমন্ধে একে একে আলোচনা করছি।

রবীন্দ্রনাথ যে যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই যুগে পরিবারের বড়দের সাথে ছোটদের অবাধ মেলামেশার রেওয়াজ ছিল না সেজন্যে পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পুত্র-কন্যাদের মেলামেশার মধ্যে একটা ব্যবধান ছিল। কিন্তু এই ব্যবধানটা অনেকাংশে দূর হয়েছিল কনিষ্ঠপুত্র রবীন্দ্রনাথের বেলায়। তাঁর ভাইয়েদের মধ্যে তিনিই বোধহয় সবচেয়ে বেশী পিতার সাহচর্য পেয়েছিলেন ও এই জন্যে পিতার নানাবিধ গুণাবলী তাঁর মধ্যে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় লিখেছেন : "আমরা সমুদ্রতীরে থাকতুম এবং তাঁকে (পিতাকে) সেই সমুদ্রতীরের অস্তোন্মুখ সূর্যের মতো বোধ হতো। আমি কিছুদিন তাঁর বৃহজ্জীবনের সাগর থেকে কতকটা যেন মহত্ত্ব সঞ্চয় করতে পেরেছি।"

—রবীন্দ্রজীবনী, প্রথম খণ্ড, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

মহর্ষি ছিলেন সংগীতের একান্ত অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক। তাঁর অদম্য উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ী সংগীত চর্চার একটা শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল এবং তার প্রভাব রবীন্দ্রনাথের সংগীতমানস গঠনে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশের বিখ্যাত সংগীত শিল্পীরা ঠাকুরবাড়ীর সংগীত আসরে যোগদান করতেন। এছাড়া বাংলাদেশের বিখ্যাত গায়ক বিষ্ণু চক্রবর্তী, যদুভট্ট, রাধিকা গোস্বামী, শ্যামসুন্দর মিশ্র জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে নানা সময়ে সংগীত শিক্ষাদান করতেন। বরোদার বিখ্যাত গায়ক মৌলাবক্সও কিছুকাল ঠাকুরবাড়ীতে ছিলেন। আরো একজন মানুষের কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন তিনি হলেন মহর্ষির বন্ধু শ্রীকণ্ঠ সিংহ। তিনি ঠাকুরবাড়ীর ছোট বড় সকলেরই বন্ধু ছিলেন ও খুব একটা বড়ো ওস্তাদ না হলেও তাঁর প্রভাব ঠাকুর বাড়ীর ছেলেমেয়েদের মধ্যে, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই সংগীতপ্রেমী ব্যক্তিটি শুধু দেবেন্দ্র নাথকে নয়, বাড়ীশুদ্ধ সবাইকে সংগীত পরিবেশন করে অপার আনন্দ দান করতেন এবং ঠাকুরবাড়ীতে সব সময় একটা সুরের পরিবেশ সৃষ্টি করে রাখতেন, বালক রবীন্দ্রনাথের উপর শ্রীকণ্ঠ সিংহের প্রভাব পড়েছিল খুব বেশী। তাই তাঁর বিভিন্ন নাটকে নানা বেশে এই বৃদ্ধটির আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায়।

বাড়ীতে সংগীতের সমগ্র পরিবেশ সৃষ্টির মূলে ছিল মহর্ষির অকুণ্ঠ সমর্থন ও অদম্য প্রচেষ্টা। কেবলমাত্র ওস্তাদী সংগীত নয়। অন্যান্য সংগীতের প্রতিও তাঁর অনুরাগ কম ছিল না। যাত্রা, কবিগান, কথকতা, বাউল, কীর্তন ইত্যাদি বিভিন্ন ধারার গান তাঁদের বাড়ীতে বরাবর সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে এসেছে।

মহর্ষি বিভিন্ন শিক্ষার সঙ্গে যেমন সংগীত শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন, তেমনি বাড়ীর কেউ সংগীত রচনায় অথবা সংগীত পরিবেশনায় কোনো কৃতিত্ব দেখাতে সক্ষম হলে তাকে পুরস্কৃত ও উৎসাহিত করতেন। একবার পুত্র রবীন্দ্র-

নাথকে তিনি কিভাবে পুরস্কৃত করেছিলেন তার বর্ণনা কবি এই ভাবে তাঁর 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে দিয়েছেন : "একবার মাঘোৎসবে (মাঘ, ১২৯৩) সকালে ও বিকালে আমি অনেকগুলি গান তৈরী করিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে একটি গান 'নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে'। পিতা তখন চুঁচুড়ায় ছিলেন। সেখানে আমার ও জ্যোতিদাদার ডাক পড়িল। হারমোনিয়ামে জ্যোতি-দাদাকে বসাইয়া আমাকে তিনি নতুন গান সব ক'টি একে একে গাহিতে বলিলেন। কোনো কোনো গান দুবারও গাহিতে হইল।

গান গাওয়া যখন শেষ হইল তখন তিনি বলিলেন, "দেশের রাজা যদি দেশের ভাষা জানিত ও সাহিত্যের আদর বুঝিত কবিকে তো তাহারা পুরস্কার দিত। রাজার দিক হইতে যখন তাহার কোনো সম্ভাবনা নাই তখন আমাকেই সে কাজ করিতে হইবে। এই বলিয়া তিনি একখানি পাঁচশ টাকার চেক্ আমার হাতে দিলেন।"

মেয়েদের বেলাতেও তিনি বরাবর সকলকে উৎসাহিত করতেন ও সরলাদেবীর 'জীবনের ঝরা পাতা' গ্রন্থ থেকে জানিতে পারি যে হাফেজের একটি কবিতায় সুর বসানোর জন্য মহর্ষি তাঁকে হাজার টাকার গয়না দিয়ে উৎসাহিত করেন।

সংগীতে পৃষ্ঠপোষকতা ও গুণগ্রাহিতা ছাড়াও মহর্ষির চরিত্রের আর এক বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি গৃহী হয়েও সন্ন্যাসী ছিলেন ও যদিও তিনি আধ্যাত্মিক উপাসনা এই সব নিয়ে থাকতেন, তাঁর কর্মক্ষমতা ছিল অসাধারণ ও তিনি তীক্ষ্ণ বিষয় বুদ্ধিরও অধিকারী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ পিতার কাছ থেকে এই দুটি গুণ উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছিলেন। পিতার অধ্যাত্মবাদের প্রভাব তাঁর জীবনে লক্ষ্য করা যায়। তার সঙ্গে পিতার অসাধারণ কর্মদক্ষতাও তিনি পেয়েছিলেন, যার জন্যে 'বিশ্বভারতী' সৃষ্টি ও তার গুরুদায়িত্ব বহন করেও সারাজীবন সাহিত্য ও সংগীতে এতো সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। এই দ্বৈত সত্তার ফলেই তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল একদিকে নিপুণভাবে জমিদারী তদারক করা আর একদিকে সঙ্গে সঙ্গে অনুপম সাহিত্য ও সংগীত সৃষ্টি করা।

সংগীত পরিবেশন ও প্রয়োগ পদ্ধতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের খুঁতখুঁতে স্বভাব ছিল। সেটাও তিনি পিতার কাছ থেকে পেয়েছিলেন। শোনা যায় বাড়ীতে উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে গান বাজনা ইত্যাদির ব্যবস্থা হলে মহর্ষি নিজেই উৎসবের আগে সে সব গান এবং গায়কদের পরীক্ষা করে দেখতেন। এ সম্বন্ধে তাঁর জীবনচরিতকার বলেছেন : "উৎসবের ৪।৫ দিন পূর্ব হইতে যে সব সংগীত সংকীর্তন গীত হইবে মহর্ষির সামনে বসিয়া তাহার তালিম দেওয়া হইত। তাল মান সুর ব্যতিক্রম হওয়ার যো নাই। একটু এদিক ওদিক হইলেই তিনি বিরক্তি প্রকাশ করিতেন ও যে পর্যন্ত তাল মান সব ঠিক না হইত, ছাড়িতেন না। কোনো গানে অভ্যাস পাকা না হইলে সে গানটি উৎসবের দিন গাহিতে নিষেধ করিতেন।"

এবার আমরা আলোচনা করব রবীন্দ্রনাথের উপর তাঁর বড় দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রভাব সম্বন্ধে। দ্বিজেন্দ্রনাথের ক্ষমতা ছিল বহুমুখী। তিনি ছিলেন দর্শন শাস্ত্রের এবং বিজ্ঞানের, বিশেষ করে গণিত শাস্ত্রের একজন অসাধারণ পণ্ডিত ব্যক্তি। তাছাড়া শিল্প, সাহিত্য ইত্যাদির প্রতিও তার প্রবণতা ছিল। গান বাজনায় তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। তিনি বাঁশী অর্গান ইত্যাদি বাজাতে পারতেন। বেশ কিছু ব্রহ্মসংগীতও রচনা করেছিলেন। আকারমাত্রিক স্বরলিপির সূত্রপাত তিনিই করেছিলেন।

বয়সের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রনাথের মধ্যে যথেষ্ট তফাৎ ছিল। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর পুত্রের সমবয়সী। কিন্তু এই অসাধারণ প্রতিভাবান কনিষ্ঠ ভ্রাতার উপর দ্বিজেন্দ্রনাথের বিশেষ স্নেহ ছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ যখন 'স্বপ্ন প্রয়াণ' কাব্য রচনা করেন তখন রবীন্দ্রনাথ নিতান্ত বালক। কিন্তু তখন থেকেই তিনি এই বালকের মধ্যে একটা প্রতিভার স্ফুরণ দেখতে পেয়েছিলেন। তাই তাঁর কাব্যে অন্যান্য গুণবান্ ভাইয়েদের পাশে বালক রবীন্দ্রনাথকে স্থান দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর 'স্বপ্ন প্রয়াণ' কাব্যে তাঁর ভাইয়েদের এইরূপ বর্ণনা দিয়েছেন—

"ভাতে যথা সত্য হেম মাতে যথা বীর
গুণজ্যোতি হরে যেথা মনের তিমির
নব শোভা ধরে যেথা সোম আর রবি
সেই দেব নিকেতন আলো করে কবি"

বড় দাদার কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথ নানা বিষয়ে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "আমার মনে পড়ে ছেলেবেলায় অনেক জিনিষ বুঝি নাই। কিন্তু তাহা আমার অন্তরের মধ্যে খুব একটা নাড়া দিয়েছে। আমার নিতান্ত শিশু বয়সে মূলাজোড়ে গঙ্গার ধারে বাগানে বড়দাদা ছাদের উপর একদিন মেঘদূত আওড়াইতেছিলেন। তাহা আমার বুঝিবার দরকার হয় নাই। বুঝিবার উপায়ও ছিল না। তাহার আনন্দ আবেগপূর্ণ ছন্দ উচ্চারণই আমার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।"

—জীবন স্মৃতি।

তাঁর 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে তিনি বলেছেন, "বড় দাদার কবি কল্পনায় এতো প্রচুর প্রাণশক্তি ছিল যে তাঁহার যতটা আবশ্যক তাহার চেয়ে তিনি ফলাইতেন অনেক বেশী। এই জন্যে তিনি বিস্তর লেখা ফেলিয়া দিতেন· তখনকার এই কাব্য রসের ভোজে আড়াল আবডাল হইতে আমরাও বঞ্চিত হইতাম না। এতো ছড়াছড়ি হইত যে আমাদের মতো প্রসাদ আমরাও পাইতাম।

সাহিত্য ও গীতিকুশলতা এই উভয় ধারার মিলন হয়েছিল মহর্ষির জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের মধ্যে। সাহিত্য এবং সংগীত এই দুটো ধারাকে একই মিলনসূত্রে গেঁথে দ্বিজেন্দ্রনাথ যে নতুন পথের সৃষ্টি করেছিলেন অন্যান্য ভাইয়েদের মতো রবীন্দ্রনাথও সে পথের পথিকৃৎ হয়েছিলেন।

এবার আলোচনা করছি রবীন্দ্রনাথের উপর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রভাব সম্বন্ধে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিঃসংকোচে রবীন্দ্রপ্রতিভা রথের সারথি বলা যেতে পারে। তিনি বালক বয়স থেকে রবীন্দ্রনাথকে শিক্ষা সংস্কৃতির প্রায় সমস্ত বিভাগে বরাবর নিজের সঙ্গে রেখে উৎসাহ দিয়ে, প্রেরণা দিয়ে অনেকটা ঠিক নিজের মতো করে তৈরী করে নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথও মুক্তকণ্ঠে সে কথা স্বীকার করেছেন, "তখন আমার বয়স অল্প। গান গাহিতে আমার কণ্ঠের ক্লান্তি বা বাধামাত্র ছিল না। তখন বাড়ীতে দিনের পর দিন প্রহরের পর প্রহর সংগীতের বিগলিত ঝরণা ঝরিয়া তাহার শীকর বর্ষণে মনের মধ্যে সুরের রামধনুকের রং ছড়াইয়া দিতেছে। তখন নব যৌবনে নবনব উদ্যম নতুন নতুন কৌতুহলের পথ ধরিয়া ধাবিত হইতেছে। তখন সকল জিনিষই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাই, কিছু যে পারিব না এমন মনে হয় না।... সেই দিন এই যে আমার সমস্ত শক্তিকে এমন দুর্গম উৎসাহে দৌড় করাইয়াছিলেন, তাহার সারথি ছিলেন জ্যোতিদাদা।

আর এক জায়গায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "সাহিত্যে, শিক্ষায়, ভাবের চর্চায় বাল্যকাল হইতে জ্যোতিদাদা আমার প্রধান সহায় ছিলেন। তিনি নিজে উৎসাহী ও অন্যকে উৎসাহ দিতে তাহার আনন্দ। আমি অবাধে তাহার সঙ্গে ভাবের ও জ্ঞানের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতাম। তিনি বালক বলিয়া আমাকে অবজ্ঞা করিতেন না—তিনি আমাকে খুব বড়ো রকমের স্বাধীনতা দিয়াছিলেন। তাহার সংস্রবে আমার ভিতরকার সংকোচ ঘুচিয়া গিয়াছিল। জ্যোতিদাদাই সম্পূর্ণ নিঃসংকোচে সমস্ত ভালো মন্দের মধ্য দিয়া আমাকে আমার আত্মোপলব্ধির ক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং তখন হইতেই আমার আপন শক্তি নিজের কাঁটা ও নিজের ফুল বিকাশ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারিয়াছে।" —জীবন স্মৃতি।

একবার জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী' নাটকের জন্যে বালক রবীন্দ্রনাথ একখানা গান লিখে দিয়েছিলেন। গানখানা হল—

"জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ
পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা
জ্বলুক জ্বলুক চিতার আগুন
জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা।"

এই গানখানা রচনা করার সময় রবীন্দ্রনাথের বয়স মাত্র চৌদ্দ বছর। বালক রবীন্দ্রনাথের এই গানখানা রচনা করার পরই তাঁর উপর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দৃষ্টি পড়ল। এই প্রসঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলেছেন, "সরোজিনী প্রকাশের পর হইতেই আমরা রবিকে প্রমোশন দিয়া আমার সমশ্রেণীতে উঠাইয়া লইলাম। তখন হইতে সংগীত ও সাহিত্য চর্চায় আমরা হইলাম তিনজন অক্ষয় (চৌধুরী), রবি ও আমি।"

—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন স্মৃতি।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অনেক সময়ে নাটকের প্রয়োজনে গান রচনা করতেন। এই নাটকের প্রয়োজনেই তিনি সংগীতের মধ্যেও ক্রমে একটা পরিবর্তন ও নূতন কিছু সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে ক্রমে সৃষ্টির নব দ্বার উন্মুক্ত হল। এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "জ্যোতিদাদা তখন প্রত্যহই প্রায় সমস্ত দিন ওস্তাদী গানগুলোকে পিয়ানোর মধ্যে ফেলিয়া তাহাদিগকে যথেচ্ছ মন্থন করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন। তাহাতে ক্ষণে ক্ষণে রাগিণী-গুলোর এক-একটি অপূর্ব মূর্তি ও ভাব ব্যঞ্জনা প্রকাশ পাইত।"

—জীবনস্মৃতি।

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি থেকে সহজেই বোঝা যায় যে সংগীতে নূতন পথের সন্ধানে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর রচিত মানময়ী, পুনর্বসন্ত, বসন্তলীলা, ধ্যানভঙ্গ ইত্যাদি গীতিনাট্যগুলো এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকেই জন্ম নিয়েছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত পথকে অনুসরণ করেই রবীন্দ্রনাথ সংগীতে এত অভিনব সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। বাল্মীকি-প্রতিভা, কালমৃগয়া, মায়ার খেলা, চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা গীতিনাট্য, শ্যামা ইত্যাদি নৃত্যনাট্য ও অন্যান্য বিভিন্ন ঋতুনাট্যের মাধ্যমে সংগীতকে নতুন থেকে নতুনতর একটা পথে নিয়ে গেছেন ও সে পথের সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন তাঁর শিক্ষাগুরু জ্যোতিদাদার কাছ থেকেই।

গোড়ার দিকে অর্থাৎ রবীন্দ্রসংগীত সৃষ্টির প্রথম যুগে রবীন্দ্রনাথ যে-সমস্ত ব্রহ্মসংগীত রচনা করেছেন তাতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ঐ সময়কার গান বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে-সমস্ত রাগ-রাগিণী বা তাল তাঁর গানে বেশি ব্যবহার করেছেন, প্রথম যুগের সৃষ্ট রবীন্দ্র-সংগীতে সেই সব রাগ-রাগিণী ও তাল অধিক ব্যবহৃত হয়েছে। সুর সৃষ্টির দিক দিয়েও উভয়ের প্রয়োগ পদ্ধতির সাদৃশ্য দেখা যায়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রথম সুর সৃষ্টি করতেন, পরে কথা বসাতেন। অবশ্য গোড়ার দিকে রবীন্দ্রনাথ এই ধারায় সংগীত সৃষ্টি করলেও পরবর্তীকালে সুর ও কথা একই সঙ্গে তাঁর কাছে ধরা দিত।

অনেক সময় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রদত্ত সুরে রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয় চৌধুরী কথা বসাতেন। এই তিনজনের একত্র সংগীত রচনার এক কৌতুকপূর্ণ বিবরণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দিয়েছেন:

"এই সময়ে আমি পিয়ানো বাজাইয়া নানাবিধ সুর-রচনা করিতাম। আমার দুই পার্শ্বে অক্ষয়চন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ কাগজ পেনসিল লইয়া বসিতেন। আমি যেমনি একটি সুর-রচনা করিলাম, অমনি ইঁহারা সেই সুরের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ কথা বসাইয়া গান-রচনা করিতে লাগিয়া যাইতেন। একটি নূতন সুর তৈরি হইবা-মাত্র, সেটি আরও কয়েকবার বাজাইয়া ইঁহাদিগকে শুনাইতাম। সেই সময় অক্ষয়-চন্দ্র চক্ষু মুদিয়া বর্মা সিগার টানিতে টানিতে, মনে মনে কথার চিন্তা করিতেন।

পরে যখন তাঁহার নাক মুখ দিয়া অজস্রভাবে ধূমপ্রবাহ বহিত, তখনি বুঝা যাইত যে এইবার তাঁহার মস্তিষ্কের ইঞ্জিন চলিবার উপক্রম করিয়াছে। তিনি অমনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া চুরুটের টুকরাটি, সম্মুখে যাহা পাইতেন এমন কি পিয়ানোর উপরেই, তাড়াতাড়ি রাখিয়া দিয়া হাঁফ ছাড়িয়া 'হয়েছে হয়েছে' বলিতে বলিতে আনন্দদীপ্ত মুখে লিখিতে সুরু করিয়া দিতেন। রবি কিন্তু বরাবর শান্তভাবেই ভাবাবেশে রচনা করিতেন। রবীন্দ্রনাথের চাঞ্চল্য কচিৎ লক্ষিত হইত। অক্ষয়ের যত শীঘ্র হইত, রবির রচনা তত শীঘ্র হইত না। সচরাচর গান বাঁধিয়া তাহাতে সুর সংযোগ করাই প্রচলিত রীতি, কিন্তু আমাদের পদ্ধতি ছিল উল্টা। সুরের অনুরূপ গান তৈরী হইত।"

—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি।

আর একটি বিষয়েও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মিল ছিল। গানে তান ও অলংকারাদির অযথা প্রয়োগে সংগীতের ভাব এবং বাণী, রস ও মাধুর্য নষ্ট করাটা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পছন্দ করতেন না, রবীন্দ্রনাথের মতও ছিল তাই। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এজন্যে ঠাকুরবাড়ির ওস্তাদ বিষ্ণু চক্রবর্তীকে বিশেষ পছন্দ করতেন ও এর কারণ তিনি এইভাবে ব্যক্ত করেছেন: "বিষ্ণুর গানের একটা বিশেষত্ব ছিল। ওস্তাদেরা যেমন রাগিণীতে তান অলঙ্কারেরই প্রাধান্য দেন, বিষ্ণু তেমন কিছু করিতেন না। তিনি অল্প স্বল্প তান দিতেন বটে। কিন্তু তাহাতে রাগিণীর মূল রূপটি বেশ ফুটিয়া উঠিত, গানকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত না। ইহা ছাড়া গানের কথার যে একটা মূল্য আছে, সেটিও বিষ্ণুর গানে পূর্ণ মাত্রায় রক্ষিত হইত।

—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি।

সংগীতের সুর সৃষ্টির ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ মত ছিল। এই মতবাদই তাঁকে তাঁর রাগভিত্তিক গানে হিন্দুস্থানী গানের অতিরিক্ত কিছু অলংকার, যথা তান বাট ইত্যাদি বর্জন করার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। অগ্রজদের, বিশেষ করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রভাবে রবীন্দ্রনাথের সুর-সংযোজনার দক্ষতা পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল: যা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করে বলেছেন: "ইহার পরেই শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথের আমল। তাঁহার অসামান্য কবি প্রতিভা এখন ব্রহ্মসংগীতকে প্রায় পূর্ণতায় পৌঁছাইয়া দিয়াছে। নানা সুর, নানা ভাব, নানা ছন্দ, নানা তাল ব্রহ্মসংগীতে আজ তাঁহারই দেওয়া। তাঁহার বীণা এখনও নীরব হয় নাই।"

—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী কাদম্বরী দেবীও রবীন্দ্রনাথের সংগীত ও সাহিত্য সৃষ্টিতে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তিনি তাঁর এই অসাধারণ প্রতিভাবান তরুণ দেবরটিকে নানা ভাবে, কোনো সময়ে ইচ্ছে করে তাঁর কবিতা ও গানের বিরূপ সমালোচনা করে তাঁর সৃষ্টিকে নানা ভাবে উন্নততর পথে এগিয়ে নিয়ে

যেতে সাহায্য করেছিলেন। তাঁর এই বৌদিদিটির স্নেহ ও মায়ামমতার কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ জীবন অবধি নানা প্রসঙ্গে বারবার উল্লেখ করে গেছেন।

মৈত্রেয়ী দেবী কবির বৃদ্ধ বয়সে তাঁর নিকট থেকে কাদম্বরী দেবী সম্বন্ধে অনেক কথা শুনে তাঁর 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে লিখেছেন : "বিস্মিত মনে তাই ভাবি, এত দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানের পরে যে স্নেহের স্মৃতি এমন ওতপ্রোতভাবে তাঁর জীবনে জড়িয়ে ছিল, তাঁর কল্পনায় মাধুর্য বিস্তার করত, অসংখ্য কবিত্বের কেন্দ্র হত, সে না জানি কি প্রভাবমণ্ডিত ছিল। কিম্বা কবির মন তাঁর আপন আলোতেই সৃষ্টি করে জগৎ, বাইরে তার অবলম্বন উপলক্ষ্য মাত্র। তবুও একথা মনে না করে পারা যায় না এমন অভূতপূর্ব বিরাট প্রতিভার মধ্যে এত গভীর দীর্ঘকালস্থায়ী প্রভাব যিনি বিস্তার করতে পারেন তিনি কম প্রতিভাশালিনী নন।"

আগেই বলা হয়েছে যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পৃষ্ঠপোষকতায় ঠাকুরবাড়ি গুণীজনের একটা সঙ্গমস্থলে পরিণত হয়েছিল ও সেই-সব গুণীদের সাহচর্যে রবীন্দ্রপ্রতিভা বিকাশের রাস্তা খুলে গিয়েছিল। তবে প্রত্যক্ষভাবে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ কোনো ওস্তাদের নিকট উচ্চাঙ্গ সংগীতের কোনো তালিম বা শিক্ষা গ্রহণ করেন নি। তিনি যা শিখেছিলেন তা শুধু আড়াল-আবডাল থেকে শুনে শুনেই। রবীন্দ্রনাথও এই বিষয়ে বলেছেন "বাল্যকাল থেকেই আমি সকল বিদ্যালয়ের পলাতক ছাত্র। সংগীত বিদ্যালয়েও আমার হাজিরা দেখলে দেখা যাবে আমি অধিকাংশ কালই গরহাজির ছিলেম।" অন্য জায়গায় তিনি বলেছেন যে গুরু-করণের মাধ্যমে কিম্বা নাড়া বেঁধে তিনি সংগীতের কোনো শিক্ষা গ্রহণ করেন নি অথচ দেখতে পাওয়া যায় যে রবীন্দ্রসংগীতের বিশাল ভাণ্ডারে, হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সংগীতের সমাবেশ ও প্রভাবই রয়েছে সর্বাধিক। রবীন্দ্রসংগীত ধারার বিরাট প্রাঙ্গণে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের বিভিন্ন গীতশৈলী, রাগ-রাগিণী, তাল ইত্যাদির যে বিপুল সমাবেশ দেখা যায় তা আমাদের মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করে। মনে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে জীবনের কোনো সময়েই কারো কাছে তালিম না নিয়ে বা শিক্ষালাভ না করে উচ্চাঙ্গ হিন্দী সংগীতের উপর এতটা জ্ঞান বা দখল কী করে তিনি অর্জন করলেন? এর উত্তরে এইটুকু বলা যায় যে বাড়ির পরিবেশ, পিতা ও অগ্রজদের প্রভাবে ও উৎসাহে, বিভিন্ন গুণীজনের অনুপ্রেরণায় ও সর্বোপরি তাঁর অসাধারণ প্রতিভাবলে তা সম্ভব হয়েছিল।

তাঁর পারিবারিক আবহাওয়া রবীন্দ্রনাথের সংগীত সৃষ্টিকে কিভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল তা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এইভাবে ব্যক্ত করেছেন :

"জোড়াসাঁকোর সংগীতচর্চা লাভ হল বাড়ির ছেলেদের। ছেলেদের ভিতর সংগীতের সুর চুঁইয়ে পড়ছে। যেমন, বড়ো মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়, মাটি ঘাস তার রস টেনে নেয়। তেমনি নিজে নিজের শক্তি মতো ছেলেরা তা টেনে নিচ্ছে। পাথুরেঘাটায় যেমন দরবারী সংগীত হয়, এখানে সেভাবে নয়। এখানে দৈনন্দিন

জীবনে সুর বাজছে। জ্যোতিকামশায় ও'রা গাইতেন, ছেলেদের মন ভিজল সুরেতে। রবিকা'র বেলা তাই। তাঁর মন রস গ্রহণ করলে, তারপর সুরের যে ফুল ফুটল তা কালোয়াতী বা আর-কিছুর সঙ্গেই মেলে না। নিত্যকার হাওয়ার মতো যা বইল, তার ফল রবীন্দ্রসংগীত। এ যেন বসন্তের পাখি— কোথা থেকে সুর পেলে, কেউ বলতে পারে না।"

—'গীতবিতান বার্ষিকী', ১৩৫০

রবীন্দ্রসংগীত সৃষ্টির প্রথম যুগ

(১৮৭৭-১৯০০)

এই যুগকে অনেকটা রবীন্দ্রনাথের শিক্ষানবিশী যুগ বলা যেতে পারে যখন তিনি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিশিষ্ট হিন্দুস্থানী গান, পাশ্চাত্য সংগীত ও অন্যান্য প্রাদেশিক ও তৎকালীন প্রচলিত বাংলা গানকে ভেঙে ও তার ধারা ও শৈলী অবলম্বনে তাঁর গান রচনা করেছিলেন। তা ছাড়া এই সময়কার তাঁর অনেক গানে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, অক্ষয় চৌধুরী ও নিধুবাবুর বৈঠকী গানের প্রভাব ছিল। স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রচনাও ছিল তবে তাতেও সেই যুগের সংগীত রচনা ও গায়ন পদ্ধতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই যুগের শেষভাগে অবশ্য সংগীত রচনায় তাঁর স্বকীয়তার স্ফুরণ সুস্পষ্ট।

এই সময়ে তিনি যে-সব গান রচনা করেছিলেন তার একটি তালিকা এই অধ্যায় শেষে দেওয়া হল। তালিকাটি সন তারিখ নিরিখে সম্পূর্ণ নির্ভুল বা এতে এই যুগে রচিত রবীন্দ্রনাথের সমস্ত গান স্থান পেয়েছে তা সঠিক ভাবে বলা চলে না এবং তা করবার চেষ্টাও করা হয় নি। কারণ এই যুগের রচিত সমস্ত গানের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করা আমার গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল না। এই তালিকাটিতে সেই-সব গানকেই বেশির ভাগ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যার উপর ভিত্তি করে তাঁর সংগীত সৃষ্টির প্রস্তুতি ও বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। আশা করা যায় এই তালিকাটি পর্যালোচনা করলেই এই যুগে কবির সংগীত সৃষ্টির প্রকৃতি, ধারা ও মান সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করা সম্ভব হবে। যেখানে যেখানে উল্লিখিত গানের রচনাস্থল জোগাড় করা সম্ভব হয়েছে সেখানে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

একটু লক্ষ্য করলেই ধরা পড়বে যে এই তালিকাটিতে রাগ-ভিত্তিক ধর্ম বা ব্রহ্মসংগীতেরই আধিক্য। তা ছাড়া এই যুগে তিনি বাল্মীকি-প্রতিভা, কালমৃগয়া ও মায়ার খেলা এই তিনটি গীতিনাট্যও রচনা করেছিলেন ও তাতে কিছু নাট্য-সংগীতের নমুনা পাওয়া যায়।

এই সময়ে কিছু প্রেম সংগীত, স্বদেশী সংগীতও রচিত হয়েছে। তবে ভানু-সিংহের পদাবলী বাদ দিলে এ যুগে রচিত কীর্তন গানের সংখ্যাও অপেক্ষাকৃত কম। লোকসংগীত বা বাউল গানও তাঁর সংগীত সৃষ্টির উপর তখন তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। বস্তুত এই সময়টাতে কবির উপর বাংলার প্রচলিত ও লোকসংগীতের প্রভাব খুবই নগণ্য। তিনি তৎকালীন প্রচলিত ও ঠাকুরবাড়ির ওস্তাদদের গাওয়া দরবারী বা ক্ল্যাসিক্যাল সংগীত দ্বারাই বেশি প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন ও তাঁর পূর্বাচার্যদের যথা রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ,

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ— এঁদের অনুসৃত সংগীতের ধারারই অনুসরণ করে চলছিলেন, যদিও এর মধ্যে কিছুটা স্বকীয়তার চিহ্নও রেখেছিলেন।

এই যুগের রবীন্দ্রনাথের সংগীত সৃষ্টিকে তিনটি ভাগে ভাগ করে আমরা আলোচনার সূত্রপাত করব। সেই ভাগগুলো যথাক্রমে (ক) ভাঙা ও রাগভিত্তিক গান, (খ) বাংলা দেশে প্রচলিত ও লোকসংগীতের উপর ভিত্তি করে রচিত গান, (গ) নাট্য সংগীত (এর মধ্যে বিলাতী গানও অন্তর্ভুক্ত)।

এবার আলোচনা করা যাক তাঁর 'ক' বিভাগের গানগুলো সম্বন্ধে :

এই যুগে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতে অনেক গান পাওয়া যাবে যা তিনি পুরানো সংগীত স্রষ্টা যথা মানদাস, জ্ঞানরঙ্গ, অদারঙ্গ, বৈজু, যদুভট্ট, হরিদাস স্বামী, কৃষ্ণরসিক, গুণসেন, জানকীদাস, তানসেন প্রভৃতি ধ্রুপদ-রচয়িতাদের গান ভেঙে রচনা করেছেন। তা ছাড়া কিছু খেয়ালাঙ্গ ও টপ্পাভঙ্গির গানও রচনা করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নিম্নোক্ত উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য :

"ইহাদের [যদুভট্ট প্রভৃতির] গান ভাঙ্গিয়া তখন আমি এবং বড় দাদা (দ্বিজেন্দ্রনাথ) অনেক ব্রহ্ম সংগীত রচনা করিয়াছিলাম। কি সৌখীন কি পেশাদার কোনও গায়কের কোনও গান ভাল লাগলেই, অমনি সেটি টুকিয়া লইয়া, আমরা ব্রহ্ম সংগীত রচনা করিতে বসিতাম। এইরূপে ব্রহ্ম সংগীতে অনেক বড় বড় ওস্তাদী সুর ও তাল প্রবেশ করিয়াছে। বাঙ্গলার সঙ্গীতের উন্নতি এমনি করিয়াই হইয়াছে।"

—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সংগীত রচনায় অগ্রজদের পন্থা অনুসরণ করলেও তার মধ্যেই তাঁর স্বকীয়তা ও প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। এটা ভালো- ভাবে উপলব্ধি করা যাবে যদি আমরা কাফি রাগের উপর হিন্দী গান 'ঝুমঝুম বরখে আজু বাদরওয়া' গানটির উপর ভিত্তি করে দ্বিজেন্দ্রনাথের ব্রহ্মসংগীত 'দীন হীন ভকতে নাথ কর দয়া' ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচিত 'তুমি হে ভরসা মম অকূল পাথারে' গানগুলোর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের রচিত 'শূন্য হাতে ফিরি হে নাথ' গানটির তুলনা করি। এই কটি ভাঙা গানের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের রচনাই যে সর্বোৎকৃষ্ট তা একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়।

এই প্রসঙ্গে আর-একটি গানের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে যা হল রবীন্দ্রনাথের 'নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে', যে গানটি শুনে তার পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে পুরস্কৃত করেছিলেন। এই গানটি উল্লেখ করার কারণ হল এই যে এই গানের সঙ্গে রাজা রামমোহনের একটি ধর্মসংগীতের কিছুটা সাদৃশ্য আছে যদিও সে সাদৃশ্যটা শুধু তার প্রথম পঙ্‌ক্তিতেই আবদ্ধ। রামমোহনের গানের প্রথম পঙ্‌ক্তিতে আছে 'মন যারে নাহি পায়, নয়নে কেমনে পাবে' কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে রয়েছ নয়নে নয়নে' গানটির

সঙ্গে সাদৃশ্য এইখানেই শেষ। কারণ রামমোহনের গানের পরবর্তী পঙ্‌ক্তিগুলো, যথা 'সে অতীত গুণত্রয়, ইন্দ্রিয় বিষয় নয়, রূপের প্রসঙ্গ তায় কি রূপে সম্ভবে' শুধু আনুষ্ঠানিক ধর্মচিন্তায় পর্যবসিত হয়েছে। এর সঙ্গে যদি আমরা রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত গানের 'হৃদয় তোমারে পায় না জানিতে রয়েছ হৃদয়ে গোপনে' বা 'তুমি আর আমি মাঝে কেহ নাই, কোনো বাধা নাই ভুবনে' সদৃশ পঙ্‌ক্তিগুলোর তুলনা করি তবে স্পষ্ট ধরা পড়বে যে রবীন্দ্রনাথ ভাষা ও ভাবের দিক দিয়ে তাঁর পূর্বাচার্যদের থেকে কতটা দূরে এসে সেই প্রথম জীবনেই ধর্মসংগীত রচনায় একটা নিজস্ব রাস্তা ধরে এগোবার চেষ্টা করেছেন।

হিন্দুস্থানী গান থেকে ভাঙা রবীন্দ্রসংগীতকে রচনার ধারা অনুসারে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। এক ভাগে হল সেই-সব রচনার ধারা যেখানে রবীন্দ্রসংগীত মূল গানের হুবহু অনুসরণে রচিত হয়েছে। আর-এক ভাগে রয়েছে সেই সব গান যাতে মূল গানের প্রভাব অল্পাধিকতর থাকলেও রবীন্দ্রনাথের মৌলিক প্রতিভার ছাপ স্পষ্ট বিদ্যমান।

প্রথম ভাগের অর্থাৎ মূল গানের হুবহু অনুসরণে রচিত রবীন্দ্রসংগীতের সংখ্যা খুবই কম। এই যুগে রচিত, 'হৃদয় নন্দন বনে' ও পরের যুগে রচিত 'প্রচণ্ড গর্জনে আসিল' সদৃশ কয়েকটি গান বাদ দিলে এরূপ হুবহু অনুসরণে রচিত গানের সংখ্যা নেই বললেই চলে। যেখানে কথা ও সুরে মূল গানকে অনুসরণ করা হয়েছে সেখানেও অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে তারও কোনো নাকোনো ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। যেমন 'হৃদয় নন্দন বনে'র মূল গান 'উড়ত বন্ধন নব আবিরমে কুমকুম' গানটির ছন্দ ছিল ৩।২ কিন্তু ভাঙা গানটিকে পরে ২।৩ ছন্দে পরিবর্তিত করা হয় ও এই ছন্দই ভাঙা গানটির পক্ষে সুপ্রযুক্ত হয়েছে সন্দেহ নাই।

এ ছাড়া কিছু গানে রবীন্দ্রনাথ মূল হিন্দুস্থানী গানের সুর অবলম্বন করা ছাড়াও এর কথা অনেকাংশে রেখেছেন। যথা 'আজু বহত সুগন্ধ পবন' তার হাতে পড়ে হয়েছে, 'আজি বহিছে বসন্ত পবন', 'হে মা প্রবল বলী' হয়েছে 'হে মহা প্রবল বলী' ও 'দেবন দেব মহাদেব' গানটি ভেঙে রচিত হয়েছে 'দেবাদিদেব মহাদেব' ইত্যাদি।

দ্বিতীয় ভাগের ভাঙা গানে অর্থাৎ যে-সব রচনায় রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়তা স্পষ্ট বিদ্যমান তাদের মূল গানের সঙ্গে ভাঙা রবীন্দ্রসংগীতের এই ক'টি বিষয়ে মিল বা অমিল লক্ষ্য করা যায়— (ক) রচনার বিষয়বস্তু, (খ) সুর, (গ) তাল ও লয়, (ঘ) কলি সংখ্যা।

প্রথমেই এটা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মূল হিন্দী গানের কাব্যাংশ বা সাহিত্য, বাণী ও ভাব ও ভাঙা রবীন্দ্রসংগীতের ভাব আলাদা ও রবীন্দ্রনাথের হাতে যে ভাঙা গানের বাণী বা সাহিত্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমৃদ্ধতর হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নাই। এই প্রসঙ্গে

দৃষ্টান্ত হিসেবে নিম্নোক্ত কয়টি ভাঙা গানের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

যদুভট্ট-রচিত 'ফুলি বন ঘন মোর' গানটি বসন্ত ঋতুর বর্ণনামূলক কিন্তু রবীন্দ্রনাথের হাতে পড়ে 'আজি মম মন চাহে জীবনবন্ধুরে' ভাঙা গানটি একটি ভিন্নতর ও গভীরতর ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। এই দুটি গানের বাণী পরপর উদ্ধৃত করা হল। যা থেকে আমার এই বক্তব্য আরো পরিস্ফুট হবে।

বাহার, চৌতাল (দ্রুতগতি)

স্থায়ী

ফুলি বন ঘন মোর আয় বসন্ত রি
অব বহত পবন মন্দ মন্দ সমীরণ মন ভাবে
জব মধুপবৃন্দ নিরতকর গুঞ্জার
নই নই কলিয়ন পর জায় চুবক হয়ত ॥

অন্তরা

কেতকী গুলাব ঔর চম্পা বকুল বেলা
অতি কোমল দল কুসুম সহিত প্রফুলিত ভই
নাথ নাথ নিত করত নাবী নিরখ নাথ ॥

অবলম্বনে রবীন্দ্রসংগীত

বাহার—চৌতাল

আজি মম মন চাহে জীবন বন্ধুরে,
সেই জনমে মরণে নিত্য সঙ্গী
নিশিদিন সুখে শোকে—
সেই চির আনন্দ, বিমল চিরসুধা,
যুগে যুগে কত নব নব লোকে নিয়ত শরণ ॥
পরাশান্তি, পরমপ্রেম, পরামুক্তি, পরমক্ষেম
সেই অন্তরতম চির সুন্দর প্রভু, চিত্তসখা,
ধর্ম-অর্থ-কাম-ভরণ রাজা হৃদয় হরণ।

শুধু কথাই নয় মূল গানটির সঙ্গে ভাঙা রবীন্দ্রসংগীতটির সুরেরও কিছু পার্থক্য আছে এটা পরিস্ফুট হবে যদি আমরা ভাঙা রবীন্দ্রসংগীতটির 'পরাশান্তি পরমপ্রেম, পরামুক্তি পরমক্ষেম' অংশের সঙ্গে মূল গানের 'কেতকী গুলাব ঔর চম্পা বকুল বেলা' অংশটির সুরের তুলনা করি :

মা-ণধা	না না	-র্সা র্সা	র্সা -া	র্সা র্সা	-া র্সা
কে ০০	ত কী	০ গু	লা ০	ব ঔ	০ র

না -র্সা	র্রা -র্জ্ঞা	র্রা র্সা	-না রা	র্সা -া	ণা -ধা
চ ম্	পা ০	ব কু	০ ল	বে ০	লা ০
র্সণা ণধা	ণধা না	-র্সা র্সা	র্সা র্সা	র্সা র্সনা	-র্সা র্সা
প০ রা০	০০ শা	ন্ তি	প র	ম প্রে০	০ ম
র্সনা র্সা	-র্সা র্রা	-র্জ্ঞা র্রর্সা	র্সনা র্সনা	র্রর্সা র্সনা	-র্সণা ণধা
প০ রা	০ মু	ক্ তি০	প০ র০	ম০ ক্ষে০	০০ ম০

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে যদুভট্ট রচিত ধ্রুপদ 'ফুলিবন ঘন' গানটি দুই তুকের ও দুই তুকের ধ্রুপদ সাধারণত খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়।

প্রেম বিষয়ক 'লাগি মোরে ঠুমক পলংগনা' গানটি তাঁর হাতে পূজা পর্যায়ের 'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে' গানে রূপান্তরিত হয়েছে। শুধু বাণী বা ভাবেতেই নয়, এতে আরো পরিবর্তন ঘটেছে যথা (ক) মূল গান দুই কলি যুক্ত হলেও ভাঙা গান রবীন্দ্রনাথ বেঁধেছেন ৪ কলিতে, (খ) মূল গান মালকোষ রাগে কিন্তু ভাঙা গানটি রবীন্দ্রনাথ বেঁধেছেন মিশ্র মালকোষ রাগে ও তাতে কোমল রে ও কড়ি মধ্যম ব্যবহৃত হয়েছে।

উপরোক্ত বক্তব্যটি পরিস্ফুট করার জন্যে মূল ও ভাঙা গানের বাণী নীচে উদ্ধৃত ও দুটি গানেরই কিছু অংশের স্বরলিপির নিদর্শন দেওয়া হল।

মালকোষ—ত্রিতাল—মধ্যলয়

স্থায়ী

লাগি মোরে ঠুমক পলংগনা
রি ননদিয়া ঘর বিরনমোহে
কহত পাল বাজে ঘুংগরিয়া।

অন্তরা

তনমন ধন নিত চামর করহুঁ
সদারংগ পিয়া লাগত নিক
গোরে গাত খুব জাত মন্দরিয়া।

অবলম্বনে রবীন্দ্রসংগীত

মিশ্র মালকোষ। ত্রিতাল (ঈষৎ বিলম্বিত মধ লয়)

আনন্দধারা বহিছে ভুবনে
দিন রজনী কত অমৃতরস উথলি যায় অনন্ত গগনে॥

পান করে রবি শশী অঞ্জলি ভরিয়া,
সদা দীপ্ত রহে অক্ষয় জ্যোতি—
নিত্য পূর্ণ ধরা জীবনে কিরণে ॥
বসিয়া আছ কেন আপন মনে
স্বার্থ নিমগন কী কারণে ?
চারি দিকে দেখো চাহি হৃদয় প্রসারি,
ক্ষুদ্র দুঃখ সব তুচ্ছ মানি
প্রেম ভরিয়া লহো শূন্য জীবনে ॥

স্বরলিপি

লাগি মোরে ঠুমক পলঙ্গনা

ত্রিতাল—মধ্যলয়

[মা] ণ
II -া সা -ণা সা | সা -সণ্া দ্া-ণা |
o লা o গি | মোo oo রে o |

I সা সা মা জ্ঞা | মা মা মা জ্ঞা | মা সা ণা সা | মা ˊসণা দা ণা I
ঠু ম ক প লঙ গ না o | o লা o গি | মো oo রে o

I সা সা মা জ্ঞা | মা মা মা -জ্ঞা | -মা সা -ণ্া সা | সা সা ণা দ্া I
ঠ ন ক প লঙ গ না o | o বি o ন | ন দি য়া o

I-ণা্ দা দ্া ণ্া | সা সা মা মা | মা মা মা মা | া মা জ্ঞা -া I
o ঘ র বি | ব ন মো হে | ক হ ত পা | o ল বা o

I জ্ঞমা -দণা -র্সা র্সণা | ণদা দমা জ্ঞো -মজ্ঞা I
জেo oo o ঘুঙু | গo রিo য়াo oo

আনন্দধারা বহিছে ভুবনে

ত্রিতাল—ঈষৎ বিলম্বিত

[মা]

II সা সা ণ্‌া ঋা | সণা স ণ্‌া দ্‌া-ণ্‌া | সা সা মা জ্ঞা | মা ঋা মা -জ্ঞা I
আ ন ন্‌ দ | ধা০ ০০ বা ০ | ব হি ছে ভু | ব নে আ ০

I -মা সা ণ্‌া ঋা | সা ণসণা দা ণা | সা সা মা জ্ঞা | মা মা ঋা -জ্ঞা I
০ ন ন্‌ দ | ধা ০০০ বা ০ | ব হি ছে ভু | ব নে ০ ০

I -মা সা ণ্‌া ঋা | সা সা ণা দা | ণা দা দা ণা | সা সা মা মা I
০ দি ০ ন | র জ নী ০ | ০ ক ত শ | ম্‌ ত র স

I মা মা মা মা | -া মা জ্ঞা া | মদা ণর্সা সণা ণদা | দমামজ্ঞা মজ্ঞামজ্ঞা II
উ থ লি যা | ০ ০ ০ ০ | ন০ ০ন ত০ গ০ | গ০ নে০ আ০ ০০

এ ছাড়া এই ভাঙা গানের আগে একটি স্বরলিপির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে যা ১৩০৩ সালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। অনুমান করা খুব অসংগত নয় যে এই স্বরলিপিটি করেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। এই ভাঙা গানটিতে শুধু কোমল রে ও কড়ি মা ন শুদ্ধ গা ও পঞ্চম ব্যবহৃত হয়েছে। এই ভাঙা গানটির অংশবিশেষে স্বরলিপি নীচে দেওয়া হল, সেখানে এই ৪টি পর্দা, অর্থাৎ কোমল রে, শুদ্ধ গা, কড়ি মা ও পঞ্চমের ব্যবহার হয়েছে।

মণ্ডকেশ—ধ ওগা

মা গা II মা সা ণা ঋা | সা ণসণা পা | সা ণা মা গা
আ ০ ০ ন ০ ন্দ | ধা ০০০ বা ০ | ব হি ছে ভ
মা গমপা মা গা
নে আ ০

I দা মা মা মা | া সা সা মা | জ্ঞা ঋা মা মঋা | জ্ঞা মজ্ঞা মজ্ঞা-মজ্ঞা
নি ০ত্য পু | ০ র্ণ ধ রা | জী ব নে কি০ | র ণে০ আ০ ০০

ভিন্ন সুরে, অনেকটা মূল গানকে অনুসরণ করে গাওয়া 'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে' গানটির একটি রেকর্ড বহুল প্রচারিত আছে। কিন্তু রেকর্ডে গাওয়া গানটির সুরের উৎস স্থল না জানায় ও বিশ্বভারতীর কোনো গ্রন্থে এর স্বরলিপি না পাওয়াতে এই গানটির স্বরলিপি দেওয়া বা এর সম্বন্ধে কোনো আলোচনা করা সম্ভব হল না।

'বেণী নিরখত ভুজংগ পতাল লোক গয়ো' সুন্দরীর বর্ণনামূলক ক্ষেমরসিক-রচিত আড়ানা রাগে চৌতালের একটি ধ্রুপদ। এই গানটি ভেঙে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন পূজা পর্যায়ের গান 'বাণী তব ধায় অনন্ত গগনে'। শুধু কথাই নয়, এতে সুরের ও রসের পার্থক্য আছে। হিন্দী গানের মধুর রসের পরিবর্তে ভাঙা গানটিতে শান্ত রসের উপস্থাপনা করা হয়েছে।

ঋতু বিষয়ক ধামার গান 'আয়ো ফাগুন বড়ো মান' তাঁর হাতে 'সুধা সাগর-তীরে' ব্রহ্মসংগীতে রূপান্তরিত হয়েছে। খেয়ালাঙ্গ 'মুঝে পেয়ালা ভর দে' গানটি পরিবর্তিত হয়েছে 'দাও হে হৃদয় ভরে দাও' গানে ও টপ্পা 'বে পরি জা তাড়ে' গানটি রূপান্তরিত হয়েছে 'কে বসিলে আজি হৃদয়াসনে' গানটিতে। এরূপ আরো বহু গানের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে যেখানে রবীন্দ্রনাথ ভাঙা গানে সুরের বাণীর পর্যায় ইত্যাদির পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। কিন্তু তাঁর ভাঙা গানে অন্যের প্রভাব যতখানিই থাকুক-না কেন গোড়ার থেকেই কথা ও সুরের সামঞ্জস্যে সংগীত রচনার আদর্শ রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছিলেন ও তাঁর ভাঙা ও রাগভিত্তিক গানে সুরধর্মী হিন্দুস্থানী সংগীতের অলংকরণের আতিশয্য যথা ধ্রুপদ গানে বাট, দ্বিগুণ চৌগুণ করা, খেয়ালাঙ্গ গানে বিস্তার ও তান এবং টপ্পা গানে অতিদ্রুত জমজমা তান— এই-সব অলংকরণ বর্জন করেছিলেন।

এই যুগের ভাঙা গান ও তার স্বাধীন ভাবে রচিত রাগভিত্তিক গানগুলো পর্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে তাতে ধ্রুপদাঙ্গ গানের সংখ্যাই সর্বাধিক।

হিন্দুস্থানী গীতরীতির মধ্যে ধ্রুপদ গান কেন তাঁকে বেশি আকৃষ্ট করেছিল তার কারণ বুঝতে হলে রবীন্দ্রনাথের নিম্নোক্ত উক্তিটি বিশেষ সহায়ক হবে, "আমরা বাল্যকালে ধ্রুপদ গান শুনতে অভ্যস্ত। তার আভিজাত্য বৃহৎ সীমার মধ্যে আপন মর্যাদা রক্ষা করে। এই ধ্রুপদ গানে আমরা দুটো জিনিস পেয়েছি— একদিকে তার বিপুল গভীরতা; আর একদিকে তার আত্মদমন ও সুসংগতির মধ্যে আপন ওজন রক্ষা করা। এই ধ্রুপদের সৃষ্টি আগেকার চেয়ে আরো বিস্তীর্ণ হোক। আরো বহুকক্ষাবিশিষ্ট হোক, তার ভিত্তি-সীমার মধ্যে বহু বৈচিত্র্য ঘটুক, তা হলে সংগীতে আমাদের প্রতিভা বিশ্বজয়ী হবে।"

—সুর ও সংগীত। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লেখা পত্র।

আগেই বলা হয়েছে যে গোড়া থেকেই রবীন্দ্রনাথের সংগীত রচনার আদর্শ

ছিল কথা ও সুরের সামঞ্জস্য সাধন, সেজন্যে খেয়াল গানের চেয়ে ধ্রুপদ গানই তাঁকে বেশি আকৃষ্ট করেছিল, কারণ খেয়াল গানে বাণীর স্থান অপেক্ষাকৃত গৌণ। এমন কি অর্থহীন তানা, নানা, নোম তোম, ইত্যাদি শব্দ দিয়েও খেয়াল গান সৃষ্টি করা যায় বা করা হয়েছে। খেয়ালে মুক্ত সুরবিহার হল তার প্রধান কাজ ও এই ধারার গানে ক্রমে ক্রমেই গানের বাণী সংকুচিত হয়ে চার লাইন, দুই লাইনে এসে ঠেকল, এমন-কি পুরো দুটো লাইনেরও যেন আর দরকার রইল না।

খেয়াল ও ঠুংরী গানে বাণীর এই স্বল্পতা ও গৌণ ভূমিকা এবং তাতে বাণী-নিরপেক্ষ মুক্ত সুরবিহারের আধিক্য সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ রহস্য করে বলেছিলেন, "গানের কথায় আছে 'চলত রাজকুমারী' কিন্তু সুরের মোহে পড়ে গিয়েছেন যে ওস্তাদী গাইয়ে তিনি 'চলত' শব্দটিকে দিয়ে সুরে ফিরে সুরের জাল বুনে চলেছেন। এদিকে রাজকুমারীর চলা যে আর হয় না, ওস্তাদের সে দিকে আর খেয়ালই নেই।"

কিন্তু ধ্রুপদ গানে বাণীর স্থান উপেক্ষণীয় নয়। তানসেনের রচিত যে-সমস্ত প্রাচীন ধ্রুপদ গান আমরা পাই তাতে গানের বাণীতে যথেষ্ট কবিত্বশক্তির পরিচয় মেলে। ধ্রুপদ গানে বাণী ৪ তুক বিশিষ্ট হওয়াতে তাকে কেন্দ্র করে সুর যথেষ্ট বিস্তৃতিলাভ করার সুযোগ পায় ও শোনা যায় যে প্রাচীনকালে এমন সব ধ্রুপদ গান গাওয়া হোতো যা শুধু শুনলেই যে রাগে গানটি বাঁধা সেই রাগের বিস্তারের রাস্তার ইঙ্গিত মিলত।

সুতরাং খুব সংগত কারণেই রবীন্দ্রনাথ অন্যান্য হিন্দুস্থানী ধারার গানের চেয়ে ধ্রুপদ গানের দিকে বেশি আকৃষ্ট হলেন। কারণ আগেই বলা হয়েছে যে ধ্রুপদ ৪ তুক বিশিষ্ট হওয়াতে তাতে বিস্তৃত কাব্য রচনা ও সুরারোপের সুযোগ ছিল, রবীন্দ্রনাথও সুর ও বাণীর সামঞ্জস্যে গান রক্ষা করার আদর্শকে গোড়া থেকেই গ্রহণ করেছিলেন। তা ছাড়া যে-সমস্ত ওস্তাদেরা তখন ঠাকুরবাড়িতে যাতায়াত করতেন তাঁরা বেশির ভাগই ছিলেন ধ্রুপদীয়া ও রবীন্দ্রনাথের বেশির ভাগ ভাঙা গানই ঐ সব ওস্তাদদের মুখ থেকে শোনা ধ্রুপদ গান ভেঙে রচিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে ধ্রুপদ গান ভেঙে বা ধ্রুপদাঙ্গ গান আর বেশি রচনা না করলেও এই ধারার গানের একটা প্রভাব তাঁর গানে স্থায়ীভাবে পড়েছিল ও সেটা হল এর ৪ তুকের স্থাপত্য বা গঠন। যার ফলে রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ গানই স্থায়ী, অন্তরা সঞ্চারী আভোগ— এই চার তুকে গঠিত। এখানে আর-একটি প্রসঙ্গ আলোচনা করে নেওয়া প্রয়োজন। অনেক সময় আমরা রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের রচিত রাগভিত্তিক গানে প্রযুক্ত রাগের যে স্বররূপ দেখি তা আমাদের জানা ও প্রচলিত রাগ-রাগিণীর স্বররূপের সঙ্গে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঠিক মেলে না। এর কারণ হল এই যে রবীন্দ্রনাথ প্রথম যুগে তাঁর ভাঙা ও স্বাধীনভাবে রচিত রাগ-ভিত্তিক গানে এমন এক ঘরানা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন যার সঙ্গে আমাদের প্রচলিত উত্তর ভারতীয় ক্ল্যাসিক্যাল সংগীতের ঘরানার কিছুটা প্রভেদ রয়েছে ও

রবীন্দ্রনাথ যে ঘরানা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন তার নাম হল বিষ্ণুপুরী ঘরানা।

এখন এই বিষ্ণুপুরী ঘরানার উৎপত্তি, বৈশিষ্ট্য ও রবীন্দ্রসংগীতে এর প্রভাব সম্বন্ধে একটু আলোচনা করে নিলে ভালো হবে।

মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের (১৭৫৯-১৮০৬) ধ্বংসোন্মুখ দিল্লীর দরবারের শ্রেষ্ঠ গায়ক ও গুণীরা পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে ভারতের নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেন। বাংলা দেশে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে দিল্লীর দরবারের ওস্তাদরা কৃষ্ণনগর ও কলকাতায় আসেন। এই সময়ে আর-এক দলে বাহাদুর খাঁ নামে একজন তানসেন বংশীয় ধ্রুপদীয়া আসেন বিষ্ণুপুরে। তাঁর সঙ্গে পীরবক্স নামে একজন পাখোয়াজীও আসেন। তাঁরা বিষ্ণুপুরে একটি সংগীত বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

বিষ্ণুপুরে বাহাদুর খাঁর শিষ্যত্ব অনেকেই গ্রহণ করেন ও বাহাদুর খাঁর অবর্তমানে বিষ্ণুপুরের এই সংগীত বিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন তারই শিষ্য গদাধর, তারপর রামশঙ্কর ভট্টাচার্য। রামশঙ্করের ছাত্রদের মধ্যে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, যদুভট্ট, কেশবলাল চক্রবর্তী, রামকেশব, দীনবন্ধু ও অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিখ্যাত।

রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ও গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র ও গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সময়েই বোধ হয় বাংলায় বাহাদুর খাঁ প্রবর্তিত ধ্রুপদ গানের অনেকটা রূপান্তর ঘটেছে।

পশ্চিমের সেনী ঘরানার গাইয়েদের মধ্যে এখন গানে ও ঢঙে যে পরিবর্তন ঘটল তা না করে বাঙালী গাইয়েরা বিষ্ণুপুরে পূর্বাচার্যদের নিকট প্রথম পাওয়া রাগ রাগিণীর স্বররূপের উপর নিজেদের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে চলতে লাগলেন এবং সেই বৈশিষ্ট্যই শেষ পর্যন্ত বিষ্ণুপুরী ঘরানা বা ঢঙ নামে বাংলা দেশে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে।

প্রথম যুগে রবীন্দ্রনাথের উচ্চাঙ্গ সংগীতের আদর্শে গঠিত গানে উল্লিখিত বিষ্ণুপুরী ঢঙ নামে বাংলায় প্রচলিত পদ্ধতিরই প্রভাব বেশি। তার কারণ হল জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে ঐ ধারায় শিক্ষিত বাঙালী গায়করাই শিক্ষক রূপে বরাবর স্থান পেয়ে আসছিলেন। রবীন্দ্রনাথও সেই আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ বলে তার এই যুগের ভাঙা ও স্বাধীনভাবে রচিত রাগভিত্তিক গানগুলোতে এই ধারার প্রভাবই বেশি।

উত্তর ভারতে প্রচলিত রামকেলীতে কড়ি মধ্যম ব্যবহৃত হয়ে থাকে, কিন্তু কড়ি মধ্যমযুক্ত রামকেলী তাঁর গানে পাওয়া যায় না, উদাহরণস্বরূপ রামকেলী রাগে নিবদ্ধ 'দাও হে হৃদয় ভরে দাও', 'আঁখিজল মুছাইলে, জননী' ও 'স্বপন যদি ভাঙিলে' গানগুলোর কথা উল্লেখ করা যায়।

পূরবীতে বাঁধা 'আজি এ আনন্দসন্ধ্যা' গানটিতে পূরবীতে বহুল প্রযুক্ত কোমল ধা এর ব্যবহার হয় নি।

প্রথম যুগে বেহাগে রচিত 'স্বামী তুমি এসো আজ', 'ভয় হতে তব অভয়-মাঝে', 'বলি, ও আমার গোলাপবালা' ও 'ওগো শোনো কে বাজায়' গানগুলোতে উত্তর ভারতে বেহাগে প্রযুক্ত কড়ি মধ্যমের প্রয়োগ নেই। তবে এই-সমস্ত গান-গুলোর কোনো কোনোটির মধ্যে কোমল নিষাদের প্রয়োগ ঘটেছে ও এদেরই বেহাগ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, যদিও এরূপ কোমল ধ্বনি যুক্ত স্বরবিন্যাসকে বেহাগড়া বলা হয়ে থাকে। তাঁর বেহাগে রচিত গানে পক্ষ'গমগ' বা পক্ষ'মগ—বেহাগে বহুল প্রযুক্ত স্বরবিন্যাস একেবারেই পাওয়া যায় না।

অবশ্য ১৮৯৫ সালে রচিত বেহাগ রাগ অবলম্বনে 'তুমি রবে নীরবে' গানটিতে কড়ি মধ্যমের প্রয়োগ দেখা যায় ও পরবর্তীকালে পূরবীতে রচিত 'অশ্রুনদীর সুদূর পারে' গানে শুদ্ধ ধৈবতের সঙ্গে মাঝে কোমল ধৈবতের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

এটা পরবর্তীকালে উত্তর ভারতীয় অন্যান্য ঘরানার গানের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের ফলেও হয়ে থাকতে পারে অথবা কথা ও সুরের সামঞ্জস্যের আদর্শ গ্রহণ করার জন্যেও হতে পারে।

যদিও এই সময়ে তাঁর রচিত ধ্রুপদাঙ্গ গানের সংখ্যাই বেশি কিন্তু হিন্দুস্থানী অন্যান্য ধারার গান যথা পাঞ্জাব খেয়াল টপ্পা এই-সব ঢঙের গানও রচনা করেছেন যদিও ধ্রুপদাঙ্গ গানের তুলনায় তাদের সংখ্যা কম। কিন্তু যে-কোনো ধারার গানই তিনি রচনা করে থাকুন না কেন সব-কিছুতেই হিন্দুস্থানী গানের অলংকরণ বাহুল্য ও গানের বন্দিজের ভিতর সন্নিবিষ্ট তান ও প্রক্ষিপ্ত এমন সব অলংকরণকে বর্জন করেছিলেন।

এই যুগে ভাঙা গান ছাড়াও স্বাধীনভাবে বেশ-কিছু রাগাশ্রয়ী গান রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন ও এককভাবে রাগের বিচারে দেখা যায় ভৈরবী ও বেহাগ রাগ অবলম্বনে রচিত গানেরই প্রাধান্য। কিন্তু তারও মধ্যে সুরকার হিসেবে রবীন্দ্রনাথের পরিণতি ও অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায় ও এটা ভালোভাবে বোঝা যাবে যদি আমরা যে-কোনো একটি রাগের উপর তার গোড়ার দিককার গানের সঙ্গে এই যুগেরই শেষ ভাগে সেই রাগের উপর রচিত কোনো গানের তুলনা করি। গোড়ার দিককার বেহাগে রচিত 'বলি ও আমার গোলাপবালা' গানটির সঙ্গে ১৮৯৫ সালে রচিত বেহাগে'তুমি রবে নীরবে' গান বা ভৈরবীতে গোড়ার দিককার রচিত গান 'আজ তোমারে দেখতে এলেম'-এর সঙ্গে ১৮৯৭-এ রচিত ভৈরবীতে 'কেন যামিনী না যেতে জাগালে না' বা ১৮৯৭-৯৮-এ রচিত "ওগো কাঙাল আমারে কাঙাল করেছ' গানগুলোর তুলনা করলেই এই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে উঠবে। কিন্তু এ ছাড়াও আর-একটি জিনিস লক্ষণীয় সেটা হল এই যে সেই সময় ভাঙা ও পুরোপুরি রাগভিত্তিক গানে ব্যবহৃত রাগের হয়তো কিছুটা ধরাবাঁধা রূপ বা কিছুটা তথাকথিত স্বরপ্রয়োগের প্রথা রবীন্দ্রনাথ রক্ষা করেছেন, কিন্তু প্রায় একই সময়ে সেই রাগ অবলম্বন করে যখন

স্বাধীনভাবে কিছুটা কাব্যধর্মী গান রচনা করেছেন তখন সেই গানে যথেষ্ট বৈচিত্র্য এসেছে ও তা একটা ভিন্নতর স্বাদের সৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে ১৮৯৭ সালে বেহাগে রচিত অনেকটা কাব্যধর্মী 'আমি কেবলই স্বপন করেছি বপন' গানটির সঙ্গে ১৯০০-তে বেহাগ রাগে রচিত ধ্রুপদাঙ্গ গান 'ভয় হতে তবে অভয়-মাঝে' গানটির তুলনা করলেই আমি কি বলতে চাইছি তা পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

প্রথম যুগের শেষ ভাগে কবি ক'টি গান রচনা করেছিলেন যাদের উৎকৃষ্ট সংগীতের পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে, যথা মল্লারে 'এমন দিনে তারে বলা যায়', খাম্বাজে 'ওহে সুন্দর মম গৃহে আজি', ইমন কল্যাণে 'তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা', বেহাগে 'তুমি রবে নীরবে' প্রভৃতি গান যাদের মধ্যে অসাধারণ সুর স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের পরিচয় মেলে।

এইবার আমরা আলোচনা করব তাঁর প্রাদেশিক ও বিলাতী গান ভেঙে রচিত গানগুলো নিয়ে। এই যুগে প্রাদেশিক গান থেকে ভাঙা এই কটি গান প্রধানত পাওয়া যায়ঃ

১. গগনের থালে রবিচন্দ্র দীপক জ্বলে—	শিখদের ভজন ভাঙা গান।
২. বড়ো আশা করে—	এইগুলো কানাড়ী গান ভেঙে তৈরি
৩. আজি শুভদিনে	হয়েছে।
৪. সকাতরে ওই কাঁদিছে	
৫. বেঁধেছ প্রেমের পাশে—	একটি বাংলা গান ভেঙে তৈরি।
৬. নমি নমি ভারতী—	এই কটি গানের সুর গুজরাটী ভজনের
৭. যাও রে অনন্ত ধামে	সুরকে অবলম্বন করে রচিত।
৮. একি অন্ধকার এ ভারতভূমি	
৯. একি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ—	সরলাদেবীর কাছ থেকে মূল মহী-
১০. আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে	শূরী গান শুনে এই দুটি গান রচনা করেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে সরলা দেবী বলেছিলেন "মহিসুরে যখন গেলুম সেখান থেকে এক অভিনব ফুলের সাজি ভরে আনলুম। রবি মামার পায়ের তলায় সে গানের সাজিখানি খালি না করা পর্যন্ত মনে বিরাম নেই। সাজি থেকে এক একখানি সুর তুলে নিলেন তিনি, সেগুলিকে মুগ্ধ চিত্তে নিজের কথা দিয়ে নিজের করে নিলেন তবে আমার পূর্ণ চরিতার্থতা হল। আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে…। একি এ লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ প্রভৃতি আমার সুরে বসানো গান।"

—জীবনের ঝরাপাতা।

আরো কিছু গানে হয়তো প্রাদেশিক সুরের প্রভাব থাকতে পারে তবে এ যুগে প্রাদেশিক সুর ভাঙা গান বলতে মোটামুটি এই কটি গানকেই নজরে পড়ে।

এই যুগে কিছু বিলাতি গান ভেঙেও রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করেছিলেন। তবে 'কতবার ভেবেছিনু', 'পুরানো সেই দিনের কথা' সদৃশ কয়েকটি গান ছাড়া অন্যান্য সব এ-জাতীয় ভাঙা গান প্রায় সবই বাল্মীকি-প্রতিভা, কালমৃগয়া ও মায়ার খেলা গীতিনাট্যে ব্যবহৃত হয়েছে এবং ঐ-সব গীতিনাট্যসমূহের বিবরণ দেবার সময় তা নিয়ে আরো একটু বিস্তৃত আলোচনা করা যাবে। কিন্তু এটা বলা চলে যে ভাঙা গানের মধ্য দিয়ে যে বিলাতি গানের প্রভাব প্রকাশ পাচ্ছে তা খুব একটা গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ নয়। পাশ্চাত্ত্য সংগীত তাঁকে যে অন্যদিক দিয়ে সংগীত সৃষ্টিতে প্রভাবান্বিত করেছিল, এ-বিষয়ে আলোচনার সময় বিস্তারিত ভাবে তুলে ধরবার চেষ্টা করা হবে।

এইবার আমরা আলোচনা করব এই সময়ে রচিত রবীন্দ্রসংগীতে বাংলা গান, যথা কীর্তন ও লোকসংগীতের প্রভাব সম্বন্ধে।

আগেই বলা হয়েছে যে এইসময়কার সংগীত সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রচলিত দরবারী বা ক্ল্যাসিক্যাল সংগীত দ্বারা বেশি প্রভাবান্বিত হয়েছেন ও প্রচলিত বাংলা গান ও লোকসংগীত তখনো তাঁর সংগীত সৃষ্টির উপর তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি।

এই যুগে রবীন্দ্রনাথ রচিত কীর্তনাঙ্গ ও লোকসংগীতের সুরে রচিত কিছু বিশিষ্ট রচনার নমুনা দেওয়া হল :

১	গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে	—	মিশ্র কীর্তনের সুর
২	আমি জেনে শুনে তবু	—	কীর্তনাঙ্গ
৩	শ্যামা এবার ছেড়ে চলেছি	—	রামপ্রসাদী
৪	আমার মন মানে না	—	কীর্তনাঙ্গ
৫	খ্যাপা তুই আছিস আপন	—	বাউলাঙ্গ
৬	আমারে কে নিবি ভাই	—	„
৭	খাঁচার পাখি ছিল	—	কীর্তনাঙ্গ
৮	বড়ো বেদনার মতো	—	„
৯	তোমার গোপন কথাটি	—	„
১০	ওহে জীবনবল্লভ	—	„
১১	ভালোবেসে সখী	—	„
১২	আমি নিশিদিন তোমায়	—	„
১৩	একবার তোরা মা বলিয়া ডাক	—	ঝিঁঝিট
১৪	আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে	—	রামপ্রসাদী
১৫	ওলো সই ওলো সই	—	কীর্তনাঙ্গ
১৬	হৃদয়ের একূল ওকূল	—	বাউলাঙ্গ
১৭	ওকে বলো সখী বলো	—	কীর্তনাঙ্গ
১৮	মরি লো মরি	—	

১৯ তবু মনে রেখো
২০ এসো এসো ফিরে এসো } কীর্তনের প্রভাবযুক্ত গান

এই তালিকাটি থেকে বোঝা যাবে যে যদিও এই যুগে তিনি অল্প কিছু গান লোকসংগীতের সুরে রচনা করেছিলেন কিন্তু কীর্তন গানের তুলনায় তাদের সংখ্যা আরো কম।

এই সময়ে তিনি কীর্তন বাউল ইত্যাদির ছাঁচে যে-সব গান রচনা করেছেন তাতে তৎকালীন প্রচলিত ধারাকেই যতদূর সম্ভব অনুসরণ করা হয়েছে— কীর্তন বা বাউলে রবীন্দ্রনাথের যে স্বাতন্ত্র্য তা তখনো প্রকাশিত হয় নি।

রবীন্দ্রনাথের গোড়ার দিকের সংগীত রচনার ধারার মধ্যে ভানুসিংহের পদাবলীর একটা বিশেষ স্থান আছে। এই পদাবলীগুলি কবির ষোলো থেকে পঁচিশ (১৮৭৭-৮৪) বছরের রচনা। ভানুসিংহের পদাবলীতে রয়েছে বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস প্রমুখ পদরচয়িতাদের প্রভাব। বিদ্যাপতির মৈথিলী ভাষার সাহায্যে ও বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস প্রমুখ পদকর্তার পদরচনাকে এবং জয়দেবের গীত-গোবিন্দকে কিছু কিছু অনুকরণ ও অনুসরণ করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভানুসিংহের পদাবলী রচনা করেছিলেন।

'গহনকুসুমকুঞ্জমাঝে' গানটি এই পর্যায়ের প্রথম রচনা এবং তারপর ক্রমান্বয়ে একুশটি পদ রচিত হয়। এই বাইশটি পদরচনার মধ্যে গান হিসেবে মাত্র ৯টির খোঁজ পাওয়া যায়। অন্যগুলিতেও সুরযোজনা হয়েছিল কিনা তা জানা যায় না ও সুরযোজনা হয়ে থাকলেও তা হারিয়ে গেছে। সুর দেওয়া পদ-গুলিতে রাগ ও তালের উল্লেখ আছে কিন্তু সুরযোজনার সময়কাল সম্বন্ধে কোনো প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায় না। তবে স্বরলিপিগ্রন্থ থেকে যা তথ্য পাওয়া যায় তাতে অনুমান হয় যে এই ৯টি পদে সুর দেওয়া হয় ১৮৯০-এর পূর্বে।

এই গানগুলি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

"পদাবলী শুধু কেবল সাহিত্য নয়, তার রসের বিশিষ্টতা বিশেষ ভাবের সীমানার দ্বারা বেষ্টিত। সেই সীমানার মধ্যে আমার মন স্বাভাবিক স্বাধীনতার সঙ্গে বিচরণ করতে পারে না, তাই ভানুসিংহের সঙ্গে বৈষ্ণবচিত্তের অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা নেই। এইজন্যে ভানুসিংহের পদাবলী বহুকাল সংকোচের সঙ্গে বহন করে এসেছি। এ'কে সাহিত্যে একটা অনধিকার প্রবেশের দৃষ্টান্ত বলেই গণ্য করি।...এ কথা বলে রাখি ভানুসিংহের পদাবলী ছোটো বয়স থেকে অপেক্ষাকৃত বড়ো বয়স পর্যন্ত দীর্ঘকালের সূত্রে গাঁথা। তাদের মধ্যে ভালো-মন্দ সমান দরের নয়।"—১১।৭।৪০ শান্তিনিকেতন

—সূচনা, 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী', ১৩৭৬।

এতে ভানুসিংহ ঠাকুরের ছদ্মনামে অন্য দুটি পদকর্তার যে দুটি পদে রবীন্দ্রনাথ সুর বসিয়েছিলেন তা হল :

এ ভরাবাদর মাহ ভাদর—কবি বিদ্যাপতি ;
সুন্দরী রাধে আওয়ে বনি—কবি গোবিন্দদাস।

ভানুসিংহের পদাবলী বৈষ্ণব পদাবলী-প্রভাবিত রবীন্দ্রমনেরই ফসল। কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব কেবলমাত্র ভানুসিংহের পদাবলীতেই এসে শেষ হয়ে যায় নি, তা সবে শুরু হয়েছে ও পরে এর প্রভাবে কবির গীতসৃষ্টি আরো বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠেছে।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, যেহেতু এই পদাবলীর গান বিভিন্ন সময়ে রচিত হয়েছিল, সেজন্যে এদের মধ্যে ভাবের খুব একটা পারম্পর্য পাওয়া যায় না ; সে কারণে তাকে একটি নাট্যের মালা হিসেবে বিবেচনা করা বা রূপ দেওয়ার কিছুটা অসুবিধে আছে। পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতনে বিশেষ করে ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর উদ্যোগে এর ভেতর আরো কিছু রবীন্দ্র-সংগীত, যথা, 'ওগো শোনো কে বাজায়', 'তোরা শুনিস নি কি শুনিস নি তার পায়ের ধ্বনি', 'ওই শুনি যেন চরণধ্বনি রে', 'এখনো তারে চোখে দেখি নি', প্রভৃতি সংযোজন করে এবং একটি ভজন গান ও মন্ত্র উপস্থাপনা করে, একে বৈষ্ণব পদাবলীর রাধাকৃষ্ণের পূর্বরাগ, অভিসার, মান, বিরহ, মিলন ইত্যাদি রসকে পরিস্ফুট করে একটি নৃত্যনাট্যের রূপ দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। তবে মনে রাখতে হবে যে এই প্রচেষ্টা রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর করা হয়েছে ও রবীন্দ্রনাথ ভানু-সিংহের পদাবলীর এই নতুন ও পরিবর্ধিত রূপ দেখে যান নি।

এই যুগে রচিত কীর্তনাঙ্গ গানের মধ্যে 'আমি জেনে শুনে তবু' ও 'ওহে জীবনবল্লভ' গানগুলি আখরযুক্ত ও 'আমি নিশিদিন তোমায়' গানটি তাল-ফেরতা।

গোড়ার দিকে রবীন্দ্রনাথ কিছু প্রেমসংগীত রচনা করেছিলেন ও তাতে তিনি কিছুটা তৎকাল-প্রচলিত রীতি দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। এই-সব প্রেম-সংগীতের পশ্চাৎপটে প্রচ্ছন্নভাবে ছিল রাধাকৃষ্ণের প্রেমের কাহিনী। তবে তাঁর গানে বৈষ্ণবকাব্যের পূর্বরাগ, অভিসার, মান, বিরহ ইত্যাদি চিরাচরিত রাধাকৃষ্ণের প্রেমের কাহিনী বা প্রতীককে পরিত্যাগ করে মানবিক প্রেমের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হচ্ছিল।

সখী সে গেল কোথায়, তারে ডেকে নিয়ে আয়
দাঁড়াব ঘিরে তরুতলায়।
অথবা, বনে এমন ফুল ফুটেছে
মান করে থাকা আর কি সাজে।

ইত্যাদি গানগুলিতে বৈষ্ণব কাব্যের প্রভাব স্পষ্ট ধরা পড়ে। রবীন্দ্রনাথ সেই অল্প বয়সেই মানুষের ব্যক্তিগত সুখদুঃখ বা আবেগের সঙ্গে গানগুলিকে যুক্ত করতে পেরেছিলেন। সেই প্রভাব এখানেই থেমে থাকে নি, পরবর্তীকালে রচিত 'মরিলো মরি আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে', 'এখনো তারে চোখে দেখি নি',

'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার', 'ঝরঝর বরিষে বারিধারা' প্রভৃতি গানে, এরূপ প্রয়োগ আরো প্রসারলাভ করেছিল।

এই ধারার প্রয়োগকে ভালো ভাবে বোঝাবার জন্যে 'ঝরঝর বরিষে বারিধারা' গানটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। এই গানটিতে যদিও বৈষ্ণব কবিতা বা রাধাকৃষ্ণের কোনো উল্লেখ নেই তবুও মনের অজান্তে বর্ষাভিসারিকা রাধার একটি চিত্র যেন অজ্ঞাতে আমাদের সামনে মূর্ত হয়ে ওঠে। সে চিত্র আরো পরিস্ফুট পরবর্তী কলিতে 'অধীরা যমুনা তরঙ্গ আকুলা···তিমির দুকুলারে'।

এই পঙ্‌ক্তিতে ভয়বিহ্বলা অভিসারিকা রাধার অসহায়তা তরঙ্গ-আকুলা যমুনার চিত্রে আমাদের মনে দেখা দেয়।

আবার কিছু প্রেমের গান, যথা 'হল না হল না সই হায় মরমে মরমে লুকানো রহিল বলা হল না' বা 'ও কেন চুরি করে চায়/নুকোতে গিয়ে হাসি হেসে পালায়' প্রভৃতিতে নিধুবাবুর বৈঠকী সংগীতের প্রভাব এবং 'সখি ওই বুঝি বাঁশি বাজে' গানে যেন তৎকালীন প্রচলিত থিয়েটারী সুরের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

অবশ্য এই প্রভাব তাঁর উপর বেশিদিন থাকে নি ও কিছুদিন পরই, বিশেষ করে মায়ার খেলা গীতিনাট্যের রচনাকাল থেকেই তাঁর প্রেমসংগীত দেহাতীত একটা নতুন পথে মোড় নিয়েছে।

গীতিনাট্য ও নাট্যসংগীত

এই যুগে রবীন্দ্রনাথ তিনটি গীতিনাট্য রচনা করেন সেগুলি হল যথাক্রমে বাল্মীকি-প্রতিভা, কালমৃগয়া ও মায়ার খেলা।

বাল্মীকি-প্রতিভা গীতিনাট্যের কিভাবে জন্ম হয়েছিল তা রবীন্দ্রনাথের জবানিতেই শোনা যাক—

"এই দেশী ও বিলাতি সুরের চর্চার মধ্যে বাল্মীকি-প্রতিভার জন্ম হইল। ইহার সুরগুলি অধিকাংশই দিশি, কিন্তু এই গীতিনাট্যে তাহাকে তাহার বৈঠকি মর্যাদা হইতে অন্যক্ষেত্রে বাহির করিয়া আনা হইয়াছে। উড়িয়া চলা যাহার ব্যবসায় তাহাকে মাটিতে দৌড় করাইবার কাজে লাগানো গিয়াছে। যাঁহারা এই গীতিনাট্যের অভিনয় দেখিয়াছেন তাঁহারা, আশা করি, এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, সংগীতকে এইরূপ নাট্যকার্যে নিযুক্ত করাটা অসংগত বা নিষ্ফল হয় নাই। বাল্মীকি-প্রতিভা গীতিনাট্যের ইহাই বিশেষত্ব।··· বাল্মীকি-প্রতিভার অনেকগুলি গান বৈঠকি-গান-ভাঙা, অনেকগুলি জ্যোতিদাদার রচিত

গতের সুরে বসানো এবং গুটিতিনেক গান বিলাতি সুর হইতে লওয়া। আমাদের বৈঠকি গানের তেলেনা অঙ্গের সুরগুলিকে সহজেই এইরূপ নাটকের প্রয়োজনে ব্যবহার করা যাইতে পারে; এই নাট্যে অনেকস্থলে তাহা করা হইয়াছে। বিলাতি সুরের মধ্যে দুইটিকে ডাকাতদের মত্ততার গানে লাগানো হইয়াছে এবং একটি আইরিশ সুর বনদেবীর বিলাপগানে বসাইয়াছি। বস্তুত, বাল্মীকি-প্রতিভা পাঠযোগ্য কাব্যগ্রন্থ নহে, উহা সংগীতের একটি নতুন পরীক্ষা; অভিনয়ের সঙ্গে কানে না শুনিলে ইহার কোনো স্বাদগ্রহণ সম্ভবপর নহে। য়ুরোপীয় ভাষায় যাহাকে অপেরা বলে বাল্মীকি-প্রতিভা তাহা নহে, ইহা সুরে নাটিকা; অর্থাৎ সংগীতই ইহার মধ্যে প্রাধান্যলাভ করে নাই, ইহার নাট্যবিষয়টাকে সুর করিয়া অভিনয় কবা হয় মাত্র, স্বতন্ত্র সংগীতের মাধুর্য ইহার অতি অল্পস্থলেই আছে।"

—'জীবনস্মৃতি'।

অন্য এক জায়গায় বলেছেন, "বাল্মীকি-প্রতিভা ও কালমৃগয়া যে উৎসাহে লিখিয়াছিলাম সে উৎসাহে আর-কিছু রচনা করি নাই। এই দুটি গ্রন্থে আমাদের সেই সময়কার একটা সংগীতের উত্তেজনা প্রকাশ পাইয়াছে। জ্যোতিদাদা তখন প্রত্যহই প্রায় সমস্ত দিন ওস্তাদি গানগুলিকে পিয়ানো যন্ত্রের মধ্যে ফেলিয়া তাহাদিগকে যথেচ্ছা মন্থন করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন। তাহাতে ক্ষণে ক্ষণে রাগিণী-গুলির এক-একটি অপূর্বমূর্তি ও ভাবব্যঞ্জনা প্রকাশ পাইত। যে-সকল সুর বাঁধা নিয়মের মধ্যে মন্থর গতিতে দস্তুর রাখিয়া চলে তাহাদিগকে প্রথাবিরুদ্ধ বিপর্যস্তভাবে দৌড় করাইবামাত্র সেই বিপ্লবে তাহাদের প্রকৃতিতে নূতন নূতন অভাবনীয় শক্তি দেখা দিত এবং তাহাতে আমাদের চিত্তকে সর্বদা বিচলিত করিয়া তুলিত। সুরগুলো যেন নানাপ্রকার কথা কহিতেছে, এইরূপ আমরা স্পষ্ট শুনিতে পাইতাম। আমি ও অক্ষয়বাবু অনেক সময়ে জ্যোতিদাদার সেই বাজনার সঙ্গে সঙ্গে সুরে কথা যোজনার চেষ্টা করিতাম। কথাগুলি যে সুপাঠ্য হইত তাহা নহে, তাহারা সেই সুরগুলির বাহনের কাজ করিত।

এইরূপ একটা দস্তুরভাঙা গীতবিপ্লবের প্রলয়ানন্দে এই দুটি নাট্য লেখা। এইজন্য উহাদের মধ্যে তাল-বেতালের নৃত্য আছে এবং ইংরেজী-বাংলার বাছ-বিচার নাই।"

—'জীবনস্মৃতি'।

বাল্মীকি-প্রতিভা গীতিনাট্যে বিলাতি গান ছাড়াও হিন্দুস্থানী গানের প্রভাব আছে। তা ছাড়া বৈষ্ণবকবি, দাশরথি রায়, কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তলা, বিহারীলাল চক্রবর্তী, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী— এঁদের প্রভাবও রয়েছে।

'তিমির দিগভরি ঘোর যামিনী'

'রিম ঝিম ঘন ঘনরে বরষে'

প্রভৃতি পদে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব। 'এখনি মুণ্ড করিব খণ্ড, খবর্দার রে খবর্দার', 'নিতান্ত তোমারে দেখি কৃতান্ত' প্রভৃতিতে দাশরথি রায়ের প্রভাব বর্তমান। 'তরাসে চমকিয়ে হরিণ হরিণী' কালিদাসকে মনে করিয়ে দেয়। এই নাটকের 'রাঙা

পাদপদ্মযুগে প্রণমি গো ভবদারা' এবং 'এত রঙ্গ শিখেছ কোথা' গান দুটি অক্ষয়-চন্দ্র চৌধুরীর রচনা। 'কোথা সে উষাময়ী প্রতিমা', 'যাও লক্ষ্মী অলকায়' প্রভৃতি ছত্রে সারদামঙ্গল কাব্যের অংশবিশেষের প্রভাব আছে। 'এই যে হেরিগো দেবী আমারি'—গানটিতে দ্বিজেন্দ্রনাথের 'স্বপ্ন-প্রয়াণ' কাব্যের 'জয় জয় পরব্রহ্ম' গানটির কিছু প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

দেশী ও বিলাতি যে-সব গান ভেঙে রবীন্দ্রনাথ এই নাটকে ব্যবহার করেছিলেন তার একটি তালিকা নীচে দেওয়া হল :

	মূল গান	অবলম্বনে রবীন্দ্রসংগীত
১	দারাদ্রিম তা না না	অহো আস্পর্ধা একি
২	মনকী কমল দল খোলিয়া	এই যে হেরি গো দেবী
৩	চতুরঙ্গ রসসন	এইবেলা সবে মিলে
৪	রিমি ঝিমি রিমি ঝিমি	রিম ঝিম ঘন ঘন রে
৫	হালমে রবে রবা	হায় কী দশা হল আমার
৬	Nancy Lee	কালী কালী বলো রে
৭	Go where glory waits thee	মরি ও কাহার বাছা

বাল্মীকি-প্রতিভা ছাড়াও তিনি সেই সময় আর একটি গীতিনাট্য রচনা করেছিলেন, তার নাম কালমৃগয়া। এই গীতিনাট্যটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "বাল্মীকি-প্রতিভার গান সম্বন্ধে এই নূতন পন্থায় উৎসাহ বোধ করিয়া এই শ্রেণীর আর-একটি গীতিনাট্য লিখিয়াছিলাম তাহার নাম কালমৃগয়া··· পরে এই গীতিনাট্যের অনেকটা অংশ বাল্মীকি প্রতিভার সঙ্গে মিশাইয়া দিয়া-ছিলাম···বাল্মীকি-প্রতিভার দ্বিতীয় সংস্করণে কালমৃগয়ার অনেকখানি অংশ অন্তর্ভুক্ত হওয়াতে এটি আর পৃথক গ্রন্থ হিসাবে ছাপানো হয় নাই।"

—রবীন্দ্র-রচনাবলী ১, বিশ্বভারতী।

কালমৃগয়া গীতিনাট্যে নিম্নলিখিত বিলাতি গানগুলির সুরের সাহায্য নেওয়া হয়েছিল :

	মূল গান	অবলম্বনে রবীন্দ্রসংগীত
১	The Vicar of Bray	ও দেখবি রে ভাই
২	The British Grenadiers	তুই আয় রে কাছে
৩	The banks and braes	ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে
৪	Go where glory waits thee	মানা না মানিলি
৫	Robin Adair	সকলি ফুরালো

কালমৃগয়া গীতিনাট্যের অধিকাংশ গানের সুরই মার্গসংগীতের উপর ভিত্তি করে রচিত। মিশ্র ভূপালী, মিশ্র খাম্বাজ, ছায়ানট, গৌড়মল্লার, বাহার, দেশ—এইরূপ অনেক রাগ-রাগিণী এই নাটকে প্রযুক্ত হওয়াতে এর গানগুলি একটু সুরপ্রধান হয়ে উঠেছে।

বাল্মীকি-প্রতিভা ও কালমৃগয়া গীতিনাট্যে তিনি সংগীতকে নাট্যকার্যে নিযুক্ত করেছেন ও রাগ-রাগিণীকে নানা ভাবের বাহন করে খাড়া করার পরীক্ষা করেছেন। কিভাবে করেছেন তা পরিষ্কার বোঝা যাবে যদি আমরা বাল্মীকি-প্রতিভায় ক্রোধের গান 'অহো আস্পর্ধা একী', কান্নার গান 'হা, কী দশা হল আমার' ও বিস্ময়ের গান 'এ, কী এ, এ কী এ, স্থির চপলা' গানগুলি পর্যালোচনা করি। এই দুটি গীতিনাট্য রচনা করার সময় রবীন্দ্রনাথ হার্বার্ট স্পেনসারের একটি লেখা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। হার্বার্ট স্পেনসারের মত ছিল যে আমাদের কথা বলার সময় মনের ভাবের সঙ্গে আমাদের কণ্ঠ যে ওঠা-নামা করে তাকে একটু রূপান্তরিত করে নিলেই গানে পরিণত হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ এই মতের সমর্থন করে লিখেছিলেন, "আমরা যখন রোদন করি তখন দুইটি পাশাপাশি সুরের মধ্যে ব্যবধান অতি অল্পই থাকে, রোদনের স্বর প্রত্যেক কোমল সুরের উপর দিয়া গড়াইয়া যায়, সুর অত্যন্ত টানা হয়। আমরা যখন হাসি হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, কোমল সুর একটিও লাগে না, টানা সুর একটিও নাই ...দুঃখের রাগিণী দুঃখের রজনীর ন্যায় অতি ধীরে ধীরে চলে, তাহাকে প্রতি কোমল সুরেব উপর দিয়া যাইতে হয়। আর সুখের রাগিণী সুখের দিবসের ন্যায় অতি দ্রুত-পদক্ষেপে চলে, দুই-তিনটা বরিয়া সুর ডিঙাইয়া যায়।"

—"সংগীত ও ভাব"।

অন্য জায়গায বলেছেন, "হার্বার্ট স্পেনসারের একটা লেখার মধ্যে পড়িয়াছিলাম যে, সচরাচর কথার মধ্যে যেখানে একটু হৃদয়াবেগের সঞ্চার হয় সেখানে আপনিই কিছু না কিছু সুর লাগিয়া যায়। বস্তুত, রাগ দুঃখ আনন্দ বিস্ময় আমরা কেবলমাত্র কথা দিয়া প্রকাশ কবি না কথার সঙ্গে সুর থাকে। এই কথাবার্তার আনুষঙ্গিক সুরটারই উৎকর্ষসাধন করিয়া মানুষ সংগীত পাইয়াছে। স্পেন-সারের এই কথাটা মনে লাগিয়াছিল।"

—'জীবনস্মৃতি'।

এই দুটি গীতিনাট্যে সংগীতকে নাট্যকার্যে নিযুক্ত করা ও রাগ-রাগিণীকে নানা ভাবের বাহন রূপে খাড়া ও পরীক্ষা করা ছাড়াও আর-একটি জিনিসের পরীক্ষা করেছিলেন, সেটি হল নাটকে ছন্দছুট গদ্যকাব্যের ব্যবহার, যার পরিণত ও সার্থক রূপ আমরা পরবর্তীকালে নৃত্যনাট্যগুলিতে, বিশেষ করে চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্যে দেখতে পেয়েছিলাম।

এরূপ ছন্দছুট গদ্যকাব্যের দৃষ্টান্ত হল—

'আয় লো সজনী, সবে মিলে—
ঝরঝর বারিধারা,
মৃদু মৃদু গুরু গুরু গর্জন—
এ বরষা-দিনে

হাতে হাতে ধরি ধরি
গাব মোরা লতিকা-দোলায় দুলে।'

—কালমৃগয়া

'রাজা মহারাজা কে জানে, আমিই রাজাধিরাজ।
তুমি উজির, কোতোয়াল তুমি,
ওই ছোঁড়াগুলো বর্কন্দাজ।
যত সব কুঁড়ে আছে ঠাঁই জুড়ে,
কাজের বেলায় বুদ্ধি যায় উড়ে।
পা ধোবার জল নিয়ে আয় ঝট্,
কর তোরা সব যে যার কাজ।'

—বাল্মীকি-প্রতিভা।

মায়ার খেলা

এবার গীতিনাট্য মায়ার খেলা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

এই নাটকের রচনা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "ইহার অনেককাল পরে 'মায়ার খেলা' বলিয়া আর-একটি গীতিনাট্য লিখিয়াছিলাম কিন্তু সেটা ভিন্ন জাতের জিনিষ। তাহাতে নাট্য মুখ্য নহে গীতই মুখ্য। বাল্মীকি-প্রতিভা ও কালমৃগয়া যেমন গানের সূত্রে নাট্যের মালা, মায়ার খেলা তেমনি নাট্যের সূত্রে গানের মালা। ঘটনাস্রোতের 'পরে তাহার নির্ভর নহে, হৃদয়াবেগই তাহার প্রধান উপকরণ। বস্তুত, 'মায়ার খেলা' যখন লিখিয়াছিলাম তখন গানের রসেই সমস্ত মন অভিষিক্ত হইয়াছিল।

"মায়ার খেলায় গানগুলিকে গাঁথা হয়েছিল নাট্যসূত্রে। ইহাতে সমস্তই কেবল গান, পাঠোপযোগী কবিতা অতি অল্প।

"মায়ার খেলায় গানের ভিতর দিয়ে অল্প যে একটুখানি নাট্য দেখা দিচ্ছে সে হচ্ছে এই যে, প্রমদা আপনার স্বভাবকেই জানতে পারে নি অহংকারে, অবশেষে ভিতর থেকে বাজল বেদনা, ভাঙল মিথ্যে অহংকার, প্রকাশ পেল সত্যকার নারী।"

—রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১, ১৩৪৬ সংস্করণ।

রবীন্দ্রনাথের এই-সব উক্তি থেকে মনে হয় যে বাল্মীকি-প্রতিভা ও কালমৃগয়া নাট্যে আখ্যানবস্তু হল মুখ্য ও নানাপ্রকার সুরের আশ্রয়ে আখ্যানবস্তুকে রূপ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু মায়ার খেলাতে গানই হল মুখ্য, নাট্যের সূত্রে গান-গুলিকে গ্রথিত করা হয়েছে।

মায়ার খেলার প্রকাশকাল ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দ। প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আমার পূর্বরচিত একটি অকিঞ্চিৎকর গদ্যনাটিকার [নলিনী] সহিত এ গ্রন্থের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। পাঠকেরা ইহাকে তাহারই সংশোধন স্বরূপে গ্রহণ করিলে বাধিত হইব।"

এই গীতিনাট্য রবীন্দ্রনাথ যখন রচনা করেন তখন তিনি সংগীত-রচনায় শিক্ষানবিশী ভাবটা অনেকটা কাটিয়ে উঠেছেন ও এই নাটকের সংগীত-রচনায় তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রভাব থেকে অনেকটা মুক্ত।

এই নাটকে গোঁড়া ক্ল্যাসিক্যাল সংগীত ও বিলাতি গানের প্রভাবও অনেকটা কমে এসেছে ও এতে ভাঙা গানের সংখ্যাও বেশি নয়।

'আহা আজি এ বসন্ত' টমাস ম্যুরের আইরিস মেলডিজ 'Go where glory waits thee' ভেঙে রচিত ও 'বিদায় করেছ যারে' গানটি রচিত হয়েছে হিন্দুস্থানী 'বাজে ঝনন মোরি পায়েলিয়া' গানটি ভেঙে। আর একটি গান 'দে লো সখি দে'-তে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রভাব আছে বলে মনে হয়। এটি শুনলেই মনে হয় যেন পিয়ানোর গৎ ভেঙে এটি রচিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন এই নাটকে গীতই হল মুখ্য সেজন্য এর সংগীত উৎকৃষ্টতর ও এর অনেক গান— যথা : আমার পরাণ যাহা চায়, বিদায় করেছ যারে নয়নজলে, আমি জেনে শুনে বিষ করেছি পান, দিবস রজনী, ওকে বলো সখী বলো প্রভৃতি গান, কথা ও সুরের মিলনে সার্থক ও স্বতন্ত্র ভাবে গাওয়া যায় এবং গাওয়াও হয়ে থাকে।

অমরের মুখে গাওয়া 'দিবস রজনী' গানটিতে 'আশায় আশায় থাকি' সুরারোপে

না্	না্	সা	|	রা	পা	-া	মা	জ্ঞমজ্ঞা	রা	|	গা	-া -া
আ	শা	য়	|	আ	শা	য়্	থা	০ ০ ০	০	|	কি	০ ০

যেন প্রতীক্ষার সেই আকুলতা মূর্ত হয়ে উঠেছে। বেহাগ রাগে রবীন্দ্রনাথ অসংখ্য গান সৃষ্টি করেছেন ও এই নাটকে বেহাগে প্রযুক্ত 'বলো সখি বলো' গানটিতে যেন সেই সার্থক সুরস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের দেখা মেলে।

রবীন্দ্রনাথ কীর্তনের মাঝে নাট্যরসের সন্ধান পেয়েছিলেন ও তাকে মায়ার খেলা নাটকে কীর্তনাঙ্গ গান 'সখি বহে গেল বেলা'র মাধ্যমে নাটকে বিশেষ পরিবেশ রচনার কাজে ব্যবহার করেছেন। এই গানটি মায়ার খেলা গীতিনাট্যের তৃতীয় দৃশ্যে আছে। প্রমদা যখন সখীদের সঙ্গে আমোদপ্রমোদে মত্ত সেই উল্লাস ও আনন্দঘন মুহূর্তে হঠাৎ একটি সখীর মুখে গাওয়া এই কীর্তনের সুরের গানটি এমন এক ভিন্ন পরিবেশের সৃষ্টি করে যে তখন তা শ্রোতাদের মনকে পূর্বমুহূর্তের হালকা পরিবেশ থেকে উত্তীর্ণ করে একটা ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে এনে ফেলে দেয়।

মায়ার খেলা নাটকটি মূলত প্রেম-বিষয়ক ও এতে প্রেম পর্যায়ের বেশ-কিছু গান আছে। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে এই-সব গানে প্রেমের লালসা বা দৈহিক আবেদন প্রথম থেকেই উপেক্ষিত হয়েছে ও রসালো সেই প্রেমসংগীতের যুগে মায়ার খেলাতে দেহাতীত যে প্রেমের গান 'আমার পরাণ যাহা চায়' বা 'বিদায় করেছ যারে নয়নজলে' সদৃশ গান লিখতে পেরেছিলেন সুরের বেদনার্ত

ব্যঞ্জনায় সেগুলি যেমন অনবদ্য, বাণীপ্রকাশের গভীরতায় তেমনি অনন্য।

একেবারে গোড়ার দিককার রচিত তাঁর প্রেমসংগীতে যদিও বা কিছুটা তৎকালীন প্রচলিত বৈঠকী গানের প্রভাব ছিল, 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্যে রবীন্দ্রনাথ সে প্রভাবের উর্ধ্বে উঠে এক স্বতন্ত্র ধারার প্রেমসংগীত রচনা করেছেন। সেই দিক থেকে এবং কথা ও সুরের সামঞ্জস্যের দিক দিয়ে বিবেচনা করলে মায়ায় খেলা গীতিনাট্যের গানগুলির রবীন্দ্রনাথের সংগীতসৃষ্টির পরিণতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

প্রথম যুগের সংগীত সৃষ্টির সারাংশ

১. এই যুগকে অনেকটা রবীন্দ্রনাথের সংগীত-রচনার শিক্ষানবীশ যুগ বলা চলে। এই যুগে রাগাশ্রয়ী ও ভারী ভারী তালের উপর রচিত সুরধর্মী গানেরই প্রাধান্য।

এই রাগাশ্রয়ী সুরধর্মী গানের মধ্যে বেশ-কিছু গান হিন্দুস্থানী গান ভেঙে রচনা করা হয়েছে কিন্তু এরি মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট স্বকীয়তা দেখিয়েছেন।

স্বাধীনভাবে কিছু রাগাশ্রয়ী ও রাগভিত্তিক গানও রচনা করেছেন ও তাদের মধ্যে কিছু উৎকৃষ্ট ও মৌলিক সংগীত রচনার সাক্ষাৎ মেলে।

২. তাঁর এ যুগের ধর্ম বা ব্রহ্মসংগীত রাগাশ্রয়ী গানের উপর ভিত্তি করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে রচিত হয়েছে বলে ও এ-যুগের শাস্ত্রীয় সংগীত অবলম্বনে রচিত গানের বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে বলে ব্রহ্মসংগীত নিয়ে আলাদা-ভাবে আলোচনা করা হল না। তবে সংক্ষেপে বলা যায় যে এই যুগের ধর্মসংগীতগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভাব ও ভাষার দিক দিয়ে ব্রহ্মসংগীতই রয়ে গেছে— পূজার গানে রূপান্তরিত হয় নি।

৩. অন্যান্য ধারায় রচিত বাংলা গানে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, অক্ষয় চৌধুরী, নিধুবাবু ও তৎকালীন প্রচলিত বাংলা গানের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

৪. এই যুগের রচিত গানে বাংলাদেশের প্রচলিত কীর্তন ও লোক-সংগীতের, যথা : বাউল, ভাটিয়ালী, সারী— এই-সব ধারার গানের প্রভাব অপেক্ষাকৃত কম।

৫. ঋতুসংগীত যাতে উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথ একপ্রকার সিদ্ধিলাভ করেছিলেন তার বিশেষ সাক্ষাৎ এ যুগের গানে পাওয়া যায় না।

৬. এ যুগের স্বদেশী গানে কথা ও সুরারোপে তিনি তাঁর পূর্বসূরী হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ—এঁদেরকেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুসরণ করেছেন ও গানগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রাগ-রাগিণীর উপরে ভিত্তি করে রচনা করা হয়েছে, তবে লোকসংগীতের (রামপ্রসাদী) সুরে এই

যুগের স্বদেশী গান হল 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে'—যা কলিকাতায় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে কবি গেয়ে শোনান (১৮৮৬ ডিসেম্বর)। এই যুগে রচিত স্বদেশী গানের মধ্যে ভৈরবীতে রচিত 'অয়ি ভুবনমনোমোহিনী' গানটি একটু স্বাতন্ত্র্যের দাবি রাখে।

এই গানটি বিশেষ একটি উপলক্ষে ফরমাইসে রচিত হয়। বিপিনচন্দ্র পাল ও অন্যান্য কয়েকজন স্বদেশী নেতার বিশেষ অনুরোধে দুর্গাপ্রতিমার সঙ্গে দেশের মূর্তি মিলিয়ে কবি এই গানটি রচনা করেন। কিন্তু এ গান রচনা করে কবি সন্তুষ্ট হন নি, কারণ "এ গান সর্বজনীন ভারতরাষ্ট্রসভায় গাওয়ার উপযুক্ত নয়, কেননা এ কবিতাটি একান্তভাবে হিন্দু সংস্কৃতি আশ্রয় করে রচিত। অহিন্দুর এটা সুপরিচিত ভাবে মর্মঙ্গম হবে না"।[১] অন্যদিকে যাঁদের অনুরোধে এই গানটি রচিত তাঁদেরও এ গান পুরোপুরি পছন্দ হয় নি, কারণ "এ গান পূজা-মণ্ডপের যোগ্য নয়"।[১]

৭. বাল্মীকি-প্রতিভা ও কালমৃগয়া গীতিনাট্যের গান যদিও অনেক ক্ষেত্রে অন্যদের দ্বারা প্রভাবিত, কিন্তু এই দুটি নাটকে আমরা দুটি জিনিস পাই যার গুরুত্ব যথেষ্ট ও যা তাঁর পরবর্তী সংগীতসৃষ্টিতে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল।

তার মধ্যে একটি হল হার্বার্ট স্পেনসারের প্রভাবে মানুষের মনের ভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সুরের প্রয়োগে নাট্যসংগীত সৃষ্টি করা ও মানুষের মনের বিভিন্ন অনুভূতি, যথা সুখ, দুঃখ, শান্তি, বিরহ, মিলন ইত্যাদি বিভিন্ন সুরের প্রক্ষেপণ দ্বারা ধরবার চেষ্টা।

দ্বিতীয় জিনিস হল সংলাপধর্মী গদ্যগানের স্বল্প ব্যবহার যার পরিণত রূপ আমরা পাই পরবর্তী সংগীতসৃষ্টিতে, বিশেষভাবে নৃত্যনাট্যগুলিতে। মায়ার খেলা গীতিনাট্যের সুরসৃষ্টিতে একটা পরিণতির ভাব লক্ষ্য করা যায় এবং কথা ও সুরের সার্থক মিলনের একটা প্রচেষ্টা এই গীতিনাট্যের গানগুলিতে বিশেষভাবে ধরা পড়ে, যার ফলে গানগুলি বিশেষভাবে সমৃদ্ধ ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

তা ছাড়া দেহাতীত প্রেমসংগীত যা তাঁর পরবর্তীকালে রচিত প্রেমসংগীত-গুলিকে পূজার উপান্তে এনে উপস্থিত করেছে তার সূচনা বা সৃষ্টি লক্ষ্য করা যায় মায়ার খেলা গীতিনাট্যের গানগুলিতে।

যে-কোনো সুরকার বা সংগীতশিল্পীর প্রারম্ভিক জীবনে সঠিক শিক্ষা-গ্রহণের প্রয়োজন হয় ও সেই সময় সংগীতের বিভিন্ন ধারার অনুসৃত আদর্শ-গুলিকে গ্রহণ করতে হয় ও তার সেইসময়কার সংগীত-রচনার মধ্যে সে-সব শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রভাব থাকা খুবই স্বাভাবিক। নানাবিধ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান সঞ্চয়নের মধ্য দিয়ে পরবর্তীকালে আপন সংগীতসৃষ্টির মৌলিক বিকাশ হয়।

১ পুলিনবিহারী সেনকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র।

সেইভাবে এই যুগে বিভিন্ন ধারার সংগীতের অনুসরণ করে রবীন্দ্রনাথ যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন তা তাঁকে পরবর্তীকালে স্বাধীন সংগীতস্রষ্টা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে সাহায্য করেছে। তবে এই যুগের কবির সংগীত-সৃষ্টিকে আমরা অনুসরণ বলতে পারি, অনুকরণ নয়, কারণ বিভিন্ন ধারার সংগীতের আদর্শকে অবলম্বন করে গান রচনা করলেও তারই মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট স্বকীয়তা দেখিয়েছেন ও এই যুগের শেষভাগে এমন সব উৎকৃষ্ট রচনা পাই যা কালজয়ী হয়ে এখনো আমাদের চিত্তকে অভিভূত করে রাখে।

একটা আদর্শ কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর গোড়ার সংগীতসৃষ্টি থেকেই অনুসরণ করে আসছিলেন। সেটা হল—(ক) কথা ও সুরের সমন্বয়ে সংগীত রচনা ও (খ) গানে অলংকরণের আতিশয্য যা গানের কাব্যাংশকে আচ্ছন্ন বা ক্ষুণ্ণ করতে পারে, তাব বর্জন।

এই যুগের রবীন্দ্রনাথের জীবন পর্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে তিনি দুইবার বিলাত ভ্রমণে গিয়েছিলেন। দ্বিতীয়বার অবশ্য স্বল্পকালের জন্য। ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে তাঁর বিয়ে হয়। এর কিছুকাল পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু হয়, তিনি রবীন্দ্রনাথের সংগীত ও সাহিত্য সৃষ্টিতে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে কংগ্রেস অধিবেশন উপলক্ষে রামপ্রসাদী সুরে 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে' স্বদেশী গানটি রচনা করেন ও অধিবেশনে তা নিজে গেয়ে শোনান। ১৮৮৯।৯০ খ্রীস্টাব্দে শিলাইদহে জমিদারির ভার গ্রহণ করেন। এ যুগে দুইবার বিলাত ভ্রমণ বাদ দিলে বেশিরভাগ সময়ই তাঁর কাটে জোড়াসাঁকো, আমেদাবাদ, কারোয়ার, গাজীপুর, সোলাপুর, শিলাইদহ, উড়িষ্যা, সাজাদপুর, পতিসর, ইত্যাদি অঞ্চলে। এর মধ্যে আমেদাবাদের একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে কারণ এখানেই কবি তাঁর কবিতায প্রথম স্বাধীনভাবে সুরারোপ করেছিলেন।

শান্তিনিকেতনে স্থায়িভাবে বসবাস শুরু করেন নি বলে এই যুগের সংগীত-সৃষ্টিতে আমরা আশ্রম-জীবনের বা শান্তিনিকেতনের প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব বিশেষ পাই না।

শিলাইদহে শোনা বাউলের গান ও লোকগীতি তখনো তাঁর সংগীতসৃষ্টিতে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে নি।

এ যুগে সংগীত সম্বন্ধে তাঁর ৩টি প্রবন্ধের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়: সংগীত ও ভাব (জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮), সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা (আষাঢ় ১২৮৮), সংগীত ও কবিতা (মাঘ ১২৮৮)। এর মধ্যে সংগীত ও ভাব প্রবন্ধটি বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে কারণ এই প্রবন্ধে তিনি রাগ-রাগিণীকে ভাবের বাহনরূপে প্রযুক্ত করার পক্ষে যুক্তি দেখান: "যদি মধ্যমের স্থানে পঞ্চম দিলে ভালো শুনায় আর তাহাতে বর্ণনীয় ভাবের সহায়তা করে তবে জয়জয়ন্তী মরুন বা

বাঁচুন আমি তাহাই বহাল রাখিব না কেন?" এই প্রসিদ্ধ উক্তিটি, যা তাঁর পরবর্তী সংগীতসৃষ্টিকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করেছে তা সন্নিবেশিত হয়েছে।

আর 'সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা' প্রবন্ধে, হার্বার্ট স্পেনসারের মত, যা বাল্মীকি-প্রতিভা গীতিনাট্যের আলোচনার সময় উল্লেখ করা হয়েছে তার ব্যাখ্যা করেন।

তাঁর তরুণ বয়সের লেখা 'সংগীত ও ভাব' প্রবন্ধটি পড়লেই বোঝা যায় যে বাংলা গানের গতিপ্রকৃতি কী ধারায় হওয়া উচিত ও তাতে রাগ-রাগিণীর প্রয়োগ সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা তাঁর গোড়া থেকেই ছিল, যদিও তাকে বাস্তব রূপ দিতে পেরেছিলেন তাঁর পরবর্তী সংগীতসৃষ্টিতে।

গানের তালিকা

প্রথম যুগ

১৮৭৭-১৯০০

ক্রমিক সংখ্যা গানের প্রথম কলি রাগ/তাল রচনাকাল/স্থান মন্তব্য

১ গগনের থালে রবিচন্দ্র দীপক:
জয়জয়ন্তী/ঝাঁপতাল ১৮৭৫/জোড়াসাঁকো মূলগান: গগনমে থাল
রবীন্দ্র-রচিত কিনা এ-বিষয়ে মতভেদ আছে

২ জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ:
জয়জয়ন্তী/একতাল ১৮৭৫/জোড়াসাঁকো

৩ তোমারি তরে মা সঁপিনু এ দেহ: জয়জয়ন্তী/একতাল

৪ শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা: মল্লার/ত্রিতাল ১৮৭৭/জোড়াসাঁকো

৫ গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে: ঝিঁঝিট/একতাল " "

৬ বজাও রে মোহন বাঁশি: মুলতান/ঢালাগান " "

৭ বলি ও আমার গোলাপবালা: বেহাগ/খেমটা ১৮৭৮/আমেদাবাদ

৮ আঁধার শাখা উজল করি: গৌড়সারং; ঝাঁপতাল " "

৯ নীরব রজনী দেখো মগ্ন জোছনায়: মিশ্র/মধ্যমান " "

১০ শুন নলিনী খোল গো আঁখি: ললিত/খেমটা " "
—অনেকে এই ক'টি গানকে রবীন্দ্রনাথের নিজের সুর দেওয়া প্রথম গান বলে মনে করেন।

১১ গোলাপ ফুল ফুটিয়ে আছে: পিলু/ঝাঁপতাল ১৮৭৮/জোড়াসাঁকো

১২ আয় তবে সহচরী: ছায়ানট/ত্রিতাল ১৮৮০

১৩ একসূত্রে বাঁধিয়াছি: দাদরা ১৮৮০/জোড়াসাঁকো
—গানটি রবীন্দ্রনাথের কিনা সে বিষয়ে মতভেদ আছে।

ক্রমিক সংখ্যা　গানের প্রথম কলি　রাগ/তাল　রচনাকাল/স্থান　মন্তব্য

১৪ তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা :
আলাইয়া/ঝাঁপতাল ১৮৮০/জোড়াসাঁকো

১৫ নাচ শ্যামা তালে তালে : খাম্বাজ/একতাল ১৮৮০/বিলাত

১৬ তুমি কিগো পিতা আমাদের :
রামকেলি/ত্রিতাল ১৮৮১/কলকাতা　রবীন্দ্রনাথের প্রথম ব্রহ্মসংগীত বলে অনুমান।

১৭ মহাসিংহাসনে বসি :
ভৈরবী/ঝাঁপতাল　১৮৮১　এটিও রবীন্দ্রনাথের প্রথম ব্রহ্মসংগীত বলে অনেকে মনে করেন।

১৮ আমরা যে শিশু অতি :
যোগিয়া/ঝাঁপতাল　১৮৮১　স্বামী বিবেকানন্দ গাইতেন

১৯ একি এ সুন্দর শোভা :
ইমনভূপালী/কাওয়ালি　„　„

২০ দিবা নিশি করিয়া যতন : ধুন/ত্রিতাল „　„

২১ কোথা আছে প্রভু :
ভজন সুর/একতাল　„ মূল রচনা : এক গুজরাটি ভজন

২২ সখী ভাবনা কাহারে বলে : বেহাগ খাম্বাজ/একতাল ১৮৮১

২৩ কিছুই তো হল না : ঝিঁঝিট/আড়ঠেকা　„

২৪ তুই রে বসন্ত সমীরণ : কাফি/ঝাঁপতাল　„

২৫ বসন্ত প্রভাতে এক মালতীর : মিশ্র গৌড়সারং/ঝাঁপতাল „

২৬ তরুতলে ছিন্নবৃন্ত মালতীর : মিশ্র গৌড়সারং/ঝাঁপতাল ১৮৮১/কলকাতা

২৭ মরণ রে তুঁহু মম : ভৈরবী/কাওয়ালি　„　„

২৮ শুভদিনে এসেছে দোঁহে :
বেহাগ/ত্রিতাল　১৮৮১　কলকাতা বিবাহ উৎসব উপলক্ষে রচিত

২৯ দুই হৃদয়ের নদী : সাহানা/ঝাঁপতাল ১৮৮১ কলকাতা　„

৩০ আজ তোমারে দেখতে এলেম :
ভৈরবী/দাদরা　„　„

৩১ সারা বরষ দেখি নে মা : মিশ্র/একতাল　„

৩২ বল্ গোলাপ মোরে বল্ : পিলু/খেমটা „

৩৩ আমি স্বপনে রয়েছি ভোর : মিশ্র আসাবরী/দাদরা ১৮৮১/বোম্বাই

৩৪ অনন্ত সাগরমাঝে : বাগেশ্রী/আড়াঠেকা ১৮৮২/জোড়াসাঁকো

৩৫ ও ভাই দেখে যা কত ফুল ফুটেছে :
খাম্বাজ/ত্রিতাল　১৮৮২/জোড়াসাঁকো　মূল রচনা : The British Grenadiers

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম কলি	রাগ/তাল	রচনাকাল/স্থান	মন্তব্য
৩৬	ও দেখবি রে ভাই আয়রে ছুটে :	মিশ্র খাম্বাজ/আড়খেমটা	১৮৮২/জোড়াসাঁকো	মূল রচনা : The Vicar of bray
৩৭	তুই আয়রে কাছে আয় :	মিশ্র খাম্বাজ/কাওয়ালি	১৮৮২/জোড়াসাঁকো	মূল রচনা : The British Grenadiers
৩৮	ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে :	বিলাতি সুর/খেমটা	১৮৮২/জোড়াসাঁকো	মূল রচনা : Ye banks and braes
৩৯	ঝম ঝম ঘন ঘন রে :	মল্লার/ত্রিতাল	"	রিম ঝিম ঘন ঘন রে
৪০	মানা না মানিলি :	মিশ্র বিলাবল/ত্রিতাল	"	মূল রচনা : Go where glory waits thee
৪১	বনে বনে সবে মিলে :	ইমনকল্যাণ/কাহারবা	"	বাল্মীকি-প্রতিভায় : এইবেলা সবে মিলে
৪২	যাও রে অনন্তধামে :	প্রভাতী/ঝাঁপতাল	"	
৪৩	অজ্ঞানে কর হে ক্ষমা	রাজবিজয়/ত্রিতাল	"	
৪৪	সকলি ফুরাল স্বপনপ্রায় :	ঝিঁঝিট খাম্বাজ/একতাল	"	মূল রচনা : Robin Adair
৪৫	দেখ চেয়ে দেখ তোরা :	ভেরোঁ/ঝাঁপতাল	"	
৪৬	কী করিলি মোহের ছলনে :	ভজন/ত্রিতাল	"	
৪৭	বড় আশা করে এসেছি গো :	কর্ণাটি ঝিঁঝিট/কাওয়ালী	১৮৮২/জোড়াসাঁকো	মূল রচনা : সখী বা বা
৪৮	আজি শুভদিনে পিতার ভবনে :	তালফেরতা	"	মূল রচনা : পূর্ণচন্দ্রাননে
৪৯	বর্ষ ওই গেল চলে :	পূরবী/আড়াঠেকা	"	
৫০	সখা তুমি আছ কোথা :	ভৈরবী/একতাল	"	
৫১	আজু সখী মুহু মুহু :	বেহাগ/ঝাঁপতাল	"	
৫২	আমার প্রাণের 'পরে চলে গেল :	মিশ্র রাগ/আড়খেমটা	"	এই গানে কাব্য-সংগীতের সূচনা হয়।

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম কলি	রাগ/তাল	রচনাকাল/স্থান	মন্তব্য
৫৩	ওই জানালার কাছে বসে আছে :	মিশ্র খাম্বাজ/একতাল	১৮৮১/জোড়াসাঁকো	
৫৪	তারে দেখাতে পারি নে কেন :	ঝাঁপতাল	১৮৮৪/জোড়াসাঁকো	
৫৫	বনে এমন ফুল ফুটেছে :	খাম্বাজ/আড়খেমটা	" "	
৫৬	মনে রয়ে গেল মনের কথা :	বেহাগড়া/ঝাঁপতাল	" "	
৫৭	প্রমোদে ঢালিয়া দিনু মন :	বেহাগ খাম্বাজ/ত্রিতাল	" "	অনেকের মতে এটির সুর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের
৫৮	বুঝি বেলা বয়ে যায় :	ভীমপলশ্রী মুলতান/আড়খেমটা	" "	
৫৯	শুভ্র আসনে বিরাজ :	ভৈরব/আড়াচৌতাল	" "	রুদ্রদেব ত্রিনয়ন
৬০	সংসারেতে চারিধার করিয়াছে :	আলাহিয়া/আড়াঠেকা	" "	
৬১	কেরে ওই ডাকিছে :	আলাহিয়া/ধামার	" "	তারি ডম্ফ বাজত
৬২	সকলেরে কাছে ডাকি :	ভৈরব/ঝাঁপতাল	" "	
৬৩	হাতে লয়ে দীপ :	মিশ্র ঝাঁপতাল	" "	
৬৪	সকাতরে ওই কাঁদিছে সকলে	কর্ণাটি ভজন/একতালা	" "	কানাড়ী গান 'চারি বর্ষা পর্যন্ত'
৬৫	কেহ কারো মন বোঝে না :	সিন্ধু কাফি/আড়াঠেকা	" "	
৬৬	সখী ওই বুঝি বাঁশি বাজে :	মিশ্র বারোয়াঁ/ত্রিতাল	" "	থিয়েটারি সুরের প্রভাব
৬৭	অনিমেষ আঁখি সেই কে :	দেশ/আড়াঠেকা	" "	
৬৮	হ্যাদে গো নন্দরানী :	মিশ্র ভৈরবী/দাদরা	" "	

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম কলি	রাগ/তাল	রচনাকাল/স্থান	মন্তব্য
৬৯	মরি লো মরি আমায় :	মিশ্র পূরবী/দাদরা	১৮৮৪/জোড়াসাঁকো	
৭০	ও কেন চুরি করে চায় :	মিশ্র বেহাগ/দাদরা	„ „	নিধুবাবুর গানের প্রভাব
৭১	বরিষ ধরামাঝে শান্তির বারি :	আশা ভৈরবী/ত্রিতাল		
৭২	দুখ দিয়েছ, দিয়েছ ক্ষতি নাই :	টোড়ি/ঝাঁপতাল		কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু উপলক্ষে
৭৩	তাঁহারে আরতি করে চন্দ্রতপন	বড়হংস সারং/চৌতাল		মূল রচনা : জগজন ধ্যান
৭৪	বাঁশরী বাজাতে চাহি :	ত্রিতাল		
৭৫	আঁখিজল মুছাইলে জননী :	রামকেলি/কাওয়ালি		মূল রচনা : জিন ছুঁয়ো মোরে
৭৬	ওঠো ওঠো রে বিফলে :	বিভাস/চৌতাল		
৭৭	আঁধার রজনী পোহাল :	খট্/একতাল		
৭৮	অসীম কাল সাগরে :	ভৈরবী/ঝাঁপতাল		মূল রচনা : সারদা বিদ্যাদানী
৭৯	আমি জেনে শুনে তবু :	কীর্তনের সুর/দাদরা		
৮০	মাঝে মাঝে তব দেখা পাই :	কাফি/একতাল		
৮১	ওহে দয়াময় নিখিল :	মিশ্র বিলাবল/কাহারবা	১৮৮৫	
৮২	দাও হে হৃদয় ভরে দাও :	রামকেলি/ত্রিতাল	„	মূল রচনা : প্যালা মুঝে ভর্ দে রে

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম কলি	রাগ/তাল	রচনাকাল/স্থান	মন্তব্য
৮৩	এ কি অন্ধকার এ ভারতভূমি :	প্রভাতী/একতাল	১৮৮৫/জোড়াসাঁকো	
৮৪	এ পরবাসে রবে কে :	সিন্ধু/মধ্যমান	" "	মূল রচনা : ও মিঞা বেজনুওয়ালে
৮৫	হল না লো, হল না, সই :	হাম্বীর/কাওয়ালি	" "	অনেকে এর সুর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মনে করেন
৮৬	বেঁধেছ প্রেমের পাশে :	কাফি-কানাড়া/ঢিমা তেতালা	" "	মূল রচনা : চাঁচর চিকুর আধো
৮৭	সংশয় তিমির মাঝে :	রাজ বিজয়/তেওড়া	" "	মূল রচনা : অজ্ঞানতমনিকরে
৮৮	খুলে দে তরণী খুলে দে তোরা :	মিশ্র বাহার/একতাল	" "	জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পিয়ানো বাজানোর সুরে প্রভাবিত বলে অনুমান
৮৯	যে ফুল ঝরে সেই তো ঝরে :	মিশ্র পূরবী/একতাল		
৯০	কতবার ভেবেছিনু :	মিশ্র ছায়ানট/ একতাল		মূল গান : Drink to me only
৯১	সহে না যাতনা :	বেহাগ/কাওয়ালি		জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সুর বলে অনুমান
৯২	পুরানো সেই দিনের কথা :	পাশ্চাত্য সুর/মিশ্র ভূপালী/একতাল	"	
৯৩	দুজনে দেখা হল :	বেহাগ-খাম্বাজ/দাদরা	" "	
৯৪	গাও বীণা, বীণা গাও রে :	টোড়ি/একতাল	" "	
৯৫	একবার তোরা মা বলিয়া ডাক :	ঝিঁঝিট/একতাল	" "	
৯৬	অন্ধজনে দেহো আলো :	ধুন/ভৈরবী	"	রবীন্দ্রনাথের প্রিয় গান
৯৭	শোনো তাঁর সুধাবাণী :	ইমনকল্যাণ/চৌতাল :	১৮৮৫-৮৬	মূল রচনা : শুদ্ধমুদ্রা শুদ্ধবাণী

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম কলি	রাগ/তাল	রচনাকাল/স্থান	মন্তব্য
৯৮	ডাকিছ শুনি জাগিনু প্রভু :	মিশ্র ললিত/একতাল	১৮৮৫-৮৬/জোড়াসাঁকো	
৯৯	শুনেছে তোমার নাম অনাথ আতুর :	মিশ্র বিলাবল/ঝাঁপতাল	১৮৮৬	
১০০	এত আনন্দধ্বনি উঠিল :	বাহার/ধামার		
১০১	আজি বহিছে বসন্তপবন :	বাহার/তেওড়া		মূল রচনা : আজ বহত সুগন্ধ পবন
১০২	তোমারি মধুর রূপে ভরেছ :	ঝিঁঝিট/চৌতাল		
১০৩	কী গাব আমি কী শুনাব :	মিশ্র কানাড়া/একতাল		
১০৪	কেন জাগে না জাগে না :	বেহাগ/যৎ		
১০৫	তব প্রেমসুধারসে মেতেছি :	পরজ/ত্রিতাল		মূল রচনা : কারি কারি কর্মরিয়া গুরুজী
১০৬	ঝম ঝম ঘন ঘন রে :	ত্রিতাল		মূল রচনা : ঝিমি ঝিমি ঝিমি ঝিমি
১০৭	যাবি ও কাহার বাছা :	মিশ্র ঝিঁঝিট		মূল রচনা : Go where glory waits thee
১০৮	নমি নমি ভারতী :	প্রভাতী/ঝাঁপতাল		
১০৯	শ্যামা এবার ছেড়ে চলেছি মা :	রামপ্রসাদী		
১১০	অহো আস্পর্ধা একি তোদের :	নাট্যসংগীত		মূল রচনা : দাবাদ্রিম তা নানা
১১১	এই যে হেরি গো দেবী :	নাট্যসংগীত		মূল রচনা : মন কী কমলদল খোলিয়া
১১২	এইবেলা সবে মিলে :	নাট্যসংগীত		মূল রচনা : চতুরঙ্গ রস সন
১১৩	কালী কালী বলো রে আজ :	নাট্যসংগীত		মূল রচনা : Nancy Lee

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম কলি	রাগ/তাল	রচনাকাল/স্থান	মন্তব্য
১১৪	একী এ একী এ স্থির চপলা :	নাট্যসংগীত	১৮৮৬/জোড়াসাঁকো	
১১৫	কখন বসন্ত গেল :	পিলু বারোয়াঁ/আড়াঠেকা	„ „	
১১৬	ওগো শোনো কে বাজায় :	বেহাগ/আড়া খেমটা	„ „	
১১৭	আজি শরত তপনে :	যোগিয়া বিভাস/একতাল	„ „	
১১৮	ওগো কে যায় বাঁশরি বাজায়ে :	কালাংড়া/দাদরা	„ „	
১১৯	ধরা দিয়েছি গো আমি :	ভৈরব/দাদরা	„	
১২০	আমায় বোলো না গাহিতে :	সিন্ধু/কাওয়ালি	„ „	
১২১	প্রভাতে বিমল আনন্দে	গুর্জরী টোড়ি/চৌতাল	„ „	
১২২	নিকটে দেখিব তোমারে	রামকেলি/ত্রিতাল	„ „	
১২৩	অনেক দিয়েছ নাথ :	আশাবরী/ত্রিতাল	„ „	
১২৪	বিদায় করেছ যারে নয়নজলে :	কানাড়া	„ „	মূল রচনা : বাজে ঝনননন মোরে পায়লিয়া
১২৫	নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে	যোগিয়া বিভাস/একতাল	„ „	তুলনীয় : আজি শরততপনে
১২৬	সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি	ইমনকল্যাণ/তেওড়া	১৮৮৭	মূল রচনা : দুষ্ট দুর্জন দূর করো দেবী
১২৭	কী ভয় অভয়ধামে :	বেহাগ/ঝাঁপতাল		
১২৮	আমরা মিলেছি আজ :	রামপ্রসাদী/দাদরা		কংগ্রেস অধিবেশনে গীত

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম কাল	রাগ/তাল	রচনাকাল/স্থান	মন্তব্য
১২৯	তোমা লাগি নাথ জাগি :	পূরবী/চৌতাল	১৮৮৭/জোড়াসাঁকো	
১৩০	স্বামী তুমি এসো আজ :	বেহাগ/চৌতাল		
১৩১	আমার যা আছে :	দেশীসিন্ধু/একতাল		
১৩২	আজ বুঝি আইল প্রিয়তম :	সাহানা/ত্রিতাল		
১৩৩	তুমি বন্ধু তুমি নাথ :	মিশ্র জয়জয়ন্তী/একতাল		
১৩৪	তবু পারি নে সঁপিতে প্রাণ :	মিশ্র সিন্ধু/একতাল		
১৩৫	আগে চল্ আগে চল্ :	বেহাগ/দাদরা		কলেজের ছাত্র-সম্মিলনীতে ঈস্টার উৎসব উপলক্ষে
১৩৬	তবু মনে রেখো :	কীর্তনাঙ্গ	১৮৮৮/জোড়াসাঁকো	রবীন্দ্রনাথের প্রিয় সৃষ্টি
১৩৭	নূতন প্রাণ দাও প্রাণসখা :	নাচারী টোড়ি/ধামার		
১৩৮	আছ অন্তরে চিরদিন :	কাফি/চৌতাল		
১৩৯	জগতে তুমি রাজা :	কানাড়া/চৌতাল		
১৪০	নাথ হে প্রেমপথে :	সুহা কানাড়া/ত্রিতাল		
১৪১	হৃদয় বেদনা বহিয়া :	সিন্ধু/তেওড়া		
১৪২	পথহারা তুমি পথিক :	ইমনকল্যাণ		
১৪৩	আমার পরাণ যাহা চায় :	মিশ্র কানাড়া/কাওয়ালি		
১৪৪	সখী বহে গেল বেলা :	কীর্তনাঙ্গ/একতাল		

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম কলি	রাগ/তাল	রচনাকাল/স্থান	মন্তব্য
১৪৫	এসেছি গো এসেছি মন :	পিলু/দাদরা	১৮৮৮/জোড়াসাঁকো	
১৪৬	আমি জেনেশুনে বিষ :	মল্লার/রূপক ১, ২, ৩ । ১, ২ । ১, ২	„ „	
১৪৭	কেন এলি রে ভালোবাসিলি :	ভৈরবী/ঝাঁপতাল	„ „	
১৪৮	ভালোবেসে যদি সুখ নাহি :	কাফি/কাওয়ালি	„ „	
১৪৯	আহা আজি এ বসন্তে :	মিশ্র ঝিঁঝিট/কাওয়ালি	„ „	মূল রচনা : Go where glory waits thee
১৫০	দিবস রজনী আমি যেন :	মিশ্র সিন্ধু/একতাল	„ „	
১৫১	আমি হৃদয়ের কথা বলিতে :	মিশ্র সিন্ধু/একতাল	„ „	
১৫২	দে লো সখী দে	দেশ/কাওয়ালি	„ ,	জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সুর বলিয়া অনুমান
১৫৩	সখী সে গেল কোথায়	মিশ্রবেহাগ/খেমটা	„ „	
১৫৪	অলি বার বার ফিরে যায় :	মিশ্র দেশ/খেমটা	„ „	
১৫৫	ওকে বলো সখী বলো	বেহাগ/খেমটা	„ „	
১৫৬	না বুঝে কারে তুমি :	ভূপালী/কাওয়ালি	„ „	
১৫৭	সুখে থাকো আর সুখী করো :	ইমন ভূপালী/একতাল	১৮৮৯ „	বিহারীলাল গুপ্তের কন্যা স্নেহলতার বিবাহ উপলক্ষে
১৫৮	এমন দিনে তারে বলা যায় :	মিশ্রমল্লার/রূপক	„ „	
১৫৯	এরা পরকে আপন করে :	পিলু বারোয়াঁ/খেমটা		

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম কলি	রাগ/তাল	রচনাকাল/স্থান	মন্তব্য
১৬০	আমি নিশিদিন তোমায় :	মিশ্র গৌরী/তাল ফেরতা	১৮৮৮/জোড়াসাঁকো	
১৬১	নব আনন্দে জাগো :	গুর্জরী টোড়ি/ত্রিতাল	১৮৯০ "	নববর্ষ উপলক্ষে রচিত মূল রচনা : অধর ধরে বনবাঁশরী
১৬২	ওই পোহাইল তিমির রাতি :	আলাহিয়া/কাওয়ালি	"	নববর্ষ উপলক্ষে রচিত
১৬৩	আমারে কে নিবি ভাই :	বাউলাঙ্গ/দাদরা	"	
১৬৪	শূন্য প্রাণ কাঁদে সদা :	কাফি সিন্ধু/বিলম্বিত ত্রিতাল	১৮৯২ "	
১৬৫	শুধু যাওয়া আসা :	বেহাগ/কাহারবা	১৮৯২-৯৩ "	
১৬৬	কেন নয়ন আপনি ভেসে যায় :	ভৈরবী/একতাল	" "	
১৬৭	ওগো তোমরা সবাই ভালো :	বাউলাঙ্গ/দাদরা	" "	
১৬৮	আমার পরাণ লয়ে কী খেলা :	কানাড়া/মধ্যমান	" বির্জিতলা	
১৬৯	আমার মন মানে না দিনরজনী :	কীর্তনাঙ্গ-মুলতান/একতাল	" জোড়াসাঁকো	
১৭০	এ কী লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ :	ভাঙা মহীশূরী/একতাল	" "	
১৭১	আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে :	হাম্বীর/তালফেরতা	" "	
১৭২	খ্যাপা তুই আছিস্ আপন :	বাউলাঙ্গ/দাদরা	" "	
১৭৩	খাঁচার পাখি ছিল :	কীর্তনাঙ্গ/রূপক	" সাহাজাদপুর	কাব্যগীতি
১৭৪	আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে :	একতাল/ভজন	"	মহীশূরী গান ভেঙে রচিত

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম কলি	রাগ/তাল	রচনাকাল/স্থান	মন্তব্য
১৭৫	এখনো তারে চোখে দেখি নি :	মিশ্র ইমন/কাওয়ালি	১৮৯৩	
১৭৬	আজি যে রজনী যায় :	ভৈরবী/রূপকড়া	১৮৯৩ ২৯ জুন/শিলাইদহ	
১৭৭	বড়ো বেদনার মতো :	কীর্তনাঙ্গ/একতাল	” সাহাজাদপুর	রবীন্দ্রনাথের প্রিয় গান
১৭৮	হৃদয়ের একূল ওকূল :	মিশ্র বিভাস/দাদরা	১৮৯৩/সাহাজাদপুর	
১৭৯	এসো হে গৃহদেবতা :	আনন্দ ভৈরবী/কাহারবা	১৮৯৪	
১৮০	হৃদয় নন্দনবনে :	ললিতাগৌরী/ঝাঁপতাল	১৮৯৪/জোড়াসাঁকো	মূল রচনা : উড়ত বন্ধন নব
১৮১	আনন্দধারা বহিছে ভুবনে :	মিশ্র মালকোষ/ত্রিতাল	” ”	মূল রচনা : লাগি মেরে ঠুমক
১৮২	হে মহাপ্রবল বলী :	কানাড়া/চৌতাল	”	মূল রচনা : হে মা প্রবল বলী
১৮৩	অন্তরে জাগিছ অন্তরযামী :	বেহাগ/ঝাঁপতাল	”	মূল রচনা : কোন যোগী ভয়ো
১৮৪	বাজিল কাহার বীণা :	ঝিঁঝিট খাম্বাজ/কাহারবা	” ”	সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিবাহ উপলক্ষে
১৮৫	ওহে জীবনবল্লভ :	কীর্তনাঙ্গ/একতাল	” ”	কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর দশম বৎসরে রচিত
১৮৬	বড়ো বিস্ময় লাগে :	কানাড়া/মুক্তছন্দ	” ”	
১৮৭	আমারে করো তোমার বীণা :	খাম্বাজ/দাদরা	” ”	
১৮৮	কত কথা তারে ছিল বলিতে :	মিশ্র কালাংড়া/কাহারবা	” ”	

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম/কলি	রাগ/তাল	রচনাকাল/স্থান	মন্তব্য
১৮৯	এসো এসো ফিরে এসো :	টানা গান	১৮৯৪/শিলাইদহ	কীর্তনের ধরনের ভৈরবী
১৯০	তুমি নব নব রূপে এসো :	রামকেলি/ত্রিতাল	১৮৯৪ সেপ্টেম্বর/পতিসর	
১৯১	নিত্য নব সত্য তব শুভ্র	শঙ্করা বিলাবল ঝাঁপতাল	১৮৯৫-৯৬/জোড়াসাঁকো	মূল রচনা : জ্ঞান রঙ্গ ধ্যান রঙ্গ
১৯২	বিশ্ব বীণারবে :	শংকরাভরণ/তাল ফেরতা	১৮৯৫ ,	
১৯৩	ওলো সই ওলো সই :	বিভাস/দাদরা	, শিলাইদহ	
১৯৪	মধুর মধুর ধ্বনি বাজে	ইমন ভূপালী/কাহারবা		
১৯৫	কে দিল আবার আঘাত :	কেদারা/কাহারবা	,	
১৯৬	পুষ্পবনে পুষ্প নাহি	ললিত কালেংড়া/আড়খেমটা		
১৯৭	আহা জাগি পোহালো :	মিশ্র ভৈরবী/ত্রিতাল	, ,	
১৯৮	তোমার গোপন কথাটি :	কীর্তনাঙ্গ/আড়খেমটা		
১৯৯	চিত্ত পিপাসিত রে :	খাম্বাজ/ঝাপতাল	, ,	
২০০	আমি চিনি গো চিনি :	ঝিঁঝিট/একতাল	, ,	
২০১	এ কী আকুলতা ভুবনে :	বাহার/ত্রিতাল	, জোড়াসাঁকো	
২০২	তুমি রবে নীরবে :	বেহাগ/একতাল	,	
২০৩	সে আসে ধীরে :	দেশ/দাদরা		
২০৪	কে উঠে ডাকি মম :	পরজ/একতাল	, ,	

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম কলি	রাগ/তাল	রচনাকাল/স্থান	মন্তব্য
২০৫	ওহে সুন্দর মম গৃহে :	খাম্বাজ/দাদরা	১৮৯৫/জোড়াসাঁকো	
২০৬	কী রাগিণী বাজালে :	সিন্ধু কানাড়া/একতাল		
২০৭	পাদপ্রান্তে রাখ সেবকে :	ইমনি/একতাল	১৮৯৬	
২০৮	শীতল তব পদছায়া :	ইমনকল্যাণ/একতাল		
২০৯	আজ রাজ আসনে তোমার :	বেহাগ/ধামার	" "	মূল রচনা : প্যারী তেরে পায়ন পকড়ুঁ
২১০	আজি কোন্ ধন হতে বিশ্বে :	কেদারা/চৌতাল	" ইছামতী	
২১১	কে যায় অমৃতধামযাত্রী :	বেহাগ/চৌতাল	" জোড়াসাঁকো	
২১২	এ কী করুণা করুণাময় :	বাহার/আড়াঠেকা	১৮৯৬ "	আদি গান : হৃদয় আবরণ খুলে দাও ; মূল গান : নই রে মা বরন
২১৩	মহাবিশ্বে মহাকাশে :	ইমনকল্যাণ/তেওড়া	" "	মূল রচনা মহাদেব মহেশ্বর
২১৪	সুধাসাগর তীরে :	নায়কী কানাড়া/ধামার	" "	মূল রচনা : আয়ো ফাগুন
২১৫	অয়ি ভুবনমনোমোহিনী	ভৈরবী/কাহারবা	" "	ফরমায়েসে রচিত স্বদেশী গান
২১৬	আজি মম মন চাহে :	বাহার/চৌতাল	" "	মূল রচনা : ফুলি বন ঘন
২১৭	হরষে জাগো আজি :	হাম্বীর/ধামার	" "	মূল রচনা : হরষে জাগ লাল
২১৮	ঝরঝর বরিষে বারিধারা :	মিশ্রমল্লার/কাহারবা	" ২০ সেপ্টেম্বর/শিলাইদহ	
২১৯	শান্ত হ রে মম চিত্ত :	ঝিঁঝিট/কাহারবা	" জোড়াসাঁকো	

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম কলি	রাগ/তাল	রচনাকাল/স্থান	মন্তব্য
২২০	শান্তি করো বরিষণ :	তিলককামোদ/সুরফাঁকতাল	১৮৯৬/জোড়াসাঁকো	মূল রচনা : শম্ভু হর পদযুগ
২২১	সুন্দর বহে আনন্দ মন্দানিল :	ইমনকল্যাণ/সুরফাঁকতাল	" "	মূল রচনা : শংকর শিব পিনাকী
২২২	বলি গো সজনী যেও না :	খট্/একতাল		
২২৩	মম যৌবন নিকুঞ্জে গাহে :	কাফি/একতাল	১৮৯৭	
২২৪	পান্থ এখনো কেন অলসিত :	যোগিয়া/সুরফাঁকতাল		মূল রচনা : রঙ্গ যুগত সোঁ গাবে বজাবে
২২৫	আনন্দ তুমি স্বামী :	ভেরবী/সুরফাঁকতাল		মূল রচনা : ওঙ্কার মহাদেব
২২৬	বহে নিরন্তর অনন্ত :	লাচ্ছাশাক/ঝাঁপতাল		মূল রচনা : দুসহ দোখ দুখদলনী
২২৭	কেন বাজাও কাঁকন :	সিন্ধু ভৈরবী/তেওড়া		
২২৮	হেরিয়া শ্যামল ঘন :	মল্লার/ত্রিতাল	" ইছামতী	
২২৯	কেন যামিনী না যেতে :	ভেরবী/একতাল	১৮৯৭/যমুনা নদী	
২৩০	আমি কেবলই স্বপন :	বেহাগ/একতাল	" ধলেশ্বরী	
২৩১	ভালোবেসে সখী নিভৃত :	কীর্তনাঙ্গ	" সাহাজাদপুর	
২৩২	তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা :	ইমনকল্যাণ/একতাল	১৮৯৭-৯৮/চলন বিল	
২৩৩	যদি বারণ কর তবে :	ছায়ানট/কাওয়ালি	" "	
২৩৪	আমি চাহিতে এসেছি শুধু :	কালাংড়া/দাদরা	" নাগর নদী	

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম কলি	রাগ/তাল	রচনাকাল/স্থান	মন্তব্য
২৩৫	সখী প্রতিদিন হায় :	দাদরা	১৮৯৭/৯৮ নাগর নদী	
২৩৬	বিঁধে ডাগর আঁখি যদি :	ভৈরবী/কাওয়ালি	" "	
২৩৭	বঁধু মিছে রাগ কোরোনা :	মিশ্র ঝিঁঝিট/একতাল	" পতিসর	
২৩৮	ওগো কাঙাল আমারে :	ভৈরবী/একতাল	" "	রবীন্দ্রনাথের প্রিয় গান
২৩৯	এ কি সত্য সকলি সত্য :	মিশ্র ঝিঁঝিট/দাদরা	" রেলপথে	
২৪০	কে বসিলে আজি :	সিন্ধু/মধ্যমান	১৮৯৮/জোড়াসাঁকো	মূল রচনা : বেপরিয়া তাড়ে
২৪১	বিমল আনন্দে জাগো রে :	আসাবরী/আড়াঠেকা		মূল রচনা : সো নহী মারেংগে মোরারে
২৪২	পিপাসা হায় নাহি মিটিল :	ভৈরবী/কাওয়ালি		মূল রচনা : সঁইয়া জাউঁ জাউঁ নাহি বোলোঙ্গে
২৪৩	চিরসখা হে ছেড়োনা মোরে :	বেহাগ/ত্রিতাল		
২৪৪	হৃদয় বাসনা পূর্ণ হল :	ঝিঁঝিট/মধ্যমান		মূল রচনা : মিঞা বে মানলে
২৪৫	তোমারি নামে নয়ন মেলিনু :	ভৈরব/তেওড়া	১৯০০	
২৪৬	সদা থাকো আনন্দে :	খট/ঝাঁপতাল		
২৪৭	আজি প্রণমি তোমারে চলিব :	বিভাস/একতাল		
২৪৮	তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে :	খাম্বাজ/একতাল		মূল রচনা : আজ শ্যাম মোহ লীয়ি
২৪৯	হৃদিমন্দিরদ্বারে বাজে :	কেদার/ধামার		

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম কলি	রাগ/তাল	রচনাকাল/স্থান	মন্তব্য
২৫০	সুখহীন নিশিদিন পরাধীন :	গৌড়মল্লার/কাওয়ালি	১৯০০/জোড়াসাঁকো	মূল রচনা : দারাদিম্ দারাদিম্
২৫১	বাণী তব ধায় অনন্ত :	আড়ানা/চৌতাল	" "	মূল রচনা : বেণী নিবদ্ধত ভুজঙ্গ
২৫২	ভয় হতে তবে অভয়মাঝে :	বেহাগ/চৌতাল	" শিলাইদহ	
২৫৩	কমল বনের মধুপরাজি :	মিশ্র সিন্ধু/একতাল	" জোড়াসাঁকো	
২৫৪	তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে	ইমনকল্যাণ/তেওড়া	"	
২৫৫	প্রতিদিন তব গাথা :	জিলফ/বারোয়াঁ/সুরফাকতাল	"	
২৫৬	প্রতিদিন আমি হে জীবনস্বামী	কাফি/ঝাঁপতাল	"	
২৫৭	যদি আমার হৃদয়দুয়ার :	সিন্ধু কাফি/ঝাঁপতাল	" ,	
২৫৮	নিশীথ শয়নে ভেবে রাখি মনে :	বাগেশ্রী/তেওড়া	" "	
২৫৯	জীবনে আমার যত আনন্দ	নায়কী কানাড়া/চৌতাল/একতাল	"	

রবীন্দ্রসংগীত সৃষ্টির দ্বিতীয় যুগ

১৯০১-১৯২০

এই যুগে রবীন্দ্রনাথের সংগীতসৃষ্টি প্রধানত কিছু কাব্যভুক্ত পুস্তক ও নাটকের মাধ্যমে হয়েছে। এই কাব্যভুক্ত পুস্তকগুলি যথাক্রমে নৈবেদ্য, শিশু, খেয়া, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য ও গীতালি। নাটকগুলি শারদোৎসব, প্রায়শ্চিত্ত, রাজা, অচলায়তন, ফাল্গুনী, অরূপরতন প্রভৃতি। তা ছাড়া কিছু স্বাধীন রচনাও রয়েছে। তবে এই যুগকে সাধারণত গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি যুগ বলা হয়ে থাকে। কারণ এই ক'টি কাব্যগ্রন্থের গানের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের এই যুগের গানের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য অনেকটা পরিস্ফুট ও এর মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টি নতুন ও স্বতন্ত্র পথ খুঁজে পেয়েছে।

এই সময়ে রচিত গানের একটি তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের এই সময়কার সমস্ত গান এতে স্থান না পেলেও ও সন তারিখের বিচারে এই তালিকা একেবারে নির্ভুল বলা কঠিন তবে এই তালিকাটিতে রবীন্দ্রসংগীত সৃষ্টির প্রথম যুগ অর্থাৎ ১৯০১-১৯২০ সালের ভিতর রচিত উল্লেখযোগ্য গানসমূহ, যাতে এই যুগের সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে ও যার উপর ভিত্তি করে এই আলোচনা করা হয়েছে, তা অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

এই যুগের সংগীতসৃষ্টিকে বিশ্লেষণ করলে অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এটাই বেশি করে ধরা পড়ে যে সেই সময় রবীন্দ্রনাথ আগেকার যুগের শিক্ষানবিশী ভাবটা অনেকটা কাটিয়ে উঠে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এক স্বতন্ত্র সংগীত-ধারা সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন ও প্রথম যুগে অনেকটা উপেক্ষিত লৌকিক সংগীতও এই যুগের সংগীতসৃষ্টিতে স্থান পেয়েছে।

এইবার আমরা এই যুগে তাঁর বিভিন্ন ধারার সংগীতসৃষ্টি ও আগেকার যুগের সঙ্গে এই যুগের সংগীতসৃষ্টির পার্থক্য ও সংগীতস্রষ্টা হিসেবে রবীন্দ্রনাথের ধীরে ধীরে স্বকীয় ভঙ্গিতে আত্মপ্রকাশের প্রচেষ্টা সম্বন্ধে আলোচনা করব।

প্রথমে আমরা তাঁর রাগাশ্রয়ী ও ক্ল্যাসিক্যাল সংগীতের উপর ভিত্তি করে রচিত এই যুগের সংগীত সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করব।

রাগাশ্রয়ী গান

এই যুগেও প্রথমার্ধে রবীন্দ্রনাথের বেশ-কিছু ভাঙা গান পাওয়া যায় যেখানে তিনি আগের যুগের ন্যায় হিন্দুস্থানী গান ভেঙে তার সুরের ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার বাণীর আদর্শে গান রচনা করেছেন। এই-সমস্ত গানের মধ্যে আগের যুগের ভাঙা গানের যে বৈশিষ্ট্য ছিল, অর্থাৎ কোনো কোনো গানে কথা ও সুর

দুইয়ের ক্ষেত্রেই মূল গানের অনুসরণ ও কোনো কোনো গানে কথা ও তার সংগে সংগে সুরেরও কিছু রূপান্তর— এই দুই বৈশিষ্ট্যেরই সাক্ষাৎ মেলে। তবে শেষোক্ত ধারার গানের সংখ্যাই বেশি। প্রথমোক্ত ধারার গানের মধ্যে 'প্রচণ্ড গর্জনে আসিল এ কি দুর্দিন' গানটির কথা উল্লেখ করা যায়। মূল গানের সংগে এই গানের কথা, সুর ও তালের সাদৃশ্য থাকলেও, মূল গানটি একটি ঋতুসংগীত (বর্ষা) আর ভাঙা রবীন্দ্রসংগীতটি পূজা পর্যায়ের গানে রূপান্তরিত হয়েছে।

এই যুগেও কোনো কোনো গানে মূল গানের কথাকে হুবহু নাহলেও কিছু পরিমাণে অনুসরণ করা হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'বীণা বাজাও হে' ও 'চরণ-ধ্বনি শুনি তব নাথ' এই দুটি গানের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই দুটি গান যথাক্রমে 'বীণ বজাও রে' ও 'মুরলীধ্বনি শুনি' এই গানগুলির উপর ভিত্তি করে রচিত। হিন্দী গানের ভাষা ও ভাবও কখনো কখনো তাঁকে প্রেরণা দিয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'তিমির বিভাবরী কাটে কেমনে' গানটির কথা উল্লেখ করা যায়।

এই গানটি হিন্দী 'ক্যায়সে কাটোংগী রয়না' গানটি ভেঙে রচনা করা হয়েছে। গান দুটি[illegible] পাশাপাশি নিচে দেওয়া গেল :

মূল গান : বেহাগ/ত্রিতাল

কায়সে কাটোঙ্গি রয়না সো পিয়া বিনা
কৌলি জাগি সজনী আজু
মোর নয়নমেঁ নিঁদ ন আওয়ে ছোড়ি সৈঁয়া
একে বসন্ত সুমন্দ পবন চলি
দুজে ফাগুন তিজে শ্যামেরি কুহরে কোয়েলিয়া
বোলনে লাগি সব দুশমন মোরি রে।

ঐ গানটি অবলম্বনে রচিত হল :

তিমির বিভাবরী কাটে কেমনে
জীর্ণ ভবনে শূন্য জীবনে
হৃদয় শুকাইল প্রেম বিহনে।
গহন আঁধার কবে পলকে পূর্ণ হবে
ওহে আনন্দময়, তোমার বীণারবে—
পশিবে পরাণে তব সুগন্ধ বসন্তপবনে॥

অনেকদিন পর 'শ্যামা' নাটকে এই গানটির রূপান্তর ঘটল :

হে বিরহী, হায়, চঞ্চল হিয়া তব—
নীরবে জাগ একাকী শূন্য মন্দিরে,
কোন্ সে নিরুদ্দেশ লাগি আছ জাগিয়া।

স্বপনরূপিণী অলোকসুন্দরী
অলক্ষ্য-অলকাপুরী-নিবাসিনী,
তাহার মূরতি রচিলে বেদনায় হৃদয়মাঝারে।

আর যে-সব গানে মূল গানের কথাকে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত করা হয়েছে তার নমুনা হল আড়ানা রাগে 'মন্দিরে মম কে' বা 'আজি এ আনন্দসন্ধ্যা' (পূরবী)—যেগুলি হিন্দী গান 'সুন্দর লাগোরী হৈ' ও 'বহু ন বজাও বংশী' গানগুলি ভেঙে রচিত হয়েছে। তবে এইজাতীয় ভাঙা গানের বিস্তৃত আলোচনা প্রথম যুগের গানের বেলাতেই করা হয়েছে ও এই সব গানে রবীন্দ্রনাথের মৌলিক সৃষ্টির খুব একটা পরিচয় পাওয়া যায় না বলে এ বিষয়ে আর আলোচনা করা হল না। তাছাড়া এই যুগের রাগভিত্তিক গানের বৈশিষ্ট্য এই সব ভাঙা গানের নয়, এর বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে এক স্বতন্ত্র ধারার কিছুটা কাব্যধর্মী রাগভিত্তিক গানে যেখানে (ক) একটি রাগের উপর ভিত্তি করে গান রচনা করে তার কাব্যাংশকে পরিস্ফুট করার জন্যে প্রয়োজনবোধে সেই রাগের শাস্ত্রীয় রূপের কিছু অদলবদল করা হয়েছে, অবশ্য তার মূল রূপটিকে উৎপাটিত করে নয়; (খ) কাব্যাংশকে পরিস্ফুট করার জন্যে নানা রাগের মিশ্রণ ঘটানো হয়েছে।

বহুদিন আগে লেখা তাঁর 'সংগীত ও ভাব' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "যদি মধ্যমের স্থানে পঞ্চম দিলে ভালো শুনায় আর তাহাতে বর্ণনীয় ভাবের সহায়তা করে তবে জয়জয়ন্তী মরুন বা বাঁচুন, আমি পঞ্চমকেই বাহাল রাখিব না কেন?" এইবার রবীন্দ্রনাথ তার মতকে কার্যকরী রূপ দিতে সচেষ্ট হলেন ও তাঁর গানও ধীরে ধীরে সুরধর্মী থেকে কাব্যধর্মী হয়ে উঠল। তাঁর গানে শাস্ত্রানুগত্যের স্থান দখল করল কাব্যবোধ।

বাংলা গানে সবক্ষেত্রে একটি রাগে যে তার কাব্যাংশের নানা ভাব পরিস্ফুট হতে পারে না ও তখন যে রাগমিশ্রণ বা রাগের শাস্ত্রীয় রূপের পরিবর্তন ঘটানোর প্রয়োজন হতে পারে— এ কথা কিন্তু বিখ্যাত সংগীতশাস্ত্রবিদ কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'গীতসূত্রসার'-এ বহুদিন আগেই এইভাবে ব্যক্ত করে গিয়েছিলেন :

"এক রাগে একটি গানের সমগ্ররস প্রকাশিত হইতে পারে না, কারণ অনেক স্থলেই একটি কলির মধ্যেই বিবিধ ভাবের সমাবেশ হয়, তাহা একাধিক রাগ ব্যতীত উচিতমত পরিব্যাপ্ত হইতে পারে না। কিন্তু কলাবৎ সংগীতবেত্তারা এক কলির মধ্যে বহু রাগের সংযোগ নিতান্ত দূষ্য মনে করেন। সেই জন্য তাঁহারা তাহার নাম 'জঙ্গলা' রাখিয়াছেন অর্থাৎ খাঁটি নয়"—উপরোক্ত কথার মধ্যে সেযুগে ওস্তাদদের কতখানি গোঁড়ামি ছিল ও তা বাংলা গানের বিকাশের পথে কিরূপ অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল তার কিছুটা প্রমাণ মেলে।

এই যুগের রবীন্দ্রনাথের রাগভিত্তিক গানগুলি আলোচনা করলে এটাই সুস্পষ্ট হয় যে এই-সব গান রচনাকালে তিনি গানে প্রযুক্ত রাগ সম্বন্ধে সচেতন

থেকেও সব ক্ষেত্রে রাগের গণ্ডি বা শাস্ত্রীয় রূপকে তার গানের ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে যথেষ্ট বিস্তৃত বলে মনে করেন নি, সেজন্যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাগের প্রচলিত শাস্ত্রীয় নিয়মকে অতিক্রম করে গেছেন ও যেখানে যতটুকু প্রয়োজন ততখানিই করেছেন, তার বেশি নয়।

এবার আমরা (ক)-ধারার গানে অর্থাৎ যেখানে গানে আরোপিত রাগকে গানের কাব্যাংশ বা বাণীকে পরিস্ফুট করার জন্যে তার শাস্ত্রীয় রূপের এদিক-ওদিক করা হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করব। উদাহরণস্বরূপ আমরা এই যুগে রচিত চারটি গান : যথা 'এবার নীরব করে দাও হে', 'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে', 'আমার সকল দুখের প্রদীপ' ও 'আমার নিশীথ রাতের বাদল ধারা' কে ধরে আলোচনার সূত্রপাত করব।

'এবার নীরব করে দাও হে তোমার মুখর কবিরে' গানটি দরবারী কানাড়া রাগের উপর ভিত্তি করে রচিত। দরবারী কানাড়া রাগে গান্ধার, ধৈবত, নিষাদ কোমল ও অন্যান্য সব স্বর শুদ্ধ। এখানে লক্ষণীয় যে আভোগ অংশে 'বহুদিনের বাক্যরাশি' অংশটিতে শুদ্ধ নিষাদ ব্যবহার করা হয়েছে। 'বহুদিন' বলতে সময়ের যে একটা ব্যাপ্তি আছে তা বোঝাতে গিয়ে 'দিনের' পর 'বাক্যরাশি' অংশে কোমল ধৈবত থেকে শুদ্ধ নি অবধি গড়ানো স্বরে যেন সেই সময়ের ব্যাপ্তিটা ধরার চেষ্টা করা হয়েছে যা কোমল ধৈবতের অধিকতর নিকটবর্তী কোমল নিষাদ ব্যবহারে এত পরিস্ফুট হত না।

মা	-া	পা	-া	|	দা	া		দা	না	|	না	া	া	র্সা
ব	০	হু	০	|	দি০	০		নে০	র	|	বা	ক্	০	ক

'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে' গানটি বাহার রাগকে অবলম্বন করে রচিত হয়েছে। বাহার রাগে কোমল গান্ধার ও দুই নিষাদ ব্যবহার হয়ে থাকে। কিন্তু এই গানের শেষ অংশে অবস্থিত 'ওহে সুন্দর বল্লভ কান্ত' অংশে শুদ্ধ গান্ধার ব্যবহার করা হয়েছে। এই অংশে একটা আহ্বানের ইঙ্গিত থাকায় অধিকতর জোরালো পদা শুদ্ধ গান্ধারের ব্যবহারে আহ্বানের সেই ভাবটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

..ধা	ণা	|	র্সা	-র্গা	র্গা	র্গা	|	র্গা	-া	র্ঋা	র্সপা	|	মা	-া	-া	গ	ম	পা	|	র্মা	র্গা	গা	গা
...ও	হে	|	সু	ন্	দ	র	|	ব	ল্	ল	ভ০	|	কা	০	০	০	০	ন্	|	ত	০	ত	ব

'আমার সকল দুখের প্রদীপ' গানটি ভীমপলশ্রী রাগ অবলম্বনে রচিত। ভীমপলশ্রী রাগে কোমল গান্ধার ও কোমল নিষাদ ব্যবহৃত হয় ও অন্যসব স্বর শুদ্ধ। এই গানটির প্রথম লাইনে 'নিবেদন' অংশে দেখা যাচ্ছে কোমল ধৈবতের ব্যবহার হয়েছে, যদিও ভীমপলশ্রীতে শুদ্ধ ধা লাগে। 'নিবেদন' এর ভেতর যে

একটা আকূতি বা আত্মনিবেদনের ভাব আছে তা কোমল ধৈবতের প্রয়োগে অধিকতর পরিস্ফুট হয়েছে।

ধণা -া ণা া	ধা -র্সা র্সণা দা	পা -া -া -া	-া -া
ক র্ ব ০	০ ০ নি বে	দ ০ ০ ০	০ ন্

এইরূপ আরো বহু গানের দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় যেখানে রবীন্দ্রনাথ অনুরূপভাবে গানের কাব্যাংশকে পরিস্ফুট করার জন্যে রাগের স্বরগত শাস্ত্রীয় রূপকে প্রয়োজনবোধে পরিবর্তিত করেছেন।

এরপর আমরা আলোচনা করব (খ)-ধারার গানের, যেখানে কবি তাঁর সৃষ্ট গানে কাব্যাংশকে ফুটিয়ে তোলার জন্য দুই বা ততোধিক রাগের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। এইরূপ রাগমিশ্রণের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ আমরা পাই এই যুগে রচিত, 'আছে দুঃখ আছে মৃত্যু' গানটিতে। এই স্বল্প পরিসর গানটিতে চার চারটি রাগ যথা ললিত, বিভাস, যোগিয়া ও অশোবরী প্রচ্ছন্নভাবে আত্মগোপন করে আছে।

এই চারটিই ভোরের রাগিণী ও প্রত্যেকটির ভাবের সুপ্ত পর্দাগুলি অপূর্ব দক্ষতায় মেশানো হয়েছে, যার ফলে একই সঙ্গে বিরহ ও মুক্তির ভাব সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। এই গানটির স্বরলিপি এইসঙ্গে দেওয়া হল যা থেকে এর স্বর-বৈচিত্র্য ও রাগ-মিশ্রণের নৈপুণ্য ধরা পড়বে।

মিশ্র যোগিয়া/একতাল

ক	II সরা -সরগা গা গা -া রসা	সরা -সরগা গা	গরা -া সা	I
	আ০ ০০০ ছে দু ক্ খ ০	আ০ ০০০ ছে	মৃ ৎ ত্যু	
	I সা রা মা	মা মা মা মা -া -গপা	গমা -গা -া	I
	বি র হ	দ হ ন লা ০ ০০	গে ০ ০	
গ	I পা দা দসা	র্সা -া র্ঋা	ঋর্সা র্সর্ঋর্জ্ঞা র্ঋা র্সা -ণদা দা	I
	ত বু ও	শা ন্ তি	ত বু ০০ আ ন ০ন্ দ	
	I দপা পদণা ণদা	পা -া পা	পা -া -ঋপা	পদা -া -া	II
	ত বু০০ অ	ন ন্ ত	জা ০ ০০	গে ০ ০	

II { পা পদা -মা পদা -র্সা র্সা | র্ঋর্সা -া র্সা | র্সনা -র্সা র্সা I
ত বু ০ ০ প্রা ০ ০ ণ নি০ ৎ ত ধা০ ০ রা

গ —
I র্সা র্ঋা -া | র্ঋা -র্সর্ঋর্জ্ঞা র্ঋা | র্ঋা -র্সা র্সা | নধা -দা পা } I
হা সে ০ | সূ ০০ র্ য চ ন দ্র | তা ০ রা

I পা পা -দা | দা র্ঋা র্সা র্সা -ণা -া | ণদা -পা পা I
ব স ন ত ০ নি কু ন জে আ ০ সে

I মা গা -া | সরা গমা মগা | গা রা -গা | রা সা -া I
ক রু ০ ম০ ০০ ঝ রি ০ প ড়ে ০

ঘ —
I সা সা -ঋা | গা মা মা | মা -া -া -া -া -া } I
কু সু ০ ম ০ ফু টে ০ ০ ০ ০ ০

এই স্বরলিপির গ ও ঘ অংশে যোগিয়া ও ললিত রাগের চেহারা স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। ক ও খ অংশে বিভাস ও আশাবরীর ছায়া যেন দেখা যায়।

আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাগের মূল কাঠামোকে অক্ষুণ্ণ রেখে ও তাতে রাগের শাস্ত্রীয় রূপ ও বিশেষ স্বর-সংগতি ও শ্রুতির ব্যবহারকে সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করে গানের ভাবকে আরো উজ্জ্বল করে তুলেছেন। উদাহরণস্বরূপ এই যুগে রচিত কেদারা রাগে 'প্রভু আমার প্রিয় আমার' গানটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কেদারা রাগের বাদী স্বর হল শুদ্ধ মধ্যম ও এই রাগে দুই মধ্যমের প্রয়োগ যথা র্ম প ধ প ম, র্ম প ম, র্ম প ধ র্ম প ম— এই-সব স্বর-বিন্যাসের মাধ্যমে দেখানো হয়ে থাকে ও এস্থলে কল্যাণ অঙ্গের রাগে বিবাদী স্বর হিসেবে কোমল নিষাদের স্বল্প প্রয়োগ করে এই রাগের সৌন্দর্য বাড়ানো হয়ে থাকে। এই গানটির সুরকে যদি স্বরগত ভাবে বিশ্লেষণ করা যায়, তবে দেখা যাবে যে, কেদারা রাগের এই-সব বিশেষ স্বর-সংগতি তিনি এই গানে ব্যবহার করেছেন ও তাতে গানের ভাব আরো পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। উদাহরণস্বরূপ এই গানের 'পরম ধন হে' ও 'পরম গতি হে' অংশের স্বরলিপি দেওয়া হল :

২ ৩ ১ II
১. I পর্ম্মা পর্ম্মা পা | ধাঃ -ণঃ পা | পধা -পা -া | -মা -া -া
প০ র০ ম | ধ ০ ন | হে ০ ০ ০ | ০ ০ ০

৩ ˎ

২. I পক্ষা পক্ষা পপা | ধা ধাঃ ণঃ | পা -মা -া | -া -া -া
প০ র০ ম০ | গ তি ০ | হে ০ ০ | ০ ০ ০

অথচ মনে করবার কোনো কারণ নেই যে রবীন্দ্রনাথ নিছক ওস্তাদী করার জন্যে বা পাণ্ডিত্য প্রকাশ করার জন্যে এটা করেছিলেন। আমার বক্তব্য হল এই যে, ওই রাগের শাস্ত্রীয় রূপের সামান্য বদল করে বা রাগমিশ্রণ করেই যে তিনি কথা ও সুরের সমন্বয়ের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তা নয়। কোনো একটি রাগের শাস্ত্রীয় রূপ মোটামুটি অক্ষুণ্ণ রেখে ও সেই রাগের স্বরসংগতির ও বিশেষ স্বর বা শ্রুতি প্রয়োগের যে বৈশিষ্ট্য বর্তমান, তাকে সার্থকভাবে গানে প্রয়োগ করে গানের ভাবকে অধিকতর পরিস্ফুট করে তুলেছেন। এ এক দুর্লভ ও অসাধারণ ক্ষমতা।

উপরোক্ত তিন ধারার রাগভিত্তিক গান আমরা গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য ও গীতালির গানগুলিতে পাই। এ-যুগের রাগভিত্তিক গানগুলি যে শুধু সুরের দিক দিয়েই আগের যুগের রাগাশ্রয়ী গান থেকে স্বাতন্ত্র্যলাভ করেছে তা নয়, তালের দিক দিয়েও গানগুলি অনেকটা সহজ হয়ে এসেছে ও আগের যুগের ভারী ভারী তাল যথা চৌতাল ধামার। আড়া চৌতাল—এদের প্রয়োগ কমে এসেছে ও গীতাঞ্জলির গান যদি তালের দিক দিয়ে পর্যালোচনা করি, তবে দেখতে পাব যে, একমাত্র 'হেরি অহরহ তোমারি বিরহ' গানটি ছাড়া অন্য কোনো গানে ধ্রুপদাঙ্গ ভারী তাল ব্যবহৃত হয়নি। এইভাবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর আগের যুগের শাস্ত্রানুগত্য থেকে অনেকটা মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে এই সব বাধানিষেধের বেড়াজাল ডিঙিয়ে তাঁর নিজস্ব পথে চলবার চেষ্টা শুরু করেছেন; ফলে এই যুগে তাঁর রাগভিত্তিক গানগুলি এক স্বতন্ত্র ও কাব্যময় রূপ পরিগ্রহ করেছে।

আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে বলে নেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। আমরা দেখেছি যে, প্রথম যুগে রাগভিত্তিক হিন্দুস্থানী গান ভেঙে বা রাগাশ্রয়ী স্বাধীন সংগীত সৃষ্টিতেও রবীন্দ্রনাথ অনেকটা বিষ্ণুপুরী ঘরানা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন। কিন্তু এ যুগে যখন তিনি গীতাঞ্জলি গীতালি-গীতিমাল্যের কাব্যমণ্ডিত রাগভিত্তিক গানগুলি তৈরি করেছেন, তখন তিনি এই ঘরানা বা অন্য কোনো ঘরানা দ্বারাই আর প্রভাবান্বিত নন। তখন তিনি যে ঘরানা দ্বারা প্রভাবান্বিত, তা হল 'রবীন্দ্র ঘরানা' যার মূলমন্ত্র কথা ও সুরের সার্থক মিলনে ও সার্থক সমন্বয়ে কাব্যধর্মী গানের সৃষ্টি। এই ব্যাপারে রাগের শাস্ত্রীয় রূপকে প্রাধান্য দিয়ে তিনি কোনো আপস করতে রাজী নন।

লোকসংগীতের প্রভাব

রবীন্দ্রসংগীত সৃষ্টিতে হিন্দুস্থানী গান ছাড়া বাংলার লোকসংগীতের বিশেষ অবদান বা ভূমিকা আছে। আগের যুগের গানে ক্ল্যাসিক্যাল সংগীতের একচ্ছত্র প্রভাবের জন্যে বাংলার লোকসংগীত তার সেইসময়কার গানে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। কিন্তু তার এই যুগের গানে লোকসংগীতের প্রভাব ধীরে ধীরে পরিস্ফুট হতে শুরু করেছে। এর সার্থক প্রয়োগ ১৯০৫ সালে বংগভংগ আন্দোলন উপলক্ষে রচিত লোকসংগীতের বা বাউলাংগ গানের সুরে রচিত স্বদেশী গানগুলিতে পাই।

তা ছাড়া বিভিন্ন নাটকে লোকসংগীতের, বিশেষ করে বাউল গানের প্রয়োগ হয়েছে ও অনেক নাটকে বাউলের একটা বিশেষ ভূমিকাও রয়েছে ও তাদের মুখ দিয়েই এই সব গান গাওয়ানো হয়েছে।

কোন্ পরিবেশে ও কী কারণে রবীন্দ্রনাথ বাউল গানের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন ও বাউল গান তাকে কতটা প্রভাবিত করেছিল, যার ফলে তিনি নিজেকে 'রবি বাউল' বলতেন তা আগেই সূচনা পর্বে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

এই যুগে লোকসংগীতের সুরে রচিত কবির উল্লেখযোগ্য গানের একটি তালিকা দেওয়া হল যা থেকে এই যুগে তাঁর সংগীত সৃষ্টিতে এই ধারার গানের প্রভাব সম্বন্ধে একটা ধারণা করা সম্ভব হবে।

	গান	লোকসংগীতের ধারা	তাল
১	ভেঙে মোর ঘরের চাবি	বাউলাংগ	দাদরা
২	আমার সোনার বাংলা	"	"
৩	বুক বেঁধে তুই দাঁড়া	"	"
৪	নিশিদিন ভরসা রাখিস	"	"
৫	এবার তোর মরা গাঙে	সারি গানের সুর	কাহারবা
৬	তোর আপন জনে ছাড়বে	বাউলাংগ	দাদরা
৭	ছি ছি চোখের জলে	"	"
৮	বিধির বাধন কাটবে তুমি	"	"
৯	আমার নাইবা হল	"	"
১০	আজ ধানের ক্ষেতে	সারি গানের সুর	কাহারবা
১১	বাচান বাঁচি মারেন মরি	বাউলাংগ	দাদরা
১২	ওরে আগুন আমার ভাই	"	"
১৩	গ্রামছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ	সারি গানের সুর	কাহারবা
১৪	তুমি এবার আমায় লহো	বাউলাংগ	দাদরা

	গান	লোকসংগীতের ধারা	তাল
১৫	যেথায় তোমার লুট হতেছে	বাউলাঙ্গ	দাদরা
১৬	আমরা সবাই রাজা	"	"
১৭	যা ছিল কালো ধলো	"	"
১৮	বসন্তে কি শুধু	লোকগীতির সুর	কাহারবা
১৯	তোমার খোলা হাওয়া	"	"
২০	আমাদের ভয় কাহারে	বাউলাঙ্গ	দাদরা
২১	ভালো মানুষ নই রে মোরা	"	"
২২	যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন	লোকগীতির সুর	"
২৩	আমার প্রাণের মানুষ আছে	বাউলাঙ্গ	"
২৪	মন যখন জাগলি না রে	"	"
২৫	কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ	"	কাহারবা
২৬	জানি গো দিন যাবে	"	দাদরা
২৭	এই তো ভালো লেগেছিল	বাউল কীর্তন মিশ্র	কাহারবা

উপরোক্ত লোকসংগীতের সুরে রচিত গানগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে এতে বাউলাঙ্গ গানেরই আধিক্য, অবশ্য কিছু অন্যান্য ধাচের লোকসংগীত ও সারি সুরের গানও আছে।

রবীন্দ্রনাথ বাউল গানের রীতি ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেছিলেন প্রথম স্বদেশী গানে। সেই-সব গানে আছে জীবনরসের উন্মাদনা ও সে-সব গানের প্রথম আবেদন, নাচের মাতন ও প্রাণের উল্লাসে প্রকাশিত। এর কারণ এই সব গানে স্বদেশী মন্ত্রে জাতিকে প্রেরণা দেবার জন্যে রচিত হয়েছিল।

বাউল গানের দ্বিতীয় আবেদনের প্রকাশ কবিসত্তার অন্তরবাণীতে এবং তার প্রথম প্রকাশ দেখা গেল 'আমার নাইবা হল পারে যাওয়া', 'আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে' ও 'আমার মন যখন জাগলি না রে' সদৃশ গানে ও এগুলি সত্যই স্পষ্টতর 'রবীন্দ্র বাউলের' রচনা।

শেষ যুগে অবশ্য আমরা বাউল ও কীর্তনের মিলিত একটা রূপ গড়ে উঠতে দেখি যা রবীন্দ্রনাথের একান্ত নিজস্ব সৃষ্টি ও এই যুগের শেষদিকে রচিত 'এই তো ভালো লেগেছিল' গানটিকে তার একটি নমুনা বলা যেতে পারে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, যে-সব গানে কিছুটা কৌতুক বা হাস্যরসের সৃষ্টি করতে চাওয়া হয়েছে, সেই-সব গানে রবীন্দ্রনাথ লোকসংগীতের সুর ব্যবহার করেছেন। যেমন 'ভালো মানুষ নই রে মোরা', 'আমাদের ভয় কাহারে' সদৃশ গানে। এর পরবর্তী যুগে 'হে হে সংঘের' জন্য তিনি যে-কয়টি কৌতুক গানের সৃষ্টি করেছিলেন, তাতেও লৌকিক সুরের প্রয়োগ হয়েছিল বলে আমরা জানি। এই-সব ধারার গান রচনায় তৎকালীন সংগীত-রচয়িতাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটু প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়, কারণ তখন হাস্যরসের গান সৃষ্টি

করতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিলিতি সুরের সাহায্য নেওয়া হত।

'এবার তোর মরা গাঙে', 'আজ ধানের খেতে রৌদ্র ছায়ায়' 'গ্রামছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ'—গানগুলিতে কবি সারি গানের সুর প্রয়োগ করেছেন। অন্যান্য স্বদেশী গানগুলি বাউলাঙ্গ সুরে রচিত হলেও 'এবার তোর মরা গাঙে' গানটিতে কেন সারি সুর প্রয়োগ করেছেন, তা ভাবতে গেলে মনে হয় যে সারি গান সাধারণত নৌকার মাঝিমাল্লারা দলবদ্ধভাবে বৈঠার তালে তালে করে থাকে। এই গানটিতে নদীতে নৌকা চালাবার কথা আছে ও গানটির কথা মাঝি-মাল্লাদের মুখ দিয়েই বলানো হয়েছে। সেইজন্যে মনে হয় এই গানটিতে ছন্দবহুল সারি সুর প্রযুক্ত হয়েছে।

ভাটিয়ালী গান যা সাধারণত টানা সুরে গাওয়া হয়ে থাকে ও একক কণ্ঠে গাওয়া হয়, তার নমুনা রবীন্দ্রনাথের রচিত লোকসংগীতে বড়ো একটা পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের সব লোকসংগীতেই একটা ছন্দবহুলতা দেখা যায়। এই ছন্দবহুলতার কারণ বোধ হয় এই যে রবীন্দ্রনাথ এই সব গানে গতিবেগ ও উদ্দীপনা সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন ও এর অধিকাংশ গানই কোনো নাটকে প্রযুক্ত ও বাউলের মুখে গীত, কিছু গান আবার সম্মেলক গান হিসেবে গেয় বলে এই গানগুলি স্বভাবতই ছন্দবহুল ও দ্রুত চালে বাঁধা হয়েছে।

'তোমার খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে' গানটি স্বভাবতই নৌকার চলনের গতিভঙ্গির ছোঁয়া লেগে ছন্দবহুল হয়ে উঠেছে। লোকসংগীতের সুরে বাঁধা অন্য একটি গান 'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন' গানটিকে অনেকে কাব্যসংগীত পর্যায়ভুক্ত করেন, কারণ একটি দীর্ঘ কবিতাতে এখানে সুরারোপ করা হয়েছে।

কীর্তনের প্রভাব

প্রথম যুগে অল্প কিছু কীর্তন গান রচিত হয়েছিল ও লোকসংগীতের মতোই তার প্রভাব তেমন একটা কিছু ছিল না। তিনি প্রথম যুগে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাবে ভানুসিংহের পদাবলী ও আরো কিছু স্বল্পসংখ্যক কীর্তনাঙ্গ গান রচনা করেছিলেন। তবে সে-সব গানে কলকাতা অঞ্চলের প্রচলিত সুরেরই প্রভাব ছিল বেশি।

এই যুগে লোকসংগীতের মতো কীর্তন গানের প্রভাবও তাঁর সংগীত সৃষ্টিতে ধীরে ধীরে অনুভূত হতে শুরু করেছে। এই যুগে রচিত উল্লেখযোগ্য কীর্তনাঙ্গ গানের একটি তালিকা নিচে দেওয়া হল: যা থেকে এই যুগে এই ধারার গানের প্রভাব ও রচনার বৈশিষ্ট্য বোঝা যাবে—

গান		তাল
১ ঐ আসন তলে	—	কাওয়ালী
২ তার অন্ত নাই গো যে আনন্দে	—	একতাল

	গান		তাল
৩	শরতে আজ কোন্ অতিথি	—	তেওড়া
৪	কূল থেকে মোর গানের তরী	—	দাদরা
৫	আমার হিয়ার মাঝে	—	একতাল
৬	চরণধ্বনি শুনি তব নাথ	—	ঝাঁপতাল
৭	প্রভু আজি তোমার	-	কাওয়ালী
৮	মালা হতে খসে পড়া	—	দাদরা
৯	এই তো তোমার প্রেম ওগো	—	দাদরা

সংখ্যার বিচারে হয়তো রাগাশ্রয়ী গানের তুলনায় কীর্তনাঙ্গ গানের সংখ্যা খুবই কম, তাই বলে রবীন্দ্রসংগীত সৃষ্টিতে এই ধারার গানের গুরুত্ব কম নয়।

আগেই বলা হয়েছে যে, কীর্তনের যে দিকটি তাঁকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করেছিল, সে হচ্ছে এর কথা ও সুরে সম্মিলিত অর্ধনারীশ্বর রূপ।

প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে নানারকম গানের প্রচলন ছিল। তাদের মধ্যে একধরনের গানের প্রধান লক্ষ্য ছিল দেবদেবীর আরাধনা ও তাঁদের গুণ বর্ণনা করা। সেই সব গানকে ব্যাপক অর্থে কীর্তন বলে উল্লেখ করা যেতে পারে। তবে বাংলাদেশে রাধাকৃষ্ণের লীলা বিষয়ক গানই বিশেষভাবে কীর্তন বলে পরিচিত। জয়দেব, চণ্ডীদাস প্রভৃতির পদাবলীকে আশ্রয় করে বাংলাদেশে এই কীর্তন গানের প্রচার ও প্রসার হয়েছিল।

কিন্তু এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্রথম যুগে একেবারে গোড়ার দিকে রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ কীর্তনাঙ্গ গান রচনা কালেও ধীরে ধীরে তাঁর এই ধারার গানের মধ্যে কীর্তনের সুরকে আশ্রয় করেছে মানবিক প্রেম ও রবীন্দ্রপ্রীতির পূজা। পদাবলী কীর্তনের রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক কথার মধ্যেই তাঁর কীর্তনাঙ্গ গান আর সীমিত নয়। এমন কি পরবর্তী যুগে তিনি ঋতুসংগীতকেও কীর্তনাঙ্গ সুরে বেঁধেছেন—তার বীজ বপন হয়েছিল এই যুগেই। দৃষ্টান্তস্বরূপ, গীতাঞ্জলিতে নিবদ্ধ 'শরতে আজ কোন্ অতিথি' গানটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

এই যুগে রচিত কীর্তনাঙ্গ গানের তালের দিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি, তবে দেখতে পাব যে গরাণহাটী বা মনোহরসাহী কীর্তনের ভারী ও জটিল তাল তাঁর কীর্তনাঙ্গ গানে কবি একেবারেই ব্যবহার করেননি। সাধারণ দাদরা, কাহারবা, ঝাঁপতাল, একতাল— এই-সব সহজ তালই তিনি এই ধারায় গানে অধিক ব্যবহার করেছেন। তালফেরতা যা সাধারণ কীর্তন গানে খুব বেশি ব্যবহৃত হয়, তাকেও তিনি তাঁর কীর্তনাঙ্গ গানে যথাসম্ভব এড়িয়ে চলেছেন। এই থেকে এটা স্পষ্টই বোঝা যায় যে, তাঁর রচিত রাগাভিত্তিক গানের ন্যায় কীর্তনের অলংকরণ বাহুল্যকে পরিহার করে তিনি কীর্তনের সাবলীল ও প্রাণস্পর্শী ভাবটিকেই রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন।

পদাবলী কীর্তনের রীতিতে প্রচলিত আখরকে তিনি তাঁর কীর্তনাঙ্গ গানে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু কীর্তনের সুর আরোপ না করেও কীর্তনে প্রচলিত আখরে ব্যবহার করার রীতি তিনি তাঁর অনেক গানে সঞ্চারিত করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ এই যুগে গীতাঞ্জলিতে রচিত 'তোমার আনন্দ ওই এল দ্বারে'- গানটির উল্লেখ করা যায় :

তোমার আনন্দ ওই এল দ্বারে
সুখের আঁচলখানি (দুখের আঁচলখানি, বুকের আঁচলখানি)
সেচন কর (পথে পথে সেচন কর, পা ফেলবে যেথা সেচন কর)
রাঙা হল (রঙে রঙে রাঙা হল, তার রঙে)।

ঋতু সংগীত

ব্যাপকভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখা যাবে যে, রবিপ্রতিভা বা সৃষ্টি-প্রেরণা মুখ্যত তিনটি জিনিসকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে— যথাক্রমে প্রকৃতি, মানব জীবন এবং ভগবৎ ভক্তি। এই তিনটি ধারার সমন্বয়ে রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের বিশ্বাস ও সৃষ্টির ক্ষেত্রটি বিশেষভাবে গড়ে উঠেছিল ও বিস্তৃতি লাভ করেছিল। কিন্তু মানব জীবন সম্বন্ধে সচেতনতা বা উপলব্ধি ও ভগবানের স্পর্শ কবি লাভ করেছিলেন অনেকটা প্রকৃতির মধ্য দিয়েই। ব্যক্তিগত প্রেমের সৌরভও তার কাছে প্রকৃতির দেহ-সৌরভের সংগে এক হয়ে দেখা দিয়েছে ও মিশে গিয়েছে। সুতরাং সেই বিচারে রবীন্দ্রনাথকে মূলত প্রকৃতিরই কবি বলা যেতে পারে। আয়তন ও গভীরতা উভয় দিক থেকেই প্রকৃতি তার কাব্য ও সংগীত-সৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ প্রেরণার কাজ করেছে।

কিন্তু প্রথম যুগের সংগীত সৃষ্টিতে এই প্রকৃতি কিছুটা পরিমাণে উপেক্ষিত, সেজন্যে সেই সময়ে লেখা ঋতু সংগীতের সংখ্যাও খুব কম। এখানে এটা উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কবি যখন নিজেদের উত্তরবঙ্গের জমিদারির তদারকের ভার নিয়ে সেই অঞ্চলে বসবাস শুরু করলেন, তখন থেকেই তার সুযোগ ঘটল প্রকৃতিকে নিবিড়ভাবে জানবার ও উপলব্ধি করবার। সে-সময় প্রকৃতি তাঁর মনে যে রসের সঞ্চার করেছিল, তারই প্রকাশ দেখা দিল ১৯০৮ সালে লেখা শারদোৎসব নাটকের গানগুলিতে। কবিগুরু এই প্রথম শান্তিনিকেতনের আশ্রম পরিবেশে একটি বিশেষ ঋতুকে অবলম্বন করে একটি নাটিকা ও গান রচনা করলেন। শোনা যায় এতে কবির কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথের প্রভাব ছিল। শিউলির গন্ধে, শিশির-ভেজা ঘাসের স্পর্শে ও কাশগুচ্ছের আন্দোলনে শরৎ ঋতুর আগমন সূচিত হয় এবং এই নাটকের গানের মাধ্যমে আশ্রমের ছেলেরা শরৎ ঋতুকে বাইরে ও অন্তরে আহ্বান করে নেবার ভার নিয়েছে।

এই নাটকের গানে দুটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে ধরা পড়ে। একটি হল যে,

শরতের শিশিরসিক্ত সকালবেলাকার সৌন্দর্যই কবির মনকে বিশেষভাবে নাড়া দেয় ও সেজন্যে শরৎ ঋতুর উপর রচিত এই নাটকের অধিকাংশ গানেই রবীন্দ্রনাথ সকালবেলাকার রাগরাগিণী ব্যবহার করেছেন। উদাহরণস্বরূপ 'ওগো শেফালিবনের মনের কামনা', 'এই শরৎ আলোর কমল বনে', 'তোমার মোহন রূপে'—গানগুলির কথা উল্লেখ করা যায়।

আর দ্বিতীয়ত এই নাটকের কোনো কোনো গানে শান্তিনিকেতন আশ্রম পরিবেশের সঙ্গে ফেলে-আসা পদ্মাতীরের পরিবেশ এক হয়ে মিশে দেখা দিয়েছে. উদাহরণস্বরূপ 'মেঘের কোলে রোদ হেসেছে' ও 'আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায়' —গান দুটির কথা উল্লেখ করা যায়।

এই প্রসঙ্গে এই যুগে রচিত কবির ঋতু সংগীতের কিছু উল্লেখযোগ্য নমুনা নীচে দেওয়া গেল। যা থেকে এই সময়কার সৃষ্ট ঋতু সংগীতের প্রকৃতি কিছু পরিমাণে ধরা পড়বে—

	গান	ঋতু	রাগ ও তাল
১	মেঘের কোলে রোদ হেসেছে	শরৎ	একতাল
২	আজ ধানের ক্ষেতে	”	লোকসংগীতের সুর, কাহারবা
৩	নব কুঞ্জ ধবল	”	ভৈরব/ত্রিতাল
৪	আমার নয়ন ভুলানো এলে	”	মিশ্র বিলাবল/দাদরা
৫	তোমার সোনার থালায়	”	মিশ্র ললিত/বিলম্বিত ত্রিতাল
৬	বসন্তে কি শুধু	বসন্ত	লোকসংগীতের সুর কাহারবা
৭	আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে	”	বাহার/ত্রিতাল
৮	মেঘের পরে মেঘ জমেছে	বর্ষা	মিশ্র/সাহানা একতাল
৯	আজি শ্রাবণঘনগহন	”	গৌড়মল্লার/ঝম্পক
১০	এসো হে এসো সজল	”	মল্লার, ঝাঁপতাল
১১	আষাঢ় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো	”	ইমনকল্যাণ/একতাল
১২	আজি ঝড়ের রাতে	”	মিশ্রসিন্ধু, ঝম্পক
১৩	শরতে আজ কোন্ অতিথি	শরৎ	কীর্তনাঙ্গ সুর/তেওড়া
১৪	চিত্ত আমার হারালো	বর্ষা	মল্লার/কাহারবা
১৫	আবার এসেছে আষাঢ়	”	মল্লার/দাদরা
১৬	ওগো শেফালিবনের মনের	শরৎ	টোড়ী/ভৈরবী, দাদরা
১৭	বসন্তে আজ ধরার চিত্ত	বসন্ত	পিলু/একতাল
১৮	আজ শ্রাবণ হয়ে	বর্ষা	কাফি মল্লার/ত্রিতাল
১৯	এই শরৎ আলোর কমল বনে	শরৎ	ভৈরব/রূপকড়া

	গান	ঋতু	রাগ ও তাল
২০	তোমার মোহন রূপে	শরৎ	ভৈরবী/কাহারবা
২১	শরৎ তোমার অরুণ আলোর	"	দাদরা
২২	বসন্তে ফুল গাঁথল	বসন্ত	হাম্বীর/দাদরা
২৩	আজি এই গন্ধবিধুর সমীরণে	"	পরজ বসন্ত/ত্রিতাল

শান্তিনিকেতন আশ্রমে বসন্ত ঋতুর প্রবেশ অনেকটা ঋতুরাজের মতোই। এই যুগে রচিত ফাল্গুনী ও পরবর্তীকালে রচিত নবীন, বসন্ত— এই গীতি-নাট্যগুলিতে গানের মাধ্যমে বসন্তের উজ্জ্বল ও প্রাণোচ্ছল বর্ণসম্ভারকে ধরে রাখার চেষ্টা হয়েছে।

এই যুগে রচিত অরূপরতন নাটকটি ঋতুনাট্য না হলেও এর মধ্যে বসন্তের একটা পরিবেশ আছে।

এই সময়ে রচিত "গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি— তিনটি কাব্যেই কবির আধ্যাত্মিক অনুভূতির প্রকাশ। সুতরাং এদের প্রকারগত প্রভেদ নেই। কিন্তু পরিমাণগত প্রভেদ এদের মধ্যেও আছে। গীতাঞ্জলি অভিসারের কাব্য। গীতিমাল্য মিলনের আর গীতালি ভাবসম্মিলনের। বিশ্বদেবতাকে হৃদয়ে উপলব্ধির আকাঙ্ক্ষা গীতাঞ্জলিতে পূর্ণ হয় নি; ক্ষণে ক্ষণে শুধু তার দর্শন মিলেছে।

গীতিমাল্যে আকাঙ্ক্ষিত মিলন এসেছে, আর গীতালি প্রৌঢ় মিলনের গুঞ্জনে পূর্ণ। যদিও তিনটি কাব্যেই বর্ষা শরৎ বসন্ত স্থান পেয়েছে, তবুও এই প্রভেদটির জন্যে গীতাঞ্জলিতে বর্ষা, গীতিমাল্যে বসন্ত আর গীতালিতে শরৎ ঋতুর প্রাধান্য। কারণ বর্ষা অভিসারের ঋতুর, বসন্ত মিলনের আর ভাবসম্মিলনের মধ্যে উচ্ছ্বাসহীন যে উপলব্ধি থাকে, তার পক্ষে শরতের পরিবেশই সবচেয়ে উপযোগী।" ('প্রকৃতির কবি রবীন্দ্র...' — প্রমথনাথ সেন)

অবশ্য গীতাঞ্জলিতে প্রথম দিকে কয়েকটি শরতের গান আছে। সেগুলি শারদোৎসব ঋতুনাট্য থেকে নেওয়া হয়েছে।

যাক, উপরে যে তিনটি কাব্যের পরিমাণগত প্রভেদ ও তার জন্যে তিনটি ঋতুর প্রাধান্যের কথা বলা হল, তা ঐ কাব্যগ্রন্থগুলির অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি গানের উদ্ধৃতির সাহায্যে পরিস্ফুট করার চেষ্টা করব।

আষাঢ় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল
গেল রে দিন বয়ে
বাঁধনহারা বৃষ্টিধারা
ঝরছে রয়ে রয়ে

—গীতাঞ্জলি ১৯

এসো হে এসো সজল ঘন
বাদল বরিষনে

বিপুল তব শ্যামল স্নেহে
এসো হে এ জীবনে

—গীতাঞ্জলি ৩৫

চিত্ত আমার হারাল আজ
মেঘের মাঝখানে
কোথায় ছুটে চলেছে সে
কোথায় কে জানে

—গীতাঞ্জলি ৭০

বসন্তে আজ ধরার চিত্ত
হল উতলা
বুকের পরে দোলে যে তার
পরান পুতলা

—গীতিমাল্য ৫৫

কার হাতে এই মালা তোমার পাঠালে
আজ ফাগুন দিনের সকালে।

—গীতিমাল্য ৬৫

আজ জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে
বসন্তের এই মাতাল সমীরণে।

—গীতিমাল্য ৮৬

এই শরৎ আলোর কমল বনে
বাহির হয়ে বিহার করে
যে ছিল মোর মনে মনে।

—গীতালি ১৫

শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি
ছড়িয়ে গেল ছাপিয়ে মোহন অংগুলি

—গীতালি ২৬

রাগ প্রয়োগে এই যুগের ঋতু সংগীতে কবি সাধারণভাবে চিরাচরিত প্রথাই অনুসরণ করে গেছেন, অর্থাৎ বসন্ত ঋতুর বর্ণনা গানে সাধারণভাবে বাহার, বর্ষা ঋতুর বর্ণনা গানে মল্লার, আর শরৎ ঋতুর বর্ণনা গানে সকালবেলায় গেয় রাগই ব্যবহার হয়েছে বেশি।

তবে এই যুগে কিছু ঋতু সংগীত তিনি লোকসংগীতের সুরেও বেঁধেছেন; যথা—'আজ ধানের ক্ষেতে', 'বসন্তে কি শুধু' ও কিছুটা কীর্তনের ঢঙে 'শরতে আজ কোন্ অতিথি' গানটি।

নৈবেদ্যর পূর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির উপাদানের মধ্যে যে জিনিসটির উপস্থিতি বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ ও উপলব্ধি করেছেন সেটা হল তার সৌন্দর্য।

রূপমুগ্ধতাই তাঁর এই যুগের কাব্যকে বিশেষভাবে বৈশিষ্ট্য প্রদান ও চিহ্নিত করেছে। নৈবেদ্য থেকে কবি সেই সৌন্দর্যকে কল্যাণের সঙ্গে যুক্ত করে প্রকৃতিকে নতুনভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন। পরবর্তীকালে রচিত গীতাঞ্জলি, গীতিমালা ও গীতালিতে তাই প্রকৃতির উপলব্ধিতে প্রাকৃতিক, আধ্যাত্মিক আনন্দের সঙ্গে তার সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ ও উপভোগের চেষ্টার সমন্বয় ঘটেছে।

কিন্তু প্রকৃতি তখনো কবিসত্তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে ওঠে নি, যেমন হয়েছিল শেষ যুগে, যেখানে কবি প্রকৃতির ঋতুলীলায় একটি প্রয়োজনীয় বস্তুতে পরিণত হয়েছিলেন। সেখানে কবি এবং প্রকৃতি এক ও অভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। শান্তিনিকেতনের বিশেষ প্রাকৃতিক পরিবেশই তাকে প্রকৃতির সঙ্গে এক হয়ে যেতে সহায়তা করেছিল। যেহেতু তিনি এখনো প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হতে পারেন নি, সেইজন্যে এই যুগে রচিত ঋতু সংগীতগুলি শেষ যুগের গানের মতো সংগীতশাস্ত্রের বেড়া ভেঙে মানবমনের অনুভূতির বাহন হয়ে ঋতুর জন্যে বাঁধা রাগরাগিণীর গণ্ডি থেকে একেবারে মুক্ত হতে পারে নি। তবে তার প্রচেষ্টা এই যুগে শুরু হয়েছে।

এটাও বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয় যে, এই যুগের ঋতুসংগীতে শরৎ বর্ষা আর বসন্ত ঋতুর প্রাধান্য রয়েছে : শীত গ্রীষ্ম হেমন্ত ঋতু প্রবেশাধিকার পায় নি ; এরা প্রবেশাধিকার পেয়েছিল পরবর্তী যুগে।

স্বদেশী সংগীত

প্রথম যুগে অগ্রজদের সঙ্গে হিন্দু মেলা ও 'সঞ্জীবনী'র প্রভাবে রবীন্দ্রনাথ কিছু স্বদেশী সংগীত রচনা করেছিলেন ; তার ভাব, ভাষা ও সুরাবোপে তিনি প্রচলিত প্রথারই অনুসরণ করে আসছিলেন। দুঃখিনী দেশমাতৃকার জন্যে দুঃখবোধ, তার দুঃখ ঘোচাবার সংকল্প— এইগুলিই তাঁর গানের মূল বক্তব্য বিষয় ছিল। এই-সব গানে সাধারণত হিন্দুস্থানী রাগ-রাগিণীর উপর ভিত্তি করেই সুরারোপ করা হয়েছিল। যদিও দু-একটি গান রামপ্রসাদী ও লৌকিক সুরে রচিত হয়েছিল। তবে সেই যুগের একটি উল্লেখযোগ্য স্বদেশী সংগীত হল ভৈরবী রাগিণীতে "অয়ি ভুবনমনোমোহিনী"—কী উদ্দেশ্যে ও পরিস্থিতিতে ঐ গানটি লেখা হয়েছিল, তা আগেই বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

কিন্তু এই যুগে স্বদেশী সংগীত রচনা বা সৃষ্টি নতুন পথে মোড় নিল।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও রাখীবন্ধন উৎসব উপলক্ষে রচিত বলে তাঁর এই-সমস্ত স্বদেশী গান বাংলা দেশের উপর ভিত্তি করে রচিত হল, তাতে তিনি আরোপ করলেন বাংলা দেশের প্রচলিত লোকসংগীত, বিশেষ করে বাউলাঙ্গ সুর। বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে যে-সব স্বদেশী সংগীত কবি রচনা করেছিলেন, তা বাউল নাম দিয়ে একটি পুস্তিকায় প্রকাশিত হয় ; তাতে নিম্নলিখিত কুড়িটি স্বদেশী সংগীত সংকলিত হয়!

	গান		রাগ/প্রকৃতি
১	সার্থক জনম আমার	—	ভৈরবী
২	আমরা পথে পথে যাব	—	রামকেলী
৩	আমার সোনার বাংলা	—	বাউলাংগ
৪	ও আমার দেশের মাটি	—	বাউলাংগ
৫	বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি	—	বেহাগ
৬	আমি ভয় করব না	—	ভূপালী
৭	নিশিদিন ভরসা রাখিস		বাউলাংগ
৮	এবার তোর মরা গাঙে	—	সারী গানের সুর
৯	যদি তোর ডাক শুনে কেউ	—	লোকসংগীতের সুর
১০	আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে	—	বিভাস
১১	যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক		বাউলাংগ
১২	যে তোরে পাগল বলে	—	”
১৩	ওরে তোরা নাইবা	—	”
১৪	যদি তোর ভাবনা	—	”
১৫	আপনি অবশ হলি	—	”
১৬	জোনাকি কী সুখে		”
১৭	মা কি তুই পরের দ্বারে	—	”
১৮	তোর আপন জনে ছাড়বে	—	”
১৯	ছি ছি চোখের জলে	—	”
২০	ঘরে মুখ মলিন দেখে	—	”

এই পুস্তিকার অধিকাংশ গানই বাউলাংগ সুরে রচিত। স্বদেশী সংগীতের এই পুস্তিকার নাম 'বাউল' রাখার বিশেষ একটা তাৎপর্য আছে। বাউলরা সাধারণত ধর্মের অত্যন্ত গূঢ় কথা ও উচ্চতম ভাব লৌকিক সুরের সহায়তায় সাধারণ মানুষের অন্তরে পৌঁছে দেয়। রবীন্দ্রনাথও স্বাদেশিক মন্ত্র সহজ ভাষায় সহজ সুরে ও তালে লোকের কাছে পৌঁছে দিয়ে তাদের স্বাদেশিকতা ও দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছিলেন। গানগুলি অধিকাংশই বাউল গানের সুরে রচিত বলে এই পুস্তিকাটির নাম 'বাউল' রেখেছিলেন। বাউলাংগ ও লোকসংগীতের সুর প্রয়োগের সার্থকতা বিশ্লেষণ করতে একজন সমালোচক মন্তব্য করেছেন, "বঙ্গভঙ্গের আকস্মিক রূঢ় আঘাতে বাংলাদেশের মর্মস্থানে যে রক্ত ঝরেছিল, তার ক্ষতের উপর বাংলার অন্তর থেকে উৎসারিত লোকসংগীতের সুর ছাড়া আর কিছুই শান্তির প্রলেপ বুলাতে পারত না।"

('সুরের গুরু'—অমিয়কুমার সেন, নীলিমা সেন)

এই সময়ে তিনি যে স্বদেশী গানে রাগ প্রয়োগ করেছেন, তার অধিকাংশের ছন্দবিন্যাস ও পরিবেশন পদ্ধতি এমনভাবে করা হয়েছে যাতে বাউলাংগ লোক-

সংগীতের আমেজ আসে। উদাহরণস্বরূপ 'বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি' (বেহাগ) ও 'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে' (বিভাস) গানগুলির কথা উল্লেখ করা যায়। এই-সব গানে বাউল রীতি বা ঢঙ গ্রহণ করার কারণ— এর ছন্দ বা দোলায় জেগে উঠেছিল জীবনমরণের উম্মাদনা এবং তা সেই যুগে স্বদেশী আন্দোলনে উদ্দীপনা এনে বাঙালীর অন্তরে জাতীয় জাগরণের সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিল। তবে এর মধ্যে 'সার্থক জনম আমার' গানটির ঢঙ ও চাল স্বতন্ত্র, এটি ঢিমা চালের টপ্পা অংশের গান। হয়তো গানটির মধ্যে গাম্ভীর্য এবং কারুণ্য ফুটিয়ে তোলবার জন্যে দিয়েছেন রাগাশ্রয়ী সুর, যেমন দিয়েছেন এই যুগে রচিত আর-একটি দেশাত্মবোধক গানে 'এ ভারতে রাখো'। একে অনেকে ব্রহ্মসংগীতের পর্যায়েও ফেলে থাকেন।

স্বাধীনতা সংগ্রাম সব দেশেই হয়েছে; তাতে কামান-বন্দুকের গর্জন ও জনগণের হুংকারই শোনা গেছে বেশি। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন অভিনব রূপমণ্ডিত হয়ে উঠল রবীন্দ্রনাথের অজস্র গানের মাধ্যমে। তখন রাখীবন্ধন ও রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধক গান মিলে স্বদেশী আন্দোলনের যে একটা শ্রীমণ্ডিত রূপ দিয়েছে, পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাসে বোধ হয় তার কোনো তুলনা নেই।

এই সময়ে রাখীবন্ধন উপলক্ষে যে-সব গান কবি রচনা করেন, তার মধ্যে এই ক'টি উল্লেখযোগ্য:

১	বাংলার মাটি বাংলার জল	—	বাউলাঙ্গ
২	বিধির বাঁধন কাটবে তুমি	—	খাম্বাজ
৩	ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে	—	বাউলাঙ্গ

ভারতের জাতীয় সংগীত 'জনগণমন অধিনায়ক' তাঁরই অবদান। বাংলাদেশও জাতীয় সংগীত হিসেবে বেছে নিয়েছে তাঁরই অনুপম সৃষ্টি 'আমার সোনার বাংলা' গানটি। এই দুটি গানই এই যুগে রচিত হয়েছিল। একই কবির গান দুইটি স্বাধীন দেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে গৃহীত হওয়ার আর কোনো নজির আছে বলে আমরা জানি না।

এইবার বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরবর্তীকালে রচিত কবির স্বদেশী গানের প্রসঙ্গেই ফিরে যাওয়া যাক।

আগেই বলা হয়েছে, এর পর কবি ধীরে ধীরে নিজেকে প্রাদেশিক স্বদেশপ্রেম থেকে মুক্ত করে প্রথমে সর্বভারতীয় ও পরে আন্তর্জাতিক হবার প্রয়াসী হন।

কবির এই সর্বভারতীয় ও আন্তর্জাতিক হবার প্রচেষ্টা এই যুগের শেষভাগে রচিত স্বদেশী গানগুলি থেকে বোঝা যায়:

১	হে মোর চিত্ত পুণ্য তীর্থে	—	প্রভাতী, দাদরা
২	জনগণমন অধিনায়ক জয় হে	—	কাহারবা
৩	দেশ দেশ নন্দিত করি	—	হাম্বীর, একতাল

এই গানগুলি কবি কিন্তু লোকসংগীতের সুরে রচনা করেন নি— তিনি তাঁর

গানকে সর্বভারতীয় রূপ দিতে গিয়ে আবার সর্বভারতে প্রচলিত হিন্দুস্থানী রাগ-রাগিণীর উপরই নির্ভর করেছেন।

বাংলা ও অন্যান্য ভাষায় রচিত বিভিন্ন দেশাত্মবোধক গানে আমরা দেশের পরাধীনতার গ্লানি ও দুর্দশার জন্যে দুঃখ ও ক্ষোভ প্রকাশ ও দেশের অতীত গৌরবকে মনে করিয়ে দিয়ে, দেশের ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির উজ্জ্বল চিত্র অংকন ক'রে দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করার প্রচেষ্টা অনেক সময়েই দেখতে পাই। কিন্তু স্বদেশের পুণ্যভূমিতে বিশ্ববাসীকে আহ্বান করে তাদের সহযোগিতার মাধ্যমে স্বদেশের সমৃদ্ধি ও উন্নতির কল্পনা রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ করেছেন বলে আমরা জানি না। 'হে মোর চিত্ত পুণ্য তীর্থে' গানটিতে কবি বিশ্ববাসীকে অনুরূপ উদ্দেশ্যে ভারতের 'মহামানবের সাগরতীরে' মিলিত হবার জন্য ডাক দিয়েছেন এবং এই বিচারে এটিকে একটি স্বতন্ত্র ধারার অসাধারণ জাতীয় সংগীত বলে গণ্য করা যেতে পারে।

এই যুগে রচিত অন্য একটি গান 'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে' গানটি ভারতের জাতীয় সংগীতরূপে গৃহীত হয়েছে।

'জনগণমন' গানটি ১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় রচিত হয়। ১২ ডিসেম্বর তারিখে দিল্লী দরবারে বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষিত হয়। বিহার ও উড়িষ্যায় নতুন প্রদেশ গঠিত হয়। ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়। সম্রাট পঞ্চম জর্জ বড়োদিন উপলক্ষে কলকাতায় আসেন; সেই সময় কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। রবীন্দ্রনাথ তখন কলকাতায় ছিলেন। আশুতোষ চৌধুরী প্রমুখ ব্যক্তিগণ উক্ত অধিবেশনের জন্য একটি জাতীয় সংগীত রচনা করতে রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেন। তখন রবীন্দ্রনাথ 'জনগণমন' গানটি রচনা করেন এবং ২৪ ডিসেম্বর কলিকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনের দ্বিতীয় দিবসে উদ্বোধনী সংগীত হিসেবে গানটি প্রথম গীত হয়। এই গানটি সম্বন্ধে এরূপ একটি জনশ্রুতি ছিল যে, রবীন্দ্রনাথ গানটি সম্রাটের রাজ্যাভিষেকের প্রস্তুতির জন্য রচনা করেন। কিন্তু এটা আদৌ সত্য নয়, রবীন্দ্রনাথ এই সম্বন্ধে নিম্নোক্ত মতামত প্রকাশ করে এই সম্পর্কে সব বিতর্কের অবসান ঘটান।—

"রাজসরকারে প্রতিষ্ঠাবান আমার কোনো বন্ধু সম্রাটের জয়গান রচনার জন্যে আমাকে বিশেষ করে অনুরোধ জানিয়েছিলেন শুনে বিস্মিত হয়েছিলুম; এই বিস্ময়ের সঙ্গে মনে উত্তাপেরও সঞ্চার হয়েছিল। তারই প্রবল প্রতিক্রিয়ার ধাক্কায় আমি জনগণমনঅধিনায়ক গানে সেই ভারতভাগ্যবিধাতার জয়ঘোষণা করেছি, পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থায় যুগযুগধাবিত যাত্রীদের যিনি চিরসারথি, যিনি জনগণের অন্তর্যামী পথপরিচায়ক, সেই যুগযুগান্তরের মানবভাগ্যরথচালক যে পঞ্চম বা ষষ্ঠ বা কোনো জর্জই কোনোক্রমেই হতে পারেন না, সে-কথা রাজভক্ত বন্ধুও অনুভব করেছিলেন। কেননা তাঁর ভক্তি যতই প্রবল থাক্, বুদ্ধির অভাব ছিল না।... [পুলিনবিহারী সেনকে লিখিত পত্র : ২০ নভেম্বর, ১৯৩৭]

হাম্বীর রাগে 'দেশ দেশ নন্দিত করি' গানটি রচিত হয় আনি বেসান্তের অন্তরীণ উপলক্ষে।

ভারতবর্ষের সমস্ত অঞ্চল এবং সকল সম্প্রদায় ও অধিবাসীদের উপযোগী করে তিনি যখন স্বদেশী সংগীত রচনা করেছিলেন, তখন সেগুলিতে সুরের দিক দিয়ে সর্বভারতে প্রচলিত রাগ-রাগিণীর প্রয়োগ ছাড়াও আর একটি সাহিত্যিক স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য আরোপিত হয়েছিল। বাংলা ভাষায় হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বরের উচ্চারণ নিয়মিত নয়। দীর্ঘ স্বরের হ্রস্ব উচ্চারণ এবং ক্ষেত্রবিশেষে হ্রস্ব স্বরকে টেনে দীর্ঘ করার রীতি আধুনিক বাংলায় বিশেষভাবে প্রচলিত। কিন্তু সর্বভারতীয় রীতিতে এর প্রচলন নেই। তাই সংস্কৃত ভাষার হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণের রীতি প্রয়োগ করে কবি তাঁর কিছু স্বদেশী গানকে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য করে সকলের পক্ষে তা গাওয়া সহজ করে তুলেছিলেন। তাঁর স্বদেশী গান—অয়ি ভুবনমনমোহিনী, জনগণমন-অধিনায়ক এবং বসু-বিজ্ঞানমন্দির প্রতিষ্ঠা-উৎসবে আবাহন-সংগীত 'মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন' গানগুলি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

আর একটি ভাষাগত বিশেষত্ব রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সংগীতগুলিকে সর্বভারতীয় রূপ দেওয়া সহজ করে তুলেছে, তা হল ক্রিয়াপদের স্বল্প ব্যবহার।

সংস্কৃত শব্দের বহুল ব্যবহার, সংস্কৃত রীতির উচ্চারণ প্রয়োগ এবং ক্রিয়াপদের কম ব্যবহার রবীন্দ্রনাথের এই স্বদেশী সংগীতগুলিকে ভারতের সব অঞ্চলের অধিবাসীদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে।

ভারতবর্ষের সনাতন আদর্শ হল—নানা বিভেদের মধ্যেও একটি অখণ্ড ঐক্যের সন্ধান। সকল সম্প্রদায়, এমনকি ভারতের বাইরের অধিবাসী ও সম্প্রদায়কেও স্বীকার ও সাদরে গ্রহণ করাই ভারতের আদর্শ। এই যুগের শেষভাগে রচিত রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গানে এই আদর্শকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। স্বদেশের গৌরব গানের সঙ্গে সমস্ত পৃথিবীকে ভারতের তীর্থক্ষেত্রে তার কল্যাণের জন্যে আহ্বান, রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গানকে এক স্বতন্ত্র মর্যাদা ও গৌরব দান করেছে। ভারতবর্ষ শুধু তার ভৌগোলিক সীমাতেই আবদ্ধ নয়, সে হচ্ছে 'মহামানবের সাগরতীর'। কবি বিশ্বভারতীর পরিকল্পনার মধ্যে এই আদর্শকেই রূপ দিতে চেয়েছেন। শান্তিনিকেতনের পুণ্যক্ষেত্রে তিনি বিশ্ববাসীকে এক হয়ে মিলনের আহ্বান জানিয়েছেন।

ধর্ম বা পূজা পর্যায়ের গান

এটা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, উনিশ শতকে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার পর সমাজের উপাসনায় যখন সংগীত অচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে ওঠে, তখন রবীন্দ্রনাথের অগ্রজরা, বিশেষ করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ব্রহ্মসংগীত রচনায় প্রবৃত্ত হন। অগ্রজদের

অনুসরণে রবীন্দ্রনাথও এই ধারার সংগীত রচনায় হাত দেন ও তাকে একটা সার্থক পর্যায়ে নিয়ে যান। এই ধারার গানগুলিকে ব্রহ্মসংগীত বলা হত এই কারণে যে, এইসব গানে সাধারণত ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যা বা ভাষা দেবার চেষ্টা করা হত ও লক্ষ্য করলে দেখা যায় এর অধিকাংশ গানই ধ্রুপদ সংগীতের উপর ভিত্তি করে রচিত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথমযুগের এইসব ধর্ম বা ব্রহ্ম-সংগীতে ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যাতা হিসেবেই আত্মপ্রকাশ করেছিলেন।

সুর ও ছন্দের মান বিচারে এইসব গানের যতই উৎকর্ষ থাকনা কেন, এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, কবির প্রথমযুগের এইসব ধর্মসংগীত ভাবের দিক দিয়ে কিছুটা পরমুখাপেক্ষী ছিল এবং তাতে তিনি পূর্বসূরীদের দ্বারাই প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন বেশী; স্বকীয়তা ততটা ছিল না।

কিন্তু এ যুগের প্রথমদিকে ব্রহ্মসংগীতের ধাঁচে ধর্মসংগীত রচনা করলেও ধীরে ধীরে এই পরিবেশ থেকে উত্তীর্ণ হয়ে নিজস্ব অন্তরতম আকূতির পরিচয় দিতে শুরু করেছেন ও সেটা শুরু হয়েছে এই যুগে গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য ও গীতালির রাগসম্মত অথচ কাব্যমণ্ডিত বিশিষ্ট ধর্মসংগীতগুলির মাধ্যমে।

এটা পরিস্ফুট হয়ে উঠবে যদি আমরা প্রথমযুগে রচিত ব্রহ্মসংগীতগুলির সংগে এ যুগের ধর্ম বা পূজা পর্যায়ের গানগুলির তুলনা করি।

ইমনকল্যাণ—চৌতাল

শোনো তাঁর সুধাবাণী শুভমুহূর্তে শান্ত প্রাণে
ছাড়ো ছাড়ো কোলাহল, ছাড়োরে আপন কথা ॥
আকাশে দিবানিশি উথলে সংগীতধ্বনি তাঁহার,
কে শুনে সে মধুবীণারব
অধীর বিশ্ব শূন্যপথে হল বাহির ॥ —রচনাকাল ১৮৮৬।

ইমনকল্যাণ—তেওড়া

আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধুলার তলে।
সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে ॥
নিজেরে করিতে গৌরব দান নিজেরে কেবলই করি অপমান,
আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া ঘুরে মরি পলে পলে।
সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে ॥ —রচনাকাল ১৯০৬।

যদি উপরোক্ত দুটি গানের (একই রাগে) তুলনা কবি, তবে দেখতে পাব যে আগের গানের সঙ্গে পরের গানের ভাব, ভাষা, সুর ও তাল সবদিক দিয়েই পার্থক্য আছে ও প্রথমোক্ত গানে ভাষা, সুর ও তালের দিক দিয়ে (যথা ব্রাহ্মধর্মের বাণী ও ধ্রুপদী ঋজুতা) যে কাঠিন্য আছে, তা পরের গানে ভাব, ভাষা ও সুরের দিক দিয়ে অনেকটা নরম হয়ে এসেছে।

এই বিষয়টিকে আরো পরিষ্কার করে বোঝাবার জন্যে এই দুই গানের অংশ-বিশেষের স্বরলিপি করে দেওয়া গেল :

শোনো তাঁর সুধাবাণী

১ | ০ | ১ | ০ | ১ | ৪

II ধা ধপা | ধপা ক্ষা | -পনধা ধপা | পা পা | -পগা গা | -মগা গরা I
শোo নোo | তাঁo o | o o o র o | সু ধা | o o বা | o o ণী o

I গরা গা | -রা পক্ষা | পক্ষা পা | গাঃ -রঃ | গরা রনা | -রসা সা I
শুo ভ | o মুo | হূর্ তে | শা ন্ | তo প্রাo | oo নে

I সা না | ধা সরা | গরা গা | -রা গা | -রাঃ -নাঃ | -রসা সা I
ছা ড়ো | o ছাড়ো | কোo লা | o হ | o o | oo ল

II
I সা সা | র্সা ধপক্ষা | -পা না | পাঃ রঃ | গা রনা | -রসা সা II
ছা ড়ো | রে আoo | o প | ন o | ক oo | o o থা

আমার মাথা নত করে দাও হে

২ | ৩ | [পা] ১ | ২ | ৩ | ১

সা া | সা া II সা র্সা না | ধা া | পা পা | পক্ষা -ধা পা
আ o | মা র্ মা থা ন | ত o | ক রে | দাo ও হে

২ | ৩ | ১ | ২ | ৩ | ১

ক্ষাঃ -পঃ | গা -া I | I রা গা রা | গা -া | মা মা I গা -া -রা
তো o | মা র | চ র ণ | ধূ o | লা র ত o o

২ | ৩ II

সা -না | সা -া I
লে o | o o

১ ২ ৩ ১ ১ ৩
I সা রা রা | সরা -গা | গা -া I গা -া গা | গপা -া | রা -া I
স ক ল | অ ০ ০ হ ঙ্ কা র্ হে | আ ০ | মা র্

১ ১ ৩ ১
I রা গা পা ধা -া | না না I না ধনা -র্সা
ড্ বা ও | চো ০ | খে র জ লে ০ ০

'আমার মাথা নত করে দাও হে' গানটি যাঁকে উদ্দেশ্য করে গাওয়া, সেই ভগবান বা জীবনদেবতা হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃস্টান, মুসলমান বা অন্য কোন সম্প্রদায়ের নন। এ দেবতাকে যে-কোনো ভক্ত একান্ত নিজস্ব দেবতা বলে প্রণতি বা শ্রদ্ধা জানাতে পারে। বিশেষ লক্ষ্য করবার বিষয় যে এই গান ব্রাহ্মধর্মের গোষ্ঠীবদ্ধতা থেকে মুক্ত। এইভাবে এই যুগের ধর্মসংগীত ব্রহ্মসংগীত থেকে পূজার গানে পরিণত হয়েছে।

খেয়া কাব্য হতেই কবির মানসিক গঠনে একটা অধ্যাত্মচিন্তার বিশেষ গতি নজরে পড়ে ও গীতাঞ্জলিতে তার এক সুগভীর পরিণতি লক্ষ্য করা যায়। শান্তিনিকেতনের শান্ত ও মৌন পরিবেশ কবিচিত্তের আধ্যাত্মিক অনুভূতির পূর্ণ বিকাশের পথ যেন সুগম করে দিল।

ধর্মসংগীত বা পূজার গানে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার ক্রমবিকাশ ও পরিণতি সাহিত্যসন্ধানীদের চিরকাল বিশেষভাবে কৌতূহল উদ্রেক করে তা তাদের আকর্ষণ করে এসেছে।

"প্রথম জীবনে ধর্মের নানা প্রেরণাকে সাহিত্য ও সংগীতে রূপ দিয়ে 'গীতাঞ্জলি' গীতিকাব্যের যুগে এসে রবীন্দ্রনাথ একটি ধারাবাহিকতাকে নিবিড়ভাবে অবলম্বন করেছেন। 'গীতাঞ্জলি' 'গীতিমাল্য' এবং 'গীতালি' এই ত্রয়ীর প্রথমটি অভিসারের কাব্য বা সংগীত, দ্বিতীয়টি মিলনের এবং সর্বশেষটি ভাব সম্মিলনের।"

'সুরের গুরু'—অমিয় সেন ও নীলিমা সেন।

"বিশ্বদেবতাকে হৃদয়ে উপলব্ধির আকাঙ্ক্ষা গীতাঞ্জলিতে পূর্ণ হয় নি, ক্ষণে ক্ষণে শুধু তার দর্শন মিলেছে। গীতিমাল্যে আকাঙ্ক্ষিত মিলন এসেছে আর গীতালি প্রৌঢ় মিলনের গুঞ্জনধ্বনিতে পূর্ণ ও সে মিলনের উপলব্ধি হয়েছে দুঃখ ও বেদনার মধ্য দিয়ে।"

'প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ'—অমিয় সেন।

"আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরাণ সখা বন্ধু হে আমার" —গীতাঞ্জলি।

"প্রভু তোমালাগি আঁখি জাগে
দেখা নাই পাই
পথ চাই
সেও মনে ভালো লাগে।" —গীতাঞ্জলি।

"তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে
আলোয় আকাশ ভরা।
তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে
ফুল্ল শ্যামল ধরা।" —গীতিমাল্য।

"এই লভিনু সংগ তব সুন্দর হে সুন্দর
পুণ্য হল অংগ মম ধন্য হল অন্তর।"
—গীতিমাল্য।

গীতাঞ্জলির আকুল বিরহের কান্না ও গীতিমাল্যের শান্তমধুর বিরহব্যথার পর গীতালিতে কবি যেন এই বেদনার একটা সার্থকতা দেখতে পেলেন। আঘাত দিয়ে কাঁদিয়ে শেষে প্রিয়তম তাঁকে দেখা দিলেন। এতদিনের কান্না তাঁর সার্থক হল। কবি তাঁর অধ্যাত্মসাধনায় এই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করলেন যে দুঃখ ও বেদনার মধ্য দিয়েই ভগবানের আবির্ভাব ও তাঁর উপলব্ধি, সুখ-শান্তির পথে তা সম্ভব নয়।

বেদনার আগুন তাঁর জীবনকে দীপ্তি ও গরিমা দান করবে ও সেজন্যে কবির প্রার্থনা :

"আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে
এ জীবন পুণ্য করো দহন দানে
আমার এই দেহখানি তুলে ধরো
তোমার ওই দেবালয়ের প্রদীপ করো
নিশিদিন আলোকশিখা জ্বলুক গানে।"
—গীতালি।

মর্মান্তিক বিরহবেদনার পর যে মিলন তা নিবিড় ও আনন্দময়। তৃপ্তি ও সার্থকতায় কবির জীবন ভরে উঠল—

"আমার সকল রসের ধারা
তোমাতে আজ হোক-না হারা।
জীবন জুড়ে লাগুক পরশ
ভুবন ব্যেপে জাগুক হরষ
তোমার রূপে মরুক ডুবে
আমার দুটি আঁখিতারা॥" —গীতালি।

"গীতাঞ্জলির গানগুলির ভাষা সোজা, ভাব ভক্তিনম্র, সুরও মর্মস্পর্শী— সুতরাং এ গানগুলির আবেদন শাশ্বত ও সর্বকালিক। গীতিমাল্যে ভক্তিনম্রতার (আমার মাথা নত করে দাও) বিষাদ কমে এসেছে সুরে লেগেছে যাদুর জোয়ার। গীতালিতে কবিতার ভাব কমে গানের ভাগ বেড়েছে ও সেই সংগে সুর-মাধুর্যও।"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সুকুমার সেন।

এইভাবে ব্রহ্মসংগীত থেকে যে সহজ সরল রাগভিত্তিক পূজা পর্যায়ের গান-গুলি জন্ম নিল, পরবর্তী যুগে এগুলি বাউল ও কীর্তন সুরকেও বিশেষভাবে আশ্রয় করল। শুধু তাই নয়, বাউল এবং বৈষ্ণব দর্শনও বহুল পরিমাণে তাঁর পরবর্তী ধর্মসংগীতের অন্তর্ভুক্ত হল। এ সম্বন্ধে তাঁর শেষযুগের ধর্মসংগীত আলোচনার সময় বলা হবে। এই যুগে ও পরবর্তী যুগে পূজার গানে আর নেই ধ্রুপদী চালের ভারী ভারী তালের প্রাবল্য। গানগুলি সহজ সবল ও মাধুর্যপূর্ণ, কথা ও সুরের মিলনে অপূর্ব কাব্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

ব্রহ্মসংগীতের গোষ্ঠীবদ্ধতা থেকে পূজার গানে উত্তরণই রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক সংগীতের মূল কথা ও তার সূত্রপাত হয়েছিল এই মধ্যযুগেই। এর ফলে কথা সুর ও ছন্দে এই যুগের ধর্মমূলক গানে রূপান্তর ঘটেছিল :

এ যুগের তালের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা

আগেই বলা হয়েছে যে এই যুগকে সংগীতের উপর রবীন্দ্রনাথের পরীক্ষা-নিরীক্ষার যুগ বলা যেতে পারে, যেখানে রবীন্দ্রনাথ নব নব সৃষ্টির মাধ্যমে সংগীত সৃষ্টি করে চিরাচরিত রীতি থেকে সরে এসে একটা নিজস্ব পথ খুঁজে বের করবার চেষ্টা করেছেন।

প্রথমযুগে শাস্ত্রীয় সংগীতের বিভিন্ন অনুশাসন ও নিয়মাবলী পদে পদে তাঁর স্বাধীন ও স্বকীয় সৃষ্টির পথে বাধার সৃষ্টি করেছে ও এই যুগে তিনি সেই সব বাধা ও অনুশাসনকে অতিক্রম করতে চেয়েছেন, যেমন করেছেন রাগ-রাগিণীর শাস্ত্রীয় রূপের বেলায়। গানের কাব্যাংশ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে তাঁকে তালের বেলায়ও নতুন পথ ও নতুন ব্যাখ্যার কথা ভাবতে হয়েছে। কাব্যাংশকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য গানে নতুন ছন্দপ্রয়োগের কথাও তাঁকে ভাবতে হয়েছে ও তার ফলশ্রুতি স্বরূপ দেখা দিল এই যুগে তাঁর সৃষ্ট বা প্রবর্তিত রূপকড়া, নবতাল, একাদশী, ঝম্পক, ষষ্ঠী ও নবপঞ্চ তালগুলি। এই তালগুলির মাত্রা বিভাগ ও এই যুগে তাদের উপর ভিত্তি করে রচিত কিছু গানের উল্লেখ করা হল।

ঝম্পক—	৫ মাত্রা	৩+২	আজি ঝড়ের রাতে
ষষ্ঠী—	৬ মাত্রা	২+৪	নিবিড় মেঘের ছায়ায়
রূপকড়া	৮ মাত্রা	৩+২+৩	এই শরৎ আলোর কমলবনে

নবতাল ৯ মাত্রা ৩+২+২+২ যে কাঁদনে হিয়া কাঁদিছে (ছন্দ ৬+৩)
ব্যাকুল বকুলের ফুলে (ছন্দ ৩+৬)
দুয়ার মোর পথ পাশে (একত্রে ৯ মাত্রা)

একাদশী ১১ মাত্রা ৩+২+২+৪ দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া,
কাঁপিছে দেহলতা থরথর (ছন্দ ৩+৪+৪)

নবপঞ্চতাল ১৮ মাত্রা (মাত্রা বিভাগ—২+৪+৪+৪+৪)
জননী তোমার করুণ চরণখানি

এর মধ্যে নবতাল, একাদশী ও নবপঞ্চতালের উপর ভিত্তি করে এই যুগে গান রচনা করলেও পরবর্তী যুগে কিন্তু কবি এইসব তালে আর কোনো গান বাঁধেননি। তবে ঝম্পক, ষষ্ঠী ও রূপকড়া তাল কবি পরবর্তী যুগেও তাঁর গানে ব্যবহার করেছেন। এদের মধ্যে সবক'টি তালকেই পুরোপুরি রবীন্দ্র-সৃষ্ট বলা চলে কিনা সে-বিষয়ে একটু সন্দেহের অবকাশ আছে। কারণ, তাদের মধ্যে ষষ্ঠী ও রূপকড়া তালের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতীয় পত্তি, রূপক ও সারি তালের কিছুটা সাদৃশ্য আছে। এই বিষয়ে শ্রদ্ধেয় স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ তাঁর 'সংগীতে রবীন্দ্র প্রতিভার দান' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, "ঝাঁপতালের ১২।১২৩।১২।১২৩ মাত্রার কথা তিনি জানতেন কিন্তু সৃষ্টি করলেন তার বিপরীত গতিকে অবলম্বন করে ১২৩।১২।১২৩।১২—এই ঝম্পক তালের ধারা। দক্ষিণ ভারতের সারতাল অনুযায়ী ৩।২।৩ মাত্রার সমাবেশ দিয়ে তিনি সৃষ্টি করলেন রূপকড়া তালের। কর্ণাটি দুষ্কর তালের (৫+২+২) মাত্রাকে অনুসরণ করে তিনি রচনা করলেন নবতাল, ৩।২।২।২।২ মাত্রাগুলি সাজিয়ে কর্ণাটি সংগীতের মণিতাল, বিন্দুতাল ও নীল-তালকে অনুসরণ করে সৃষ্টি হল তাঁর হাতে একাদশী তাল, যার মাত্রা বিভাগ ৩।২।২।৪।'

উপরি-উক্ত তথ্যের বিচারে এদের মধ্যে কিছু তালকে পুরোপুরি রবীন্দ্র-সৃষ্ট না বলে রবীন্দ্র-প্রবর্তিত তাল বলা অধিকতর সংগত হবে কিনা তা ভেবে দেখার বিষয়।

গানের মধ্যে কাব্যাংশ বা গানের ভাব যাতে রাগ-রাগিণীর প্রভাবে বা তাল বিভাগের ফলে কোনোমতেই ক্ষুণ্ণ না হয় সেই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তিনি যে এই ৬টি তাল সৃষ্টি বা তাদের মাত্রা বিন্যাসকে নতুন-ভাবে সাজিয়ে বাংলা গানে প্রবর্তিত করেছিলেন তার প্রয়োজন হয়েছিল এই কাব্যাংশকে মর্যাদা দেবার জন্যেই, নিছক ছন্দসৃষ্টির নেশায় নয়। অনেক সময়েই দেখা যায় যে গানকে যথাসম্ভব শাস্ত্র অনুসারী করতে গিয়ে তাদের প্রচলিত তাল বিন্যাসের মধ্যে ফেলতে হয়, তাতে গানের বাণীর অংগহানি হয় ও উচ্চারণ বিকৃতি ঘটে। হিন্দুস্থানী গানে এটা আমাদের শ্রুতিকটু না লাগলেও বাংলা গানে তা খুব অসুবিধাজনক হয়ে দেখা দেয়। এই নতুন ৬টি তাল তাঁর গানে প্রয়োগ করে রবীন্দ্রনাথ এইসব অসুবিধা দূর করতে চেয়েছেন।

গানের কাব্যাংশকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে ছন্দের গতি এমন করতে হবে যাতে সুর সংযোজন ও সেই ছন্দে বাঁধতে গিয়ে গানের বাণী খণ্ডিত না হয়।

গানের গতি সাবলীল রাখার জন্যে এবং কাব্যাংশকে অক্ষুণ্ণ রাখার অনুপ্রেরণায় তাঁকে নিত্য নতুন পথের কথা ভাবতে হয়েছে। নতুন তাল সৃষ্টি বা প্রবর্তনের মূল কারণ ঐ একই প্রেরণা।

ঐ একই প্রেরণায় তিনি প্রথম যুগে ছন্দবহুল আড়খেমটা তাল তাঁর গানে প্রয়োগ করলেও পরবর্তীকালে তিনি যখন ষষ্ঠী তাল তাঁর গানে প্রয়োগ করলেন, তখন আর তাঁকে আড়খেমটা তাল প্রয়োগ করতে দেখা গেল না। তিনি হয়তো অনুভব করে থাকবেন যে কিছুটা চটুল ও ছন্দবহুল আড়খেমটা তালে গানের কাব্যাংশ ক্ষুণ্ণ হতে পারে।

নাট্যসংগীত

এই যুগেও কবি অনেকগুলি গীতবহুল নাটক রচনা করেছেন, যথা—শারদোৎসব, প্রায়শ্চিত্ত, রাজা, ডাকঘর, অচলায়তন, ফাল্গুনী, অরূপরতন ও নাটকগুলিতে অনেক গান উপস্থাপিত করেছেন। কিন্তু এইসব নাটকে প্রযোজিত গানগুলিকে বাল্মীকি-প্রতিভা, কালমৃগয়া বা পরবর্তীকালে নৃত্যনাট্যগুলিতে উপস্থাপিত গানগুলির মতো ঠিক নাট্যসংগীত বলা বোধ হয় চলে না, কারণ এইসব নাটকে প্রযুক্ত গানগুলিতে সেইরূপ কোনো নাটকীয়তা নেই। অবশ্য এই নাটকে প্রযুক্ত গানগুলি নাটকের বক্তব্যকে পরিস্ফুট করার জন্যে ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু এ গানগুলিতে বিশেষ কোনো নাটকীয়তা না থাকায় ও গানের ভাবের মধ্যে মানুষের মনে প্রবহমান চিরন্তন চিন্তা ও ভাবধারাকে ধরে রাখা হয়েছে বলে ঐ গানগুলিকে নাটক থেকে বিচ্ছিন্ন করে গাওয়া চলে ও তাতে কোনো রসহানি ঘটে না। বস্তুত ঐ সব নাটকের বহু গানই স্বতন্ত্রভাবে একক সংগীত হিসেবে পরিবেশিত হয়ে আসছে। সেই বিচারে এইসব নাটকের গানগুলিকে অনেকটা গীতিনাট্য 'মায়ার খেলা'র গানের সমধর্মী বলা চলে।

এইসব নাটকে উপস্থাপিত গানের মধ্যে সব ধারারই গান, যথা রাগভিত্তিক গান (বসন্ত জাগ্রত দ্বারে), টপ্পা অঙ্গের গান (এরা পরকে আপন করে), বাউলাঙ্গ (আমারে কে নিবি ভাই, বাঁচান বাঁচি মারেন মরি) ও লোকসংগীতের সুরে (গ্রামছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ. বসন্তে কি শুধু) ও বিলাতী সুর প্রয়োগ অনুসারে (হা রে রে রে রে রে আমায় ছেড়ে দেরে) এই সবরকম গানই পাওয়া যাবে। বিভিন্ন সময়ে রচিত নাটকের বিভিন্ন ধারার গান রচনায়ও রবীন্দ্রসংগীতের কথা ও সুরের আদর্শ ও অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। নমুনাস্বরূপ, প্রথমযুগে রচিত 'বিসর্জন' নাটকে উপস্থাপিত বাউলাঙ্গ গান 'আমারে কে নিবি ভাই'-এর সঙ্গে ১৯২৪ সালে রচিত 'গৃহপ্রবেশ' নাটকে উপস্থাপিত বাউলাঙ্গ গান 'আমার মন যখন জাগলি না রে' ও 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে ভৈরবীতে 'আজ তোমারে দেখতে

এলেম' গানের সংগে ১৯৩১ সালে রচিত 'নবীন' নাটকে এই ভৈরবী রাগিণীতেই রচিত 'ঝরা পাতা গো, আমি তোমারি দলে' গানগুলির তুলনা করলেই এটা পরিষ্কার বোঝা যাবে। নাটকে উপস্থাপিত এইসব গানের ভূমিকা সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে শ্রদ্ধেয় স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ তাঁর 'সংগীতে রবীন্দ্র প্রতিভার দান' গ্রন্থে বলেছেন :

"নাটকের প্রয়োজনে বা নাটকের সৌকর্য ও সৌন্দর্য সাধনে নাটকীয় সংগীতের সমাবেশ কর্মে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্বের তুলনা নাই। সময় সময় নাটকীয় সংগীতে সাংকেতিক ইংগিত স্বপ্নলোককেও বাস্তবে রূপায়িত করে আবার বাস্তবের প্রত্যক্ষ রূপায়ণও কখনো কখনো শ্রোতা ও শিল্পীর মনে আঁকে স্বপ্নলোকের ছবি।

নাটকীয় সংগীতে কবির এই আলোছায়ায় দোলা দেবার যে অপরূপ ভংগী নাট্যসংগীতের ও নাট্যজগতের ক্ষেত্রে তা সত্যই অতুলনীয়।"

চুম্বক

এই যুগের সংগীত বিশ্লেষণ করলে অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের সংগে এটাই বিশেষ ভাবে ধরা পড়ে যে এই যুগে রবীন্দ্রনাথ প্রথমযুগের শিক্ষানবিশী ভাব অনেকটা কাটিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে স্বকীয় ভংগতে আত্মপ্রকাশে প্রয়াসী ও তাঁর এই প্রচেষ্টা প্রধানত এইভাবে প্রকাশ পেয়েছে—

১. গান ভাঙার চেয়ে কাব্যের ভাবের সংগে সামঞ্জস্য রেখে গানে ব্যবহৃত রাগের স্বরগত শাস্ত্রীয় রূপকে কিছু কিছু অদলবদল করে ও নানা রাগ-মিশ্রণের মাধ্যমে তিনি রাগাশ্রয়ী মৌলিক সংগীত সৃষ্টি করার প্রয়াসী ও ফলে সুর ও কাব্যের অধিকতর সামঞ্জস্যে তাঁর এই ধারার গানগুলি আগের যুগের সুরধর্মী গান থেকে ধীরে ধীরে কাব্যধর্মী হয়ে উঠেছে। গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য ও গীতালির রাগ-ভিত্তিক অথচ কাব্যমণ্ডিত গানগুলি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

২. প্রথমযুগে হিন্দুস্থানী সংগীতের যে একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল তা কমে এসেছে ও তাঁর সংগীতসৃষ্টিতে ধীরে ধীরে বাংলাদেশে প্রচলিত বিভিন্ন ধারার সংগীত স্থান পেতে শুরু করেছে।

৩. প্রথমযুগে ঋতুসংগীত ছিল না বললেই চলে কিন্তু এই যুগে শারদোৎসব নাটককে কেন্দ্র করে ঋতুসংগীত এক উল্লেখযোগ্য মোড় নিয়েছে।

৪. তাঁর আগের যুগের স্বদেশী সংগীতে ছিল অনেকটা তাঁর পূর্বসূরীদের প্রভাব ও গানগুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রাগ-রাগিণীকে ভিত্তি করে রচিত হয়েছিল। কিন্তু এই যুগে ১৯০৫ সালে বংগভংগ আন্দোলন উপলক্ষে রচিত তাঁর স্বদেশী গানগুলিতে লোকসংগীত, বিশেষ করে বাউল গান আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু তাঁর এই প্রাদেশিক স্বদেশপ্রেমও বেশিদিন থাকেনি। কিছুদিন পরে তিনি তাঁর স্বদেশ প্রেমে বাংলাদেশের গণ্ডি পার হয়ে প্রথমে ভারতীয় ও পরে আন্তর্জাতিক হয়ে গেছেন ও তাঁর স্বদেশী গানগুলি পুনরায় লোকসংগীত ছেড়ে সর্বভারতে

প্রচলিত রাগ-রাগিণীকে ভিত্তি করে রচিত হতে শুরু করল।

৫. প্রথমযুগে গান রচনাকালে রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন যে গানকে যথাসম্ভব শাস্ত্রসম্মত করতে ও প্রচলিত তালে বাঁধতে গিয়ে বাণীর অংগহানি হয়েছে ও উচ্চারণ বিকৃতিও ঘটেছে। তাই তিনি এই যুগে নূতন ছয়টি তাল সৃষ্টি বা পুনঃ প্রবর্তন করে এই অসুবিধা দূর করতে চেয়েছেন।

৬. বড়ো বড়ো কিছু কবিতায় সুর দিয়ে কবি এই যুগে কিছু গান রচনা করেছেন যাদের কাব্য-সংগীত বা প্রবন্ধগীতি বলা যেতে পারে, যদিও এর প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল প্রথমযুগেই 'আমার প্রাণের 'পরে চলে গেল কে' গানটি দিয়েই। এইসব গানের সুরারোপে কিছুটা পরিমাণে বিলাতী গানের প্রভাব বর্তমান। তা ছাড়া যদিও প্রথমযুগে বিলাতী গান ভেঙে কবি কিছু গান রচনা করেছিলেন —কিন্তু এই যুগে সেইভাবে বিলাতী গান না ভেঙে বিলাতী গানের সুরারোপের আদর্শে কিছু স্বাধীন গান রচনা করেছেন। এই বিষয়গুলি তাঁর গানে পাশ্চাত্য সংগীতের প্রভাব সম্বন্ধে পরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার সময় বলা যাবে।

৭. ধর্মসংগীত রচনায় রবীন্দ্রনাথ প্রথমযুগের ধারা থেকে এ যুগে সরে এসেছেন। তাঁর গান আগের যুগের ধর্মসংগীতের গোষ্ঠী প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে তাঁর নিজস্ব অন্তরের আকূতির পরিচয় দিতে শুরু করেছে ও তাঁর গান ধীরে ধীরে ব্রহ্মসংগীত থেকে পূজা পর্যায়ের গানে রূপান্তরিত হয়েছে ও সে গানগুলি সুর ও তালের দিক দিয়ে অনেকটা সহজ ও সরল হয়ে এসেছে।

৮. এই যুগে রবীন্দ্রনাথ অনেক গীতিবহুল নাটক রচনা করেছেন ও তাতে অনেক গান সন্নিবেশিত হয়েছে। তবে সে-সমস্ত নাটকের গানে নাটকীয়তা নেই বলে এগুলিকে নাট্যসংগীত বলার চেয়ে নাটকে উপস্থাপিত গান বলাই অধিকতর সংগত। এই গানগুলিকে নাটক থেকে বিচ্ছিন্ন করেও গাওয়া চলে।

৯. এই যুগেই রবীন্দ্রনাথ আশ্রমে স্থায়িভাবে বসবাস শুরু করেছেন। ফলে তাঁর সংগীতসৃষ্টিতে ধীরে ধীরে আশ্রমজীবন ও শান্তিনিকেতন আশ্রমের প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব পড়তে শুরু করেছে।

এই যুগের উল্লেখযোগ্য ঘটনাপঞ্জী

১ ১৯০১ সালে শান্তিনিকেতনে স্থায়িভাবে বসবাস শুরু ও সেই বৎসর শীতকালে ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন।

২ ১৯০২ সালে পত্নীর মৃত্যু।

৩ ১৯০৫ সালে পিতৃদেবের মৃত্যু।

৪ ১৯০৫ সালে সেপ্টেম্বর মাসে রাখীবন্ধন শোভাযাত্রা।

৫ ১৯০৭ সালের শীতকালে কবির কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথের মৃত্যু।

৬ তৃতীয়বার বিলাত ভ্রমণ।

৭ ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ।
৮ ১৯১৬ সালের মে মাসে জাপান হয়ে আমেরিকা যাত্রা।
৯ ২৩ ডিসেম্বর ১৯১৮ সালে বিশ্বভারতীর ভিত্তি স্থাপন ও ৩ জুলাই বিশ্বভারতীর কার্যারম্ভ।

এই যুগে তাঁর বেশির ভাগ সময়েই কাটে কলকাতা, গিরিডি, শান্তিনিকেতন, শিলাইদহ, লণ্ডন, রামগড় ও দক্ষিণভারতে।

এইসময়কার ঘটনাবলী পর্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে রবীন্দ্রনাথকে এই সময়ে ক'জন বিশেষ প্রিয়জনের মৃত্যুর শোক সহ্য করতে হয়েছিল; বিশেষ করে কনিষ্ঠপুত্র শমীন্দ্রনাথের মৃত্যু তাঁকে খুব গভীরভাবেই বিচলিত করেছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের চরিত্রের এই বৈশিষ্টাই ছিল যে কোনো শোক বা আঘাত তাঁকে তাঁর সৃষ্টিকর্ম থেকে নিবৃত্ত করতে পারত না। এমনকি শোনা যায় কনিষ্ঠপুত্রের মৃত্যুতেও তাঁর প্রবাসীতে 'গোরা' উপন্যাসের মাসিক কোনো কিস্তি বাদ যায়নি। তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে রবীন্দ্রনাথ বহুবার শোক পেয়েছেন কিন্তু কোনো কিছুই তাঁর সৃষ্টিকে ব্যাহত করতে পারেনি। এই বিষয়ে শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবীকে তিনি যা বলেছিলেন তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য :

"তোমাকে কে বলেছে দুঃখ শোক মানুষের জীবন ব্যর্থ করে, দুঃখে জীবন ব্যর্থ হয় তাদের ; যারা অমন করে নিজেকে দুঃখের কাছে অসহায় ভাবে আত্মসমর্পণ করে ও তাতেই গৌরব বোধ করে।...

সংসারের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়, তার পদে পদে কাঁটা। সেই কণ্টকাকীর্ণ পথেই হাসি মুখে আনন্দিত হয়ে চলতে হবে, এইতো মানুষের পরীক্ষা। বেদনাকে বোধনায় পরিণত করতে হবে, অম্লতাকে মাধুর্যে। জীবনে দুঃখ পাবারও একটা গভীর প্রয়োজনীয়তা আছে, সেই দুঃসহ তাপের মধ্যেই পরিচয় ঘটে অন্তরতম নিত্য 'আমি'র সঙ্গে।"

—মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, পৃ ২০০-২০১।

তাই আমরা দেখতে পাই এই যুগে এতগুলি মৃত্যুশোক পাওয়া সত্ত্বেও তাঁর সংগীতসৃষ্টির ধারা অন্যান্য সৃষ্টির সঙ্গে সমভাবে প্রবাহিত হয়ে চলেছে ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা সৃষ্টির প্রেরণা জুগিয়েছে।

এই যুগে তিনি 'অন্তর-বাহির' 'সংগীত' 'সোনার কাঠি' ও 'সংগীতের মুক্তি' এই কয়টি প্রবন্ধের মাধ্যমে সংগীত সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য রেখেছেন। এ ছাড়াও হয়তো টুকরো টুকরো ভাবে এখানে ওখানে সংগীত সম্বন্ধে কিছু বলে থাকবেন। এইসমস্ত লেখার মধ্যে 'সংগীতের মুক্তি' প্রবন্ধটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য, কারণ এতে বাংলা গানে রাগ-রাগিণীর ব্যবহার, বিলিতি গানের সঙ্গে দিশি গানের পার্থক্য, বাউল গানের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে মতামত দিয়েছেন ও সর্বোপরি সংগীতে ব্যবহৃত তাল ও লয় সম্বন্ধে তাঁর মতামত এই প্রবন্ধটিকে এক অসাধারণ গুরুত্ব প্রদান করেছে।

গানের তালিকা

মধ্যযুগ

১৯০১-১৯২০

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম কলি : রাগ/তাল	রচনাকাল/স্থান	মন্তব্য
১	সকল গর্ব দূর করি দিব : আড়ানা/একতাল	১৯০১/জোড়াসাঁকো	
২	তোমার অসীমে প্রাণমন : বেহাগ/কাওয়ালী	” ”	
৩	অল্প লইয়া থাকি : ছায়ানট/একতাল	” ”	
৪	তোমার পতাকা যারে দাও : ভৈরবী/ঠুংরী	” ”	
৫	হে সখা মম হৃদয়ে : ছায়ানট/একতাল	” ”	মূলগান : এ সখি অব কৈসে করু
৬	নিশি না পোহাতে : দাদরা	” ”	
৭	ওরে সাবধানী পথিক : খাম্বাজ/একতাল	” ”	
৮	তরী আমার হঠাৎ ডুবে : টোড়ী/ভৈরবী একতাল	” ”	
৯	অলকে কুসুম না দিয়ো : কালাংড়া/একতাল	” ”	
১০	কেন সারাদিন ধীরে ধীরে : রূপকড়া	” ”	
১১	মোরা সত্যের পরে মন : ভূপনারায়ণ/একতাল	” ”	
১২	মোরে ডাকি লয়ে যাও : রামকেলী/তেওড়া	” ”	
১৩	বল দাও মোরে বল দাও : ভৈরবী/একতাল	” ”	
১৪	আমার বিচার তুমি করো : কেদার/তেওড়া	” ”	
১৫	আমি কি বলে : সিন্ধু/বাঁরোয়া/অর্ধঝাঁপ	” ”	

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম কলি : রাগ/তাল	রচনাকাল/স্থান	মন্তব্য
১৬	ডাকো মোরে আজিএ : পরজ/কাওয়ালী	১৯০১/জোড়াসাঁকো	মূলগান : ক্যা করূ ণমানেরী
১৭	আমি চঞ্চল হে : ভৈরবী/দাদরা	১৯০২ „	
১৮	স্বপন যদি ভাঙিলে : রামকেলী/একতাল	১৯০৩ „	মূলগান : কহেন তুম জাবত
১৯	মনোমোহন গহন যামিনী : আসাবরী/ঝাঁপতাল	„ „	
২০	আছে দুঃখ আছে মৃত্যু : ললিত/বিভাস যোগিয়া/আসাবরী/একতাল	„ „	এই গানটি তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর পর লেখা বলে অনেকে মনে করেন।
২১	দুঃখরাতে হে নাথ : সরফর্দা/ঝাঁপতাল	„ „	মূলগান : রঙ্গরাতি মাতিয়া
২২	এ ভারতে রাখো : সুরট/চৌতাল	„ „	মূলগান এ বঁতিয়াঁ মেরো
২৩	দুয়ারে দাও মোরে : সুরট/মল্লার একাদশী	„ „	
২৪	মন্দিরে মম কে : আড়ানা/একতাল	„ „	মূলগান : সুন্দর লাগি রহে
২৫	বাজাও তুমি কবি : বাহার/সুরফাঁক্তা	„ „	মূলগান . আয়ে ঋতু পতি
২৬	শূন্য হাতে ফিরি হে : কাফি/সুরফাঁক্তা	„ „	মূলগান : রুমঝুম বরখে
২৭	নিবিড় ঘন আঁধারে : সাহানা/নবতাল	„ „	

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম কলি : রাগ/তাল	রচনাকাল/স্থান	মন্তব্য
২৮	আমারে কর জীবন দান : শংকরা/চৌতাল	১৯০৩/জোড়াসাঁকো	
২৯	গভীর রজনী নামিল : পরজ/রূপকড়া	” ”	
৩০	জননীর দ্বারে আজি ঐ হাম্বীর/একতাল/চতুর্মাত্রিক	” ”	
৩১	দাঁড়াও আমার আঁখির আগে : বেহাগ/তেওড়া	১৯০৪/শান্তিনিকেতন	
৩২	আজি যত তারা : লুম খাম্বাজ/কাওয়ালী	” ”	
৩৩	যে কেহ মোরে দিয়েছ : কাফি/তেওড়া	” ”	
৩৪	কী সুর বাজে আমার প্রাণে : পিলু/কাওয়ালী	” মজঃফরপুর	
৩৫	তুমি যে আমারে চাও : ভূপালী/কাওয়ালী	” ”	
৩৬	তুমি এপার ওপার : পিলু/দাদরা	” শান্তিনিকেতন	
৩৭	আমাব নাইবা হলো পারে : বাউলাংগ/দাদরা	” গিরিডি	
৩৮	এবার তোর মরা গাঙে : সারী গানের সুর/কাহারবা	১৯০৫ ”	
৩৯	যদি তোর ডাক শুনে কেউ : বাউলাংগ/দাদরা	” ”	
৪০	আজি বাংলা দেশের হৃদয় হতে : বিভাস/একতাল	” ”	
৪১	মা কি তুই পরের দ্বারে : বাউলাংগ/দাদরা	” ”	
৪২	তোর আপন জনে : বাউলাংগ/দাদরা	” ”	
৪৩	ছিছি চোখের জলে : বাউলাংগ/দাদরা	” ”	
৪৪	যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক : বাউলাংগ/দাদরা	” ”	

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম কলি : রাগ/তাল	রচনাকাল/স্থান	মন্তব্য
৪৫	আপনি অবশ হলি : বাউলাঙ্গ/দাদরা	১৯০৫ গিরিডি	
৪৬	ও জোনাকী কি সুখে : বাউলাঙ্গ/দাদরা	„ „	
৪৭	বাংলার মাটি বাংলার জল : বাউলাঙ্গ/একতাল	„ „	
৪৮	বিধির বাঁধন কাটবে : খাম্বাজ/দাদরা	„ „	
৪৯	আমাদের যাত্রা হলো শুরু : ভৈরবী/একতাল	„ „	
৫০	ওদের বাঁধন যত শক্ত : বাউলাঙ্গ/দাদরা	„ „	গিরিডি থেকে ট্রেনে
৫১	সার্থক জনম আমার : ভৈরবী/একতাল	„ „	
৫২	আমার সোনার বাংলা : বাউলাঙ্গ/দাদরা	„ „	মূলগান : আমি কোথায় পাব তারে। এই গানটি বাংলা দেশের জাতীয় সংগীত।
৫৩	ও আমার দেশের মাটি : বাউলাঙ্গ/দাদরা	„ „	
৫৪	নিশিদিন ভরসা রাখিস : বাউলাঙ্গ/দাদরা	„ „	
৫৫	বুক বেঁধে তুই দাঁড়া : বাউলাঙ্গ/দাদরা	„ „	
৫৬	আমি ভয় করব না ভয় করব না : বাউলাঙ্গ/দাদরা	„ „	
৫৭	আমার গোধূলিলগন : পূরবী/দাদরা	„ শান্তিনিকেতন	
৫৮	দুখের বেশে এসেছ : ইমনকল্যাণ/ঝম্পক	„ „	
৫৯	ভুবনেশ্বর হে : ইমন/একতাল	„ „	

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম কলি : রাগ/তাল	রচনাকাল/স্থান	মন্তব্য
৬০	আমি কেমন করিয়া জানাব : আসাবরী/একতাল	১৯০৫/শিলাইদহ	
৬১	একমনে তোর একতারাতে : মিশ্র বাহার/খং	" "	
৬২	তুমি যত ভার দিয়েছ : কীর্তনাঙ্গ/একতাল	" পদ্মা	
৬৩	আমার মাথা নত করে : ইমনকল্যাণ/তেওড়া	" "	
৬৪	মোরে বারে বারে ফিরালে : নটমল্লার/একতাল	" "	মূলগান : মোরি নয় লগন লাগিরে
৬৫	আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে : মিশ্রকামোদ/একতাল	" "	
৬৬	কত অজানারে জানাইলে : হাম্বীর/রূপকড়া	" "	
৬৭	বিপদে মোরে রক্ষা কর : ইমনকল্যাণ/ঝম্পক	" "	
৬৮	অন্তর মম বিকশিত কর : ভৈরবী/একতাল	১৯০৭/শিলাইদহ	
৬৯	তুমি নব নব রূপে এসো : রামকেলী/কাওয়ালী	" পতিসর	
৭০	বীণা বাজাও হে মম অন্তরে : পূরবী/ধামার	" শিলাইদহ	মূলগান : বীণ বাজায়রে
৭১	চরণধ্বনি শুনি তব : সিন্ধুকাফি/ঝাঁপতাল	" "	মূলগান : মুরলীধ্বনি শুনি
৭২	বিপুল তরঙ্গ রে : ভীমপলশ্রী/তেওড়া	" "	মূলগান : নাচত ত্রিভঙ্গ য়ে
৭৩	প্রচণ্ড গর্জনে আসিল : ভূপালী/সুরফাঁকতাল	" "	মূলগান : প্রচণ্ড গর্জ্জন সজল
৭৪	তিমির দুয়ার খোলো : রামকেলী/কাওয়ালী	১৯০৮ "	

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম কলি : রাগ/তাল	রচনাকাল/স্থান	মন্তব্য
৭৫	মেঘের কোলে রোদ : বিভাস/দাদরা	১৯০৮/শান্তিনিকেতন	
৭৬	আজ ধানের ক্ষেতে : সারী সুর/কাহারবা	" "	
৭৭	আনন্দেরি সাগর : সিন্ধুভৈরবী/তেওড়া	" "	
৭৮	তোমার সোনার থালায় : ললিত/আড়াঠেকা	" "	
৭৯	নবকুন্দধবলদলসুশীতলা : রামকেলী/কাওয়ালী	" "	
৮০	আমরা বেঁধেছি কাশের : মিশ্ররামকেলী/একতাল	" "	
৮১	অমল ধবল পালে : ভৈরবী/একতাল	" "	
৮২	আমার নয়ন ভুলানো এলে : দাদরা	" "	
৮৩	জননী তোমার করুণ চরণ : গুণকেলী/নবপঞ্চতাল	" "	
৮৪	আজি এ আনন্দ সন্ধ্যা : পূরবী/তেওড়া	" "	মূলগান : বহুর বজাও বংশী
৮৫	বাজে বাজে রম্যবীণা : ইমনকল্যাণ/তেওড়া	" "	মূলগান : বাদে বাদে রম্য বীণ
৮৬	আজি নাহি নাহি নিদ্রা : মিশ্র সিন্ধু/কাওয়ালী	" "	
৮৭	কোথা হতে বাজে : সুরট/কাওয়ালী	" "	মূলগান : বাজরহী সখীয়ারে
৮৮	আরো আরো প্রভু : খেমটা	১৯০৯/শান্তিনিকেতন	
৮৯	বাঁচান বাঁচি মারেন মরি : বাউলাংগ/দাদরা	" "	

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম কলি : রাগ/তাল	রচনাকাল/স্থান	মন্তব্য
৯০	ও যে মানে না মানা : ভৈরবী/দাদরা	১৯০৯/শান্তিনিকেতন	
৯১	ওরে আগুন আমার ভাই : বাউলাঙ্গ/দাদরা	" "	
৯২	ওকে ধরিলে তো ধরা : ভৈরবী/একতাল	" "	
৯৩	গ্রামছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ : লোকসংগীতের সুর/কাহারবা	" "	
৯৪	জগত জুড়ে উদার সুরে : ইমনকল্যাণ/তেওড়া	" "	
৯৫	মেঘের পরে মেঘ জমেছে : মিশ্রসিন্ধু/একতাল	" "	
৯৬	কোথায় আলো কোথায় ওরে : মিশ্রদেশ/ঝাঁপতাল	" "	
৯৭	আজি শ্রাবণ ঘন গহন : গৌড়মল্লার/ঝম্পক	" "	
৯৮	আষাঢ় সন্ধ্যা ঘনিয়ে : মিশ্র ভূপালী/একতাল	" শিলাইদহ	
৯৯	আজি ঝড়ের রাতে : সিন্ধু/ঝম্পক	" "	
১০০	জানি জানি কোন আদিকাল : মিশ্রকেদার/কাওয়ালী	" বোলপুর	
১০১	তুমি কেমন করে গান কর : খাম্বাজ/কাহারবা	" "	
১০২	অমন আড়াল দিয়ে : মিশ্রটোড়ী/দাদরা	" "	
১০৩	হেরি অহরহ তোমারি : কানাড়া/একতাল	" "	
১০৪	আর নাইরে বেলা : মিশ্র পূরবী/দাদরা	" "	
১০৫	আজ বারি ঝরে : হাম্বীর/তেওড়া	" "	
১০৬	প্রভু তোমা লাগি আঁখি : মিশ্র বেহাগ/কাওয়ালী	" "	

ক্রমিক সংখ্যা গানের প্রথম কলি : রাগ/তাল	রচনাকাল/স্থান	মন্তব্য
১০৭ এই যে তোমার প্রেম : মিশ্র বিভাস/কাহারবা	১৯০৯/বোলপুর	
১০৮ আবার এরা ঘিরেছে : আশাবরী/ঝম্পক	" "	
১০৯ আমার মিলন লাগি : বাহার-বাগেশ্রী/তেওড়া	" "	
১১০ এসহে সজল ঘন : মল্লার/ঝাঁপতাল	" "	
১১১ নিশার স্বপন টুটল রে : ভৈরবী/দাদরা	" "	
১১২ শরতে আজ কোন অতিথি : কীর্তনাঙ্গ/তেওড়া	" শান্তিনিকেতন	
১১৩ যা হারিয়ে যায় : মিশ্রসিন্ধু/একতাল	" কলিকাতা	
১১৪ গায়ে আমার পুলক লাগে : ঝিঁঝিট/ত্রিতাল	" শিলাইদহ	
১১৫ প্রভু আজি তোমার দক্ষিণ : কীর্তনাঙ্গ/কাওয়ালী	" "	
১১৬ জগতে আনন্দ যজ্ঞে : সরফর্দা/একতাল	" "	
১১৭ আলোয় আলোকময় : ভঁয়রো/তেওড়া	" বোলপুর	
১১৮ ওই আসন তলের : কীর্তনাঙ্গ/কাওয়ালী	" শান্তিনিকেতন	
১১৯ রূপসাগরে ডুব দিয়েছি : বাউলাঙ্গ/কাওয়ালী	" "	
১২০ জাগ জাগরে জাগ সংগীত : দেশ/তেওড়া	" "	মূলগান : প্রথম পরবর দিগারহি
১২১ নয়ান ভাসিল জলে : শ্যাম চতুর্মাত্রিক/একতাল	" "	মূলগান : পাপিহা বোলেরে
১২২ পুষ্প ফুটে কোন কুঞ্জবনে : মিশ্রসিন্ধু/ঝাঁপতাল	" "	

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম কলি : রাগ/তাল	রচনাকাল/স্থান	মন্তব্য
১২৩	হৃদয়ে তোমার দয়া যেন : পরজ বসন্ত/কাওয়ালী	১৯০৯/শান্তিনিকেতন	
১২৪	দাঁড়াও মন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড : ভীমপলশ্রী/চৌতাল	” ”	মূলগান : এরি অব আনন্দ
১২৫	মহারাজ একি সাজে এলে : বেহাগ/ঝাঁপতাল	” ”	মূলগান : মেরে দুন্দ দল সাজে
১২৬	জয় তব বিচিত্র আনন্দ : বৃন্দাবনী সারং/তেওড়া	” ”	মূলগান : জয় প্রবল বেগবতী
১২৭	কার মিলন চাও : শ্রী/তেওড়া	” ”	মূলগান : তনু মিলন দে পরবর
১২৮	নিভৃত প্রাণের দেবতা : পূরবী/একতাল	১৯১০ .	
১২৯	কোন আলোতে প্রাণের : বাউলাঙ্গ/কাহারবা	” ”	মহর্ষিদেবের শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে রচিত। মূলগান আছে মনে হয়।
১৩০	জাগে নাথ জোছনা রাতে : বেহাগ/ধামার	” ”	মূলগান : আজু রঙ্গ খেলত
১৩১	আজি এই গন্ধবিধুর সমীরণে : পরজ-বসন্ত/ত্রিতাল	” বোলপুর	
১৩২	আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে . মিশ্রবাহার/ত্রিতাল	” ”	
১৩৩	তুমি এবার আমায় লহো : বাউলাঙ্গ/দাদরা	” ”	
১৩৪	জীবন যখন শুকায়ে যায় : জয়জয়ন্তী/একতাল	” ”	
১৩৫	এবার নীরব করে দাও হে : কানাড়া/বিলম্বিত ত্রিতাল	” ”	

ক্রমিক সংখ্যা গানের প্রথম কলি : রাগ/তাল	রচনাকাল/স্থান	মন্তব্য
১৩৬ বিশ্ব যখন নিদ্রা মগন : বেহাগ/একতাল	১৯১০/বোলপুর	
১৩৭ সে যে পাশে এসে বসেছিল : খাম্বাজ/তেওড়া	” ”	
১৩৮ তোরা শুনিসনি কি : সিন্ধু বাঁরোয়া/যৎ	” ”	
১৩৯ কবে আমি বাহির হলেম : ইমনকল্যাণ/তেওড়া	” তিনধরিয়া	
১৪০ আমার খেলা যখন ছিল : মিশ্রমল্লার/দাদরা	” ”	
১৪১ চিত্ত আমার হারালো : মল্লার/কাহারবা	” ”	
১৪২• যতবার আলো জ্বালাতে : কামোদ/একতাল	” ”	
১৪৩ বজ্রে তোমার বাজে বাঁশী : কাহারবা	” ”	
১৪৪•দয়া দিয়ে হবে গো মোর : ভৈরবী/একতাল	” কলিকাতা	
১৪৫ ধায় যেন মোর সকল : ঝিঁঝিট/ঝম্পক	” ”	
১৪৬ আমারে যদি জাগালে : ঝম্পক	” ”	
১৪৭ আরো আঘাত সইবে : ঝিঁঝিট/যৎ	” ”	
১৪৮ এই করেছ ভালো নিঠুর : ইমন/একতাল	” ”	
১৪৯ বিশ্বসাথে যোগে : ভৈরবী/কাহারবা	” বোলপুর	
১৫০ যেথায় তোমার লুট : বাউলাংগ/দাদরা	” ”	
১৫১ আবার এসেছে আষাঢ় : মল্লার/দাদরা	” ”	
১৫২ হে মোর দেবতা : ইমনকল্যাণ/একতাল	” ”	

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম কলি : রাগ/তাল	রচনাকাল/স্থান	মন্তব্য
১৫৩	হে মোর চিত্ত পুণ্য : প্রভাতী/দাদরা	১৯১০/বোলপুর	
১৫৪	যেথায় থাকে সবার অধম : ভৈরবী/দাদরা	” ”	
১৫৫	উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী : টোড়ী-ভৈরবী/কাহারবা	” গোরাই	
১৫৬	সীমার মাঝে অসীম : ছায়ানট/একতাল	” ”	
১৫৭	তাই তোমার আনন্দ : মিশ্র কাফী/দাদরা	” ”	
১৫৮	ওরে মাঝি ওরে আমার : শ্রী/একতাল	” বোলপুর	
১৫৯	জীবনে যত পূজা ; ভৈরবী/তেওড়া/রূপকড়া	” ”	
১৬০	একটি নমস্কারে প্রভু : ছায়ানট/একতাল	” ”	
১৬১	জাগো নির্মল নেত্রে : হাম্বীর/চতুর্মাত্রিক একতাল	” ”	
১৬২	প্রভু আমার প্রিয় আমার : কেদার/একতাল	” ”	
১৬৩	রাত্রি এসে যেথায় মেশে : মিশ্রললিত/একতাল	” শান্তিনিকেতন	
১৬৪	আজি নির্ভয় নিদ্রিত : বেহাগ/কাওয়ালী	” শিলাইদহ	
১৬৫	খোলো খোলো দ্বার : ইমন/কাহারবা	” ”	
১৬৬	কোথা বাইরে দূরে : ঝম্পক	” ”	
১৬৭	আজি দখিন দুয়ার : কাহারবা	” ”	
১৬৮	আমরা সবাই রাজা : বাউলাংগ/দাদরা	” ”	
১৬৯	আমার প্রাণের মানুষ : বাউলাংগ/দাদরা	” ”	

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম কলি : রাগ/তাল	রচনাকাল/স্থান	মন্তব্য
১৭০	তোরা যে যা বলিস ভাই : বেহাগ/দাদরা	১৯১০/শিলাইদহ	
১৭১	আজি কমল মুকুল : মিশ্র বাহার/ত্রিতাল	„ „	
১৭২	মম চিত্তে নিতি নৃত্যে : কাশ্মীরী/খেমটা	„ „	
১৭৩	বসন্তে কি শুধু : লোকসংগীতের সুর/তেওড়া	„ „	
১৭৪	বিরহ মধুর হল আজি : বেহাগ/কাওয়ালী	„ „	
১৭৫	যা ছিল কালো ধলো : বাউলাংগ/দাদরা	„ „	
১৭৬	আহা তোমার সঙ্গে প্রাণের : তালমুক্ত গান	„ „	
১৭৭	আমার সকল নিয়ে বসে : দাদরা	„ „	
১৭৮	আমি রূপে তোমায় : ত্রিতাল	„ „	
১৭৯	আমি তোমার প্রেমে : ভৈরবী/দাদরা	„ „	
১৮০	ভোর হল বিভাবরী : কাহারবা	„ „	
১৮১	প্রথম আদি তব শক্তি : সোহিনী/সুরফাক্তা	„ „	মূলগান : প্রথম আদ শিবশক্তি
১৮২	তিমির বিভাবরী : বেহাগ/কাওয়ালী	„ „	মূলগান : ক্যায়সে কাটোঁগি
১৮৩	তুমি ডাক দিয়েছ : কাফি/সিন্ধু, দাদরা	১৯১১ „	
১৮৪	ঘরেতে ভ্রমর এলো : কালাংড়া/দাদরা	„ „	
১৮৫	আজ কেমন করে গাইছে : তালমুক্ত গান	„ „	

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম কলি : রাগ/তাল	রচনাকাল/স্থান	মন্তব্য
১৮৬	হারে রে রে রে রে : একতাল	১৯১১/শিলাইদহ	পাশ্চাত্য সংগীতের প্রভাব
১৮৭	সকল জনম ভরে ও মোর : তালমুক্ত গান	” ”	
১৮৮	উতল ধারা বাদল ঝরে : মিশ্রমল্লার/রূপকড়া	” ”	
১৮৯	আলো আমার আলো : তোড়ী-ভৈরবী/দাদরা	” ”	
১৯০	ওগো শেফালি বনের মনের : দাদরা	” ”	কাব্যগীতি
১৯১	আজ প্রথম ফুলের : কাহারবা	” ”	
১৯২	আমাদের শান্তিনিকেতন : দাদরা	”	
১৯৩	জনগণমন অধিনায়ক : কাহারবা	” ”	ভারতের জাতীয় সংগীত
১৯৪	আমার এই পথ চাওয়াতে : দাদরা	” ”	
১৯৫	কোলাহল তো বারণ হল : মিশ্রবাঁরোয়া/দাদরা	” ”	
১৯৬	এবার ভাসিয়ে দিতে : দাদরা	” ”	
১৯৭	ঝড়ে যায় উড়ে যায় : হাম্বীর/কাহারবা	” ”	
১৯৮	তুমি একটু কেবল বসতে : ভৈরবী/দাদরা	” ”	
১৯৯	কেগো অন্তরতর : ইমনকল্যাণ/একতাল	১৯১২/শান্তিনিকেতন	
২০০	আমারে তুমি অশেষ : ছায়ানট/ঝম্পক	” ”	
২০১	হারমানা হার পরাব : কাফি/দাদরা	” ”	

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম কলি : রাগ/তাল	রচনাকাল/স্থান	মন্তব্য
২০২	পেয়েছি ছুটি বিদায় : মিশ্রললিত/ঝম্পক	১৯১২/শান্তিনিকেতন	
২০৩	আজিকে এই সকালবেলাতে : ভৈরবী/কাহারবা	” ”	
২০৪	প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে : দাদরা	” লোহিতসমুদ্র	পাশ্চাত্য সংগীতের প্রভাব
২০৫	সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি : কাহারবা	” ”	”
২০৬	তোমারি নাম বলব : ত্রিতাল	১৯১৩/লন্ডন	
২০৭	অসীম ধন তো আছে : একতাল	” ”	
২০৮	এ মণিহার আমায় নাহি : ইমন/একতাল	” ”	
২০৯	ভোরের বেলায় কখন : আশাবরী/ত্রিতাল	” ”	
২১০	প্রাণে খুশির তুফান : একতাল	” ”	
২১১	জীবন যখন ছিল ফুলের : দাদরা	” ”	
২১২	বাজাও আমারে বাজাও : তেওড়া	” মধ্যধরণী সাগর	
২১৩	জানিগো দিন যাবে : বাউলাঙ্গ/দাদরা	” লোহিত সাগর	
২১৪	নয় এ মধুর খেলা : ত্রিতাল	” ”	পাশ্চাত্য সংগীতের প্রভাব আছে।
২১৫	যদি প্রেম দিলে না প্রাণে : একতাল	” শান্তিনিকেতন	
২১৬	নিত্য তোমার যে ফুল ফোটে : ইমন-ভূপালী/একতাল	” ”	
২১৭	লুকিয়ে আস আঁধার রাতে : কাহারবা	” ”	

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম কলি : রাগ/তাল	রচনাকাল/স্থান	মন্তব্য
২১৮	আমার সকল কাঁটা ধন্য : কাহারবা	১৯১৩/শান্তিনিকেতন	
২১৯	প্রভু তোমার বীণা : তেওড়া		
২২০	তোমায় আমায় মিলন : একতাল	" "	
২২১	বসন্তে আজ ধরার চিত্ত : পিলু/একতাল	১৯১৪ "	
২২২	যদি জানতেম আমার : কাহারবা	" শিলাইদহ	
২২৩	রাজপুরীতে বাজায় বাঁশী : ত্রিতাল	" "	
২২৪	আমার ভাঙা পথের : বেহাগ/দাদরা	" কুষ্টিয়ার মুখে পাল্কি পথে	
২২৫	আমার ব্যথা যখন : একতাল	" কলিকাতা	
২২৬	কার হাতে এই মালা : কাহারবা	" শান্তিনিকেতন	
২২৭	এত আলো জ্বালিয়েছ : ভৈরবী/ঠুংরী	" "	
২২৮	যে রাতে মোর দুয়ারগুলি : বাগেশ্রী/দাদরা	" "	
২২৯	শ্রাবণের ধারার মতো : বেহাগ/দাদরা	" "	
২৩০	দাঁড়িয়ে আছ তুমি : ইমন/ত্রিতাল	" "	
২৩১	ওদের কথায় ধাঁধা লাগে : তেওড়া	" "	
২৩২	হাওয়া লাগে গানের : তেওড়া	" "	
২৩৩	আমারে দিই তোমার হাতে : ভৈরবী/তেওড়া	" "	
২৩৪	আরো চাই যে আরো : কাহারবা	" "	

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম কলি : রাগ/তাল	রচনাকাল/স্থান	মন্তব্য
২৩৫	তুমি যে চেয়ে আছ : দাদরা	১৯১৪/শান্তিনিকেতন	
২৩৬	তোমার পূজার ছলে : দাদরা	" "	
২৩৭	আপনাকে এই জানা : দাদরা	" "	
২৩৮	আজ জ্যোৎস্নারাতে সবাই : বেহাগ/তেওড়া	" "	
২৩৯	ওদের সাথে মেলাও : কাহারবা	" "	
২৪০	তুমি যে সুরের আগুন : দাদরা	" "	
২৪১	আমায় বাঁধবে যদি : কাহারবা	" "	
২৪২	কেন চোখের জলে : পিলু-কাফি/দাদরা	" "	
২৪৩	আমার হিয়ার মাঝে : কীর্তনাঙ্গ/একতাল	" কলিকাতার পথে রেলগাড়িতে	
২৪৪	প্রাণে গান নাই মিছে : দাদরা	" কলিকাতা	
২৪৫	কেন তোমরা আমায় : হাম্বীর/কাহারবা	" "	
২৪৬	মোর প্রভাতের এই : দাদরা	" শান্তিনিকেতন	
২৪৭	তোমার আনন্দ ঐ : দাদরা		
২৪৮	তার অন্ত নাই গো : কীর্তনাঙ্গ/একতাল	" "	
২৪৯	আমার যে সব দিতে : একতাল	" "	
২৫০	এই লভিনু সঙ্গ তব : ঝম্পক	" রামগড় হিমালয়	

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম কলি : রাগ/তাল	রচনাকাল/স্থান	মন্তব্য
২৫১	চরণ ধরিতে দিয়ো গো : ভৈরবী/অর্ধ ঝাঁপ	১৯১৪/রামগড় হিমালয়	
২৫২	এরে ভিখারি সাজায়ে : দাদরা	” ”	
২৫৩	সন্ধ্যা হলো গো : পূরবী/একতাল	” ”	
২৫৪	আকাশে দুই হাতে : দাদরা	” ”	
২৫৫	এই তো তোমার আলোক ধেনু : ঝম্পক	” ”	
২৫৬	মোর সন্ধ্যায় তুমি সুন্দর : ইমনকল্যাণ/একতাল	” কলিকাতা	
২৫৭	দুঃখের বরষায় চক্ষের জল : কাহারবা	” শান্তিনিকেতন	
২৫৮	বাধা দিলে বাধবে লড়াই : দাদরা	” কলিকাতা	
২৫৯	আমি হৃদয়েতে পথ কেটেছি : পিলু/দাদরা	” ”	
২৬০	আলো যে যায়রে দেখা : কাহারবা	” ”	
২৬১	ও নিঠুর আরো কি বাণ : কাহারবা	” শান্তিনিকেতন	
২৬২	সুখে আমায় রাখবে কেন : বেহাগ/দাদরা	” ”	
২৬৩	ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর : দাদরা	” সুরুল	
২৬৪	আঘাত করে নিলে জিনে : কাহারবা	” ”	
২৬৫	আমি আর সইতে পারিনে : দাদরা	” ”	
২৬৬	পথ চেয়ে যে কেটে গেল : ত্রিতাল	” ”	
২৬৭	আবার শ্রাবণ হয়ে এলে : ত্রিতাল	” ”	

ক্রমিক সংখ্যা গানের প্রথম কলি : রাগ/তাল	রচনাকাল/স্থান	মন্তব্য
২৬৮ আমার সকল রসের ধারা : ইমন/ত্রিতাল	১৯১৪/সুরুল	চার্চ-সংগীতের প্রভাব
২৬৯ এই শরৎ আলোর কমল বনে : কালাংড়া/রূপকড়া	" "	
২৭০ তোমার মোহন রূপে : কাহারবা	" "	
২৭১ যখন তুমি বাঁধছিলে তার : তেওড়া	" "	
২৭২ আগুনের পরশমণি : দাদরা	" "	
২৭৩ হৃদয় আমার প্রকাশ হল : ছয় মাত্রার তাল, ৪/২ ছন্দ	" "	
২৭৪ পথ দিয়ে কে যায় গো : তেওড়া	" "	
২৭৫ এই যে কালো মাটির বাসা : দাদরা	" "	
২৭৬ তোমার খোলা হাওয়া : লোকসংগীতের সুর/কাহারবা	" শান্তিনিকেতন	
২৭৭ শুধু তোমার বাণী নয়গো : একতাল দীর্ঘমাত্রা/ঝাঁপতাল	" "	
২৭৮ শরৎ তোমার অরুণ : দাদরা	" সুরুল	
২৭৯ আমার মন যখন : বাউলাঙ্গ/দাদরা	" "	
২৮০ এবার আমায় ডাকলে : ইমন/দাদরা	" "	
২৮১ যেতে যেতে একলা পথে : ঝম্পক	"	
২৮২ মালা হতে খসে পড়া : দাদরা	" "	
২৮৩ যেতে যেতে চায় না যেতে : একতাল	" শান্তিনিকেতন	
২৮৪ প্রাণ চায় চক্ষু না চায় : ত্রিতাল	" "	পাশ্চাত্য সংগীতের প্রভাব।

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম কলি : রাগ/তাল	রচনাকাল/স্থান	মন্তব্য
২৮৫	দুঃখ যদি না পাবে তো : কাহারবা	১৯১৪/শান্তিনিকেতন	
২৮৬	নারে নারে হবে না তোর : কাহারবা	” ”	
২৮৭	তোমার ঐই মাধুরী ছাপিয়ে : বেহাগ/একতাল	” সুরুল	
২৮৮	এই কথাটা ধরে রাখিস : দাদরা	” ”	
২৮৯	নাগো এই যে ধুলা : দাদরা	” ”	
২৯০	লক্ষ্মী যখন আসবে তখন : ২+৪ ছন্দ	” ”	
২৯১	মোর হৃদয়ের গোপন বিজন : বেহাগ/দাদরা	” ”	
২৯২	সহজ হবি সহজ হবি : বেহাগ/দাদরা	” ”	
২৯৩	ওরে ভীরু তোমার হাতে : দাদরা	” ”	
২৯৪	অগ্নিবীণা বাজাও : তেওড়া	” ”	
২৯৫	তোমার দুয়ার খোলার : দাদরা	” ”	
২৯৬	ক্লান্তি আমার ক্ষমা কর : ইমন/দাদরা	” ”	
২৯৭	আমার আর হবে না দেরী : দাদরা	” ”	
২৯৮	মেঘ বলেছে যাব যাব : বেহাগ/খেমটা	” ”	
২৯৯	আপন হতে বাহির হয়ে : দাদরা	” ”	
৩০০	কূল থেকে মোর গানের তরী : দাদরা	” ”	
৩০১	বিশ্বজোড়া ফাঁদ পেতেছ : ভৈরবী/দাদরা	” ”	

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম কলি : রাগ/তাল	রচনাকাল/স্থান	মন্তব্য
৩০২	সারা জীবন দিল আলো : একতাল	১৯১৪/সুরুল	
৩০৩	আবার যদি ইচ্ছা কর : ভৈরব/কাহারবা	" বুদ্ধগয়া	
৩০৪	অচেনাকে ভয় কী আমার : দাদরা	" "	
৩০৫	এ দিন আজি কোন ঘরে গো : দাদরা	" "	
৩০৬	পান্থ তুমি পান্থজনের : দাদরা	" বেলা স্টেশন	
৩০৭	সুখের মাঝে তোমায় দেখেছি : দাদরা	" পালকি পথে	
৩০৮	ওগো পথের সাথী : ভৈরবী/ঝাঁপতাল	" রেলপথে বেলা হইতে গয়ায়	
৩০৯	ভেঙেছ দুয়ার এসেছ : ভৈরবী/দাদরা	" এলাহাবাদ	
৩১০	তুমি কি কেবলই ছবি : কাহারবা	" "	
৩১১	বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা : খাম্বাজ/তেওড়া	" শান্তিনিকেতন	
৩১২	মন জাগো মঙ্গলালোকে : ভৈরব/ত্রিতাল	" "	মূলগান : জাগো মোহন প্যারে
৩১৩	পোহালো পোহালো বিভাবরী : কাহারবা	" "	
৩১৪	ওগো দখিন হাওয়া : কাহারবা	১৯১৫/সুরুল	
৩১৫	ছাড়গো তোরা ছাড়গো : ঝাঁপতাল	" "	
৩১৬	আকাশ আমার ভরল : দাদরা	" "	
৩১৭	ওরে আয়রে তবে মাতরে : কাহারবা	" "	

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম কলি : রাগ/তাল	রচনাকাল/স্থান	মন্তব্য
৩১৮	এতদিন যে বসেছিলেম : ভৈরবী/দাদরা	১৯১৫/সুরুল	
৩১৯	তোমায় নতুন করে পাব : কাহারবা	" "	
৩২০	চোখের আলোয় দেখেছিলেম : দাদরা	" "	
৩২১	ওগো নদী আপন বেগে : একতাল	" রেলপথে	
৩২২	ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে : ত্রিতাল	" শান্তিনিকেতন	মূলগান : এরিমা সব বন অমুয়া
৩২৩	আমাদের পাকবে না চুল : লোকসংগীতের সুর/দাদরা	" "	
৩২৪	আমাদের ভয় কাহারে : লোকসংগীতের সুর/দাদরা	" "	হাস্যরসের গান
৩২৫	ভালোমানুষ নইরে মোরা . লোকসংগীতের সুর/দাদরা	" "	
৩২৬	ধীরে বন্ধু ধীরে : অখণ্ড ছয় মাত্রার তাল	" "	
৩২৭	তুই ফেলে এসেছিস কারে : ভৈরবী/দাদরা	" "	
৩২৮	হবে জয় হবে জয় : ঝাঁপতাল	" "	
৩২৯	আমার একটি কথা : ভৈরবী/দাদরা	" "	
৩৩০	বসন্তে ফুল গাঁথল . হাম্বীর/দাদরা	" "	
৩৩১	কোন খ্যাপা শ্রাবণ : ছায়ানট/দাদরা	" "	
৩৩২	আমার নিশীথ রাতের : বাগেশ্রী/দাদরা/কাহারবা	" "	
৩৩৩	কাল রাতের বেলা গান : ভৈরবী/দাদরা	" "	

ক্রমিক সংখ্যা গানের প্রথম কলি : রাগ/তাল	রচনাকাল/স্থান	মন্তব্য
৩৩৪ আজ আলোকের এই : দাদরা	১৯১৫/শান্তিনিকেতন	
৩৩৫ নিশিদিন মোর পরানে : গান্ধারী তোড়ী/ত্রিতাল	” ”	
৩৩৬ রহি রহি আনন্দ তরঙ্গ : ত্রিতাল	” ”	মূলগান : মুরলিয়া ইহ ন বজাও শ্যাম
৩৩৭ তুমি কোন পথে যে এলে : দাদরা	” ”	
৩৩৮ আমি পথ ভোলা এক : দাদরা	” ”	
৩৩৯ যখন পড়বে না মোর পায়ের : লোকসংগীতের সুর/দাদরা	” ”	
৩৪০ এইতো ভালো লেগেছিল : কাহারবা	” ”	কীর্তন ও বাউলের মিশ্রিত রূপ
৩৪১ তরীতে পা দিইনি : দাদরা	১৯১৬/শান্তিনিকেতন	
৩৪২ তোমার হল শুরু, আমার : কাহারবা	” ”	পাশ্চাত্য সংগীতের প্রভাব
৩৪৩ গানের সুরের আসনখানি : কাহারবা	” ”	
৩৪৪ আমারে বাঁধবি তোরা : দাদরা	” ”	
৩৪৫ ওরে আমার হৃদয় আমার : দাদরা	” ”	
৩৪৬ এমনি করে যায় যদি দিন : তেওড়া	” ”	
৩৪৭ ভুবন জোড়া আসনখানি : তেওড়া	” ”	তোসামারু, চীন সমুদ্র
৩৪৮ দেশ দেশ নন্দিত করি : হাম্বীর/একতাল	১৯১৭/শান্তিনিকেতন	
৩৪৯ ব্যাকুল বকুলের ফুলে : নবতাল	” ”	

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম কলি : রাগ/তাল	রচনাকাল/স্থান	মন্তব্য
৩৫০	দুয়ার মোর পথ পাশে : নবতাল	১৯১৭/শান্তিনিকেতন	
৩৫১	কাঁপিছে দেহলতা থরথর : একাদশী	" "	
৩৫২	যে কাঁদনে হিয়া কাঁদিছে : নবতাল	" "	
৩৫৩	একদা তুমি প্রিয়ে : অর্ধঝাঁপ	" "	
৩৫৪	মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন : তেওড়া	১৯১৭-১৮, কলিকাতা	
৩৫৫	আমি যখন তার দুয়ারে : কাহারবা	" "	
৩৫৬	ভেঙে মোর ঘরের চাবি : লোকসংগীতের সুর/দাদরা	১৯১৮	
৩৫৭	ও দেখা দিয়ে যে চলে : ৫/৫ ছন্দ	" "	
৩৫৮	আজি বিজন ঘরে : বেহাগ/একতাল	" সুরুল	
৩৫৯	ওহে সুন্দর মরি মরি : আড়ানা/বাহার/কাহারবা	" শান্তিনিকেতন	
৩৬০	কান্নাহাসির দোল দোলানো : দাদরা	" "	
৩৬১	সে কোন বনের হরিণ : দাদরা	" "	দিনেন্দ্রনাথের পোষা হরিণ সাঁওতালেরা মেরে ফেলে—সেই উপলক্ষে রচিত
৩৬২	কেন রে এই দুয়ারটুকু : ভৈরব/একতাল	" "	কবির বড় মেয়ের মৃত্যু উপলক্ষে রচিত
৩৬৩	অশ্রুনদীর সুদূর : পূরবী/একতাল		
৩৬৪	জাগরণে যায় বিভাবরী বেহাগড়া/কাহারবা		

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম কলি : রাগ/তাল	রচনাকাল/স্থান	মন্তব্য
৩৬৫	কোন সুদূর হতে আমার : মিশ্রবারোয়া/দাদরা	১৯১৮/শান্তিনিকেতন	
৩৬৬	আমার সকল দুখের : ভীমপলশ্রী/কাহারবা		
৩৬৭	তুমি একলা ঘরে বসে : ত্রিতাল		
৩৬৮	পাত্রখানা যায় যদি : দাদরা		
৩৬৯	ছিল যে পরানের : একতাল		
৩৭০	মাটীর প্রদীপখানি : ত্রিতাল		
৩৭১	আকাশ জুড়ে শুনিনু : বেহাগ/কাহারবা	১৯১৮-১৯, শান্তিনিকেতন	
৩৭২	দিনগুলি মোর সোনার : দাদরা		
৩৭৩	জীবনমরণের সীমানা : বেহাগ/রূপকড়া		
৩৭৪	পাখি আমার নীড়ে : ভৈরবী/দাদরা		
৩৭৫	আমি তারেই খুঁজে : দাদরা		
৩৭৬	ওই বুঝি কালবৈশাখী : কাহারবা		
৩৭৭	আমার জীর্ণ পাতা : তেওড়া		
৩৭৮	মোর বীণা ওঠে কোন সুরে : ভৈরবী/ত্রিতাল		
৩৭৯	আমার বেলা যে যায় : খাম্বাজ/দাদরা		
৩৮০	আমি জ্বালব না মোর : কাফি/দাদরা	১৯১৯/শান্তিনিকেতন	
৩৮১	আজ সবার রঙে রঙ : দাদরা		

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম কলি : রাগ/তাল	রচনাকাল/স্থান	মন্তব্য
৩৮২	আমার দিন ফুরালো : দাদরা	১৯১৯/শান্তিনিকেতন	
৩৮৩	এবার রাঙিয়ে গেল : দাদরা		
৩৮৪	আমার অভিমানের বদলে : দাদরা		
৩৮৫	বাহিরে ভুল হানবে যখন : পিলু/দাদরা	১৯১৯-২০, শান্তিনিকেতন	
৩৮৬	অরূপ বীণা রূপের আড়ালে : ভৈরব/কাহারবা		
৩৮৭	বসন্ত তোর শেষ করে দে : কাহারবা		
৩৮৮	চোখ যে ওদের ছুটে : দাদরা		
৩৮৯	এখনো গেলনা আঁধার : ত্রিতাল		
৩৯০	মাধবী হঠাৎ কোথা হতে : দাদরা		

রবীন্দ্রসংগীত সৃষ্টির তৃতীয় যুগ

১৯২১-১৯৪১

এবার আমরা পর্যালোচনা করব রবীন্দ্রসংগীত সৃষ্টির তৃতীয় বা শেষ যুগের। এই যুগকে আমরা প্রকৃত রবীন্দ্রসংগীত সৃষ্টির যুগ বলতে পারি যেখানে রবীন্দ্রসংগীত অন্যান্য সব সংগীতের প্রভাব মুক্ত হয়ে নিজ বৈশিষ্ট্যের দাবীতে আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। এই যুগকে স্বচ্ছন্দে প্রকৃত রবীন্দ্রসংগীতের মৌলিক সৃষ্টির যুগ বলা যেতে পারে।

এইসময়কার রচিত কবির গানের একটি তালিকা প্রণয়ন করা হ'ল ও এতে যে-সমস্ত গানে কবির সৃষ্টির বিশেষ বৈশিষ্ট্য, বিশেষ করে এই যুগের রচনার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই যুগের গানের তালিকা প্রণয়ন করতে গিয়ে আমাকে কতকগুলি বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। প্রথমত, অনেকসময় দেখা যায় যে একই গান বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নাটকে ব্যবহৃত হয়েছে ও তার ফলে অনেক গানের প্রথম রচনাকাল নির্ণয় করা দুরূহ হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় অসুবিধা হ'ল, গানগুলির রাগ নির্ণয়ে। সকলেই জানেন যে প্রথম যুগে রচিত রবীন্দ্রসংগীতে রাগ ও তালের উল্লেখ থাকলেও পরবর্তী যুগের সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ তা আর রাখতে চাননি। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইন্দিরাদেবীকে তিনি লিখেছিলেন: "গানের কাগজে রাগ-রাগিণীর নির্দেশ না থাকাই ভালো। নামের মধ্যে তর্কের হেতু থাকে, রূপের মধ্যে না। কোন রাগিণী গাওয়া হচ্ছে বলবার কোনো দরকার নেই। কী গাওয়া হচ্ছে সেইটেই মুখ্য কথা, কেননা তার সত্যতা তার নিজের মধ্যেই চরম। নামের সত্যতা দশের মুখে। সেই দশের মধ্যে মিল না থাকতে পারে। কলিযুগে শুনেছি নামেই মুক্তি কিন্তু গান চিরকালই সত্য যুগে।" —১৩ই জানুয়ারী, ১৯৩৫।

—সংগীত চিন্তা, পৃ. ২৪৫।

এরপর তিনি আরো বলেছিলেন, "আমার আধুনিক গানে রাগ তালের উল্লেখ না থাকাতে আক্ষেপ করেছিস। সাবধানের বিনাশ নাই। ওস্তাদরা জানেন আমার গানে রূপের দোষ, তারপর যদি নামও ভুল হয় তা হলে দাঁড়াব কোথায়…"
-জুন, ১৯৩৬।

শেষযুগের গানগুলির তাল যদিও বা গান শুনে বা স্বরলিপি দেখে নির্ণয় করা সম্ভব, কিন্তু তাদের রাগ নির্ণয় করা এক দুরূহ ব্যাপার। কারণ এই যুগের গান অধিকতর কাব্যধর্মী হয়ে উঠেছে ও এখানে রাগ-রাগিণী ও গানের কাব্যাংশ এমনভাবে একাত্ম হয়ে মিশে আছে যে তার মধ্য থেকে বিশেষ কোনো রাগ-রাগিণীকে খুঁজে নেওয়া এক দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

তাছাড়া অধিকাংশ গানই পুরোপুরি কোনো একটি রাগের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়নি—গানের কথা ও ভাবের সংগে সামঞ্জস্য রেখে তাতে নানা রাগের স্বররূপ এসে মিশে গেছে। সুতরাং সব ক্ষেত্রে গানের রাগ নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি বা তার চেষ্টাও করা হয়নি।

তৃতীয়ত, এই যুগের গানগুলিকে পর্যায় অনুসারে ভাগ করাও এক কষ্টসাধ্য ব্যাপার—কারণ একই গান হয়তো একই সংগে পূজা, প্রেম, ঋতু বা রাগ-সংগীতের পর্যায়ে পড়ে।

কাব্যধর্মী বিশিষ্ট রচনা ছাড়াও এই যুগে কবির বিশেষ সৃষ্টি হল নৃত্য নাট্যগুলি। কথা, সুর ও ছন্দের সমন্বয়ে এগুলি হল এক অনবদ্য সৃষ্টি।

এই যুগের বেশীর ভাগ গান রচিত হয়েছে শান্তিনিকেতন আশ্রমের নানা প্রয়োজন মেটাবার জন্যে ; তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল নানা নাটকে প্রযুক্ত গান, তাদের মধ্যে আছে নৃত্যনাট্য ও ঋতু অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত গানগুলি। এছাড়া পূরবী, বীথিকা, মহুয়া ইত্যাদি স্বতন্ত্র কাব্যভুক্ত কিছু গানও আছে।

এইবার আমরা এই যুগের সংগীত-সৃষ্টিকে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করব।

১। ভাঙা ও রাগাশ্রয়ী গান :

এই যুগে ভাঙা গানের সংখ্যা খুবই কম, কারণ এই সময়ে অন্যদের আদর্শে সংগীতরচনার চেয়ে রবীন্দ্রনাথ মৌলিক সংগীত সৃষ্টিতে অধিকতর আগ্রহী। ভাঙা গানের মধ্যে এই যুগে হিন্দুস্থানী গান ভাঙা ৫টি গান ও কর্ণাটকী সংগীত ভেঙে রচিত কয়েকটি গানের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু এই যুগের ভাঙা গানগুলিকে পর্যালোচনা করলে আগের যুগের ভাঙা গান গুলির সংগে এদের প্রকৃতি ও মেজাজের বিভিন্নতা সহজেই নজরে পড়বে। উদাহরণস্বরূপ আমি মিঞামল্লার রাগে রচিত 'বোলোরে পপৈয়ারা' গানটির উপর ভিত্তি করে রচিত 'কোথা যে উধাও হল' গানটির কথা উল্লেখ করতে চাই। পণ্ডিত ভাতখণ্ডের ৪নং ক্রমিক পুস্তকমালিকা গ্রন্থে মূল গানটির স্বরলিপি রয়েছে—কিন্তু মূল গানটির সংগে ভাঙা গানটির যদি তুলনা করা যায় তবে দেখা যাবে স্বরগত ভাবে, মেজাজে, গায়কী ও লয়ের দিক দিয়ে দুটি গানের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। মূল গানটি দ্রুত ত্রিতালে নিবদ্ধ, ভাঙা গানটি যদিও আড়াঠেকাতে বাঁধা হয়েছে, কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এই গানটি মুক্ত ছন্দে গাওয়ার নিয়ম। এর গতিও অপেক্ষাকৃত মন্থর। এর মধ্যে যে তানের কাজ রয়েছে তা খেয়ালের তান নয়, বাংলা টপ্পা অংগের। 'ঘন ঘন গুরু গুরু গরজিছে'—এই অংশের সুরারোপে যেন গদ্যকবিতা ও কথকতার আমেজ আসে। 'ভরাবাদরে' অংশে কোমল ধা ব্যবহৃত হয়েছে যা মিঞামল্লার রাগে ব্যবহার হয় না, মনে হয় যেন এখানে মিঞামল্লার স্বররূপের মধ্যে কানাড়া বা আড়ানা অংগের স্বররূপ অনুপ্রবেশ করেছে। রবীন্দ্রসংগীতের বৈশিষ্ট্য, কথা ও সুরের সামঞ্জস্য এই গানেও সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান ও তা 'উধাও' অংশের সুর পর্যালোচনা

করলেই বোঝা যাবে। 'উধাও' কথার মধ্যে সুরও যেন এই স্বরবিন্যাসে উধাও হয়ে গেছে :

	২					৩		
পা	পা	র্সা	ſ	I		I	I	
উ	ধা	০	০	০		০	ও	

আমরা জানি যে মিঞামল্লার রাগের দুটি নিষাদের পর পর ব্যবহারের একটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যাকে মিঞা অংগ বলা হয়ে থাকে। এই মিঞা অংগের স্বরবিন্যাস 'ঝরো ঝরো নামে' এই অংশে খুঁজলেই পাওয়া যাবে :

৩					'			
I	I	ণধা	ণধা	ণধা	ণধা	না	র্সা	র্সা
	০	ঝ০	রো০	ঝ০	রো০	না	০	মে

বস্তুত এই গানটি এমন অভিনব ও মৌলিক সৃষ্টি যে, এই গানটিকে কেউ কেউ রবিমল্লার বলে অভিহিত করে থাকেন।

অন্যান্য ৪টি ভাঙা গান, যথা 'বন্ধু রহো রহো সাথে', 'অশ্রুভরা বেদনা' 'এসো শরতের অমল মহিমা' ও 'কার বাঁশী নিশিভোরে' গানগুলি সম্বন্ধেও এই কথাই সমভাবে প্রযোজ্য। এই সমস্ত গানে মূলগানের রূপান্তর বা নবজন্ম ঘটেছে। আগের যুগের ভাঙা গানগুলিতে সাহিত্যে না হোক, সুরের দিক দিয়ে মূল বা গানের যে ছায়া বা প্রভাব ছিল, এ যুগের ভাঙা গানে তাও অনেকাংশে অন্তর্হিত। তাছাড়া এটাও লক্ষ্য করবার বিষয় যে, এই যুগে তিনি ধ্রুপদাংগ গান না ভেঙে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মধ্যলয়ের খেয়ালাংগ গানকে ভেঙে গান তৈরী করেছেন। এটাও তাঁর ভাঙা গান সম্বন্ধে মনোভাবের একটা পরিবর্তন সূচিত করে। কিন্তু এই যুগে দক্ষিণী গান ভেঙে তিনি যে ক'টি গান রচনা করেছিলেন তাদের সংগে হিন্দুস্থানী ভাঙা গানের কিছুটা পার্থক্য আছে বা পার্থক্য রাখতে রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন বলে মনে হয় এবং এরূপ অনুমানের কারণ কী তা বলতে চেষ্টা করছি।

যে-সমস্ত হিন্দুস্থানী গান ভেঙে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গান রচনা করেছিলেন, তাদের এই ভাবেই সৃষ্টি করেছিলেন যাতে তাদের মধ্যে মূলগানের সুরের বা কোথাও বাণীর প্রভাব থাকলেও তাদের গায়কীতে হিন্দুস্থানী গানের ঢং চলে না আসে ও যেন এই গানগুলির মধ্যে পুরোপুরি বাঙালীয়ানার ছাপ থাকে। আমরা এমন কোনো নজীর পাই না, যেখানে রবীন্দ্রনাথ তার রাগভিত্তিক বাংলা

গান ও তার মূলগানগুলি একই ওস্তাদকে দিয়ে গাওয়াতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এই দক্ষিণী ভাঙা গানগুলির বেলায় যাঁর গান শুনে এই গানগুলি ভেঙেছিলেন অর্থাৎ শ্রীমতী সাবিত্রীদেবী কৃষ্ণাণ, তাঁকে দিয়েই ভাঙা গানগুলিও গাইয়েছিলেন ও তাঁর জীবদ্দশায় অন্য কাউকে দিয়ে এই গানগুলি গাওয়াবার উৎসাহ বোধ করেননি। এক্ষেত্রে এটা মনে করা খুবই স্বাভাবিক যে, ভাঙা গানগুলিতেও রবীন্দ্রনাথ মূল দক্ষিণী গানের কিছুটা ঢং বা আমেজ রাখতে চেয়েছিলেন। সেইজন্যেই বোধ হয় এই ভাঙা গানগুলি মূলগানের গায়িকা শ্রীমতী সাবিত্রীদেবী কৃষ্ণাণকে দিয়েই গাওয়াতে চেয়েছিলেন। ৩নং স্বরবিতানে শ্রীমতী সাবিত্রী দেবীর মুখ থেকে শুনে তার গায়কী সমেত 'নীলাঞ্জনছায়া' গানটির স্বরলিপি শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার করেছেন। সে গানটি পর্যালোচনা করলেই দেখা যাবে যে এই গানটিতে দক্ষিণী ঢং-এর গায়কী ও স্বরবিন্যাস প্রযুক্ত হয়েছে ও যতদূর জানা যায় এই ঢং-এ সাবিত্রীদেবী রবীন্দ্রনাথের আমলে এই গানটি ও অন্যান্য দক্ষিণী ভাঙা গানগুলি, বিশেষ করে 'বেদনা কি ভাষায় রে' গানটি পরিবেশন করতেন।

এখানে শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার কৃত 'নীলাঞ্জন ছায়া' গানটির অংশবিশেষের স্বরলিপি নীচে দেওয়া হ'ল :

II সা -রা জ্ঞরঃ -মজ্ঞরজ্ঞঃ | -রজ্ঞা রজ্ঞঋা ঋসা সঋ
নী ০ লা০ ০০০০ | ০ ০ন্ জ০ ন০

I সা -া ণসণঃ -াঃ |
ছা ০ ০০০ ০ |

I -দণা -দা ণা -দণসা I সা -া -া -া | -া -া -া -া I
০ ০ ০ ০০০ য়া ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০

I সা-দা-পদপা-ঃমঃ | জ্ঞরা -মজ্ঞরজ্ঞা -রজ্ঞা -রজ্ঞঋা | ঋসা সঋা সা -া
নী ০ ০০০ ০০ | লা০ ০০০০ ০ ০ণ | জ০ ন০ ছা০

I -ণসণঃ -াঃ -দণা -দা | -ণা -দণসা সা -া | -া -া -া -া I
০০০ ০ ০ ০ | ০ ০০০ য়া ০ | ০ ০ ০ ০

I ণ্‌সজ্ঞমা -পদাঃ পদপঃ -ঃমঃ | জ্ঞরমজ্ঞা -রজ্ঞা জ্ঞা -রজ্ঞঋা I

নী০০০ ০০ ০০ ০০ | লা০০০ ০০ ০ ০ ন্‌

I ঋসা সঋা সা -া | -ণ্‌সণ্‌ঃ -াঃ -দ্‌ণ্‌া -দ্‌া

জ০ ন০ ছা ০ | ০০০ ০ ০ ০

I -ণ্‌া দ্‌ণ্‌সাণ্‌ সা -া

০ ০০০ য়া ০

শেষযুগে রাগ-রাগিণীর উপর ভিত্তি করে রচিত তাঁর গানে আর একটি বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়—সেটি হ'ল রাগ-রাগিণীর সঙ্গে লৌকিক সুরের মিশ্রণ। এর ফলে এইসব গান সুরের দিক দিয়ে সমৃদ্ধতর হয়ে উঠেছে ও গানগুলিতেও একটা বৈচিত্র্যের ভাব এসেছে। উদাহরণস্বরূপ এই যুগে রচিত বর্ষাসংগীত 'মনে কি দ্বিধা রেখে গেলে চলে' গানটির কথা উল্লেখ করা যায়। মিশ্র ইমনে বাঁধা এই গানটিতে বর্ষণক্লান্ত সন্ধ্যার যে রূপ ফুটে উঠেছে সঞ্চারীতে 'আকাশে উড়িছে বকপাতি বেদনা আমার তারি সাথী'-তে হংসবলাকার সঞ্চরমান পাখার ছন্দে এই রাগাশ্রয়ী গানে হঠাৎ যেন নিয়ে আসা হয়েছে অনেকটা কীর্তনের ঢং। শুধু তাই নয়, 'আকাশে উড়িছে বকপাতি' এই অংশে সুর যেন একই স্থানে অর্থাৎ গান্ধারে স্থিতিলাভ করে আকাশের বিরাট ব্যাপ্তিকেই প্রকাশ করছে।

[গা গরা সরা-গা]

I {সগা গা | গা -া I গা গা | (গা -া I গা মা | পা -মা

আ কা | শে ০ উ ড়ি | ছে ০ ব ক | পা ০

I গা -া | -া -রসা I সা রা | রা -া I রা -গা | -রা -গমা

তি ০ | ০ ০০ বে দ | না ০ আ ০ | ০ ০০

I গা -া | -া পা I পা পনা | ধা -না I পা -ধা | -পা -মা)} I

মা ০ | ০ র্‌ তা রি০ | সা ০ থি ০ | ০ ০

আবার কোনো কোনো লোকসংগীতের সুরে রচিত গানে রাগ-রাগিণীর মিশ্রণ ঘটানো হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ তপতী নাটকে প্রযুক্ত 'দিনের পরে দিন যে

গেল' গানটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। লোকসংগীতের সুরে রচিত এই গানটিতে সঞ্চারীতে 'পায়ের ধ্বনি গণি গণি' অংশে পরজ রাগ যেন হঠাৎ এসে এই গানে অনুপ্রবেশ করেছে :

I {-া -া -া | পা পা -ক্সা I পা পা -দা | -া -া -া I
০ ০ ০ | পা য়ে র্ ধ্ব নি ০ | ০ ০ ০

I দপা পা -না | ধা না -ধা I পা পা -দা | দপা পা -ক্সা I
গ ণি ০ | গ ণি ০ রা তে র্ | তা রা ০

I পা দা -া | -া -া -া I না -া -া | র্সা র্সা -র্রা I
জা গে ০ | ০ ০ ০ উ ০ ত্ | ত রী ০

I র্সনা -র্সা -না | -দা -পা -ক্সা I পা পা -দা | দা দা -া I
য়ে ০ ০ | ০ ০ র্ হাও য়া ০ | এ সে ০

I দপা পা -ক্সা | পা পা -র্সা I র্সনা না দা
ফু লে র্ | ব নে ০ লা গে ০

দা পা ক্সা I পা দা -া | -া -া -া
পা য়ে র্ ধ্ব নি ০ | ০ ০ ০

'এ বেলা ডাক পড়েছে' বাউলাঙ্গ গানের সঞ্চারীতে 'এ বেলা মন যেতে চায়·কোন খানে নিরালায় লুপ্ত পথের সন্ধানে' অংশটিতে বেলাশেষের ভাবটিকে ফুটিয়ে তোলার জন্যে লেগেছে সান্ধ্যকালীন গেয় ইমনকল্যাণ রাগের সুর :

সা | সা সা -রা I {গা -া -া | গা গা -া I গা -া -া রা -া -া I
এ | বে লা ০ ম ০ ন্ | যে তে ০ চা ০ ০ ০ ০ য়্

গা -রা -ম্মা | মগা -রা -গা I সা -া (সা | সা সা -রা)} I

কো ০ ০ন্ | খা ০ ০ নে০ ০ এ | বে লা ০

পা | পা পা -া I পা -া পা | পা পা -া

নি | রা লা য় লু প্ ত | প থে র্

I পা -হ্মা -ধা ধপা -া -হ্মা I নগা -মা মগা

স ০ ন্ ধা ০ ০ নে ০ এ

এইরূপ দরবারী গানের সঙ্গে লৌকিক সুরের মিশ্রণে বহুদিনের ব্যবহারে কিছুটা জীর্ণ রাগ-রাগিণীর মধ্যে একটা নূতন জীবনের স্পন্দন এলো ও জীবনীশক্তির সঞ্চার হ'ল। এই মিশ্রণের সপক্ষে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুপম ভাষায় দিলীপ-কুমার রায়ের কাছে তাঁর মতামত এইভাবে ব্যক্ত করেছিলেন :

"প্রাকৃত বাংলার সহযোগে বাংলা ভাষার প্রকাশ শক্তি বেড়েছে অজস্র—রঙে ঢঙে কত ব্যঞ্জনায়। আর এ সম্ভব হয়েছে জেনো এই গুরুচণ্ডালী দোষের প্রসাদেই। তারই কল্যাণে আজকের বাংলায় সংস্কৃত জাঁমুতমন্দ্রের সঙ্গে প্রাকৃত বাংলার কেয়ূরকঙ্কণ মিশে গেলো—পর হল আপন মান্য গন হল প্রিয় পরি-জন। তেমনি হিন্দুস্থানী সুরে মিশেল আনতে আমাদের বাধবে কেন? আমি মানি রাগ-রাগিণীর একটা নিজস্ব মহিমা আছে। এও মানি রাগ-রাগিণীর পরি-চয় বাঞ্ছনীয়, কিন্তু এ যে বললাম তা থেকে প্রেরণা পেতে, নকল করতে নয়।"

আগের যুগ থেকেই যে রাগভিত্তিক গানগুলিকে কাব্যমণ্ডিত করার ও রাগ-রাগিণীকে গানের ভাব পরিস্ফুট করার কাজে লাগাবার নীতি রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছিলেন—এ যুগের রাগাশ্রয়ী গানে, হোক তা পূজা, প্রকৃতি বা প্রেম পর্যায়ের—তা আরো পূর্ণতা ও সার্থকতা লাভ করেছে। উদাহরণস্বরূপ, এ যুগে ভীম-পলশ্রী রাগ ভিত্তিকরে রচিত 'যদি হায় জীবন পূরণ নাই হোলো, কানাড়াতে, 'আমার আপন গান' বেহাগে, 'আজি তোমায় আবার চাই শুনাবারে', বা ইমনে 'এসো গো জেবলে দিয়ে যাও' গানগুলির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই গানগুলিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, এই গানগুলিতে উল্লিখিত রাগগুলির শাস্ত্রীয় স্বরূপের চাইতে রাগের অন্তর্নিহিত রস বা ভাবরূপের ওপর অধিক ভিত্তি করে এইগুলি গড়ে উঠেছে ও রাগগুলিকে গানের কাব্যাংশের প্রয়োজনে এমনভাবে ব্যবহার করা হয়েছে যে তাদের আলাদা ভাবে সনাক্ত করার কোনো উপায় থাকে না, প্রয়োজনও হয় না। রাগমিশ্রণের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ হ'ল এই যুগে রচিত গ্রীষ্মের 'প্রখর তপন তাপে' গানটি। পর পর ৪টি রাগ—যথা, ভীম-

পলশ্রী, মুলতান, ভৈরবী ও পটদীপ রাগ এসে এই এই গানে মিশেছে ও গানের ভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এইভাবে রাগগুলি এসে পরস্পরের সঙ্গে গলাগলি করে মিশে আছে যে এদেরকে আলাদা ভাবে সনাক্ত করার কথা মনেই হয় না, শুধু গানের বাণীর অন্তর্নিহিত ভাবটি যেভাবে ফুটে উঠেছে তাই আমাদের মনকে নাড়া দিতে থাকে, রাগ-রাগিণীগুলির কথা মনেই আসে না।

কি-ভাবে এই গানে ৪টি রাগের মিশ্রণ ঘটেছে তা গানটির অংশবিশেষ স্বরলিপি করে দেখানো হ'ল :—

[মজ্ঞা]

II জ্ঞা রা সা ণ্‌া সা মা I মপা -জ্ঞমা -পমা র্পা -া -া I = ভীমপলশ্রী
প্র খ র ত প ন তা০ ০০ ০০ পে ০ ০

II পা পা -া ' পমা জ্ঞা মা I পা না -া র্সা -া -া I = পটদীপ
বা হি র্‌ হ য়ে ছি ক বে ০ কা ০ র্‌

I দজ্ঞা পা -জ্ঞা | জ্ঞা পা -দা I দজ্ঞা -পা -া | -া -া -া I [ ] I = মুলতান
খো লো ০ | খো লো ০ দ্বা ০ ০ | ০ ০ র্‌

II সা পা পদা | পা মা জ্ঞরা I রজ্ঞা -া -রা | মজ্ঞা -া -ঋা I
বু কে বা০ | জে আ শা০ হী ০ ০ | না০ ০ ০

I সা -রা জ্ঞা | -া জ্ঞা মা I মজ্ঞা -া -ঋা | সা -া -া I = ভৈরবী
ক্ষী ণ্‌ ম | র্‌ ম র বী ০ ০ ণা ০ ০

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'ভৈরবী যেন সংগবিহীন অসীমের চিরবিরহবেদনা'—এই অংশের সুরারোপ যেন সেই বেদনা মূর্ত হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে রচনা করেছিলেন। তিনি তাঁর গানের ভেতর কোনো অতিরিক্ত অলংকরণ, যথা—আলাপ, বিস্তার বা তানবাট ইত্যাদি জুড়ে দেবার স্বাধীনতা কোনো শিল্পীকে দেননি। সেজন্যে অনেকের কাছে তাঁর গান বড় নিরাভরণ লাগে ও তাঁরা তাঁর গানে অতিরিক্ত অলংকারাদি সংযোজনের প্রযোজনীয়তা অনুভব করে থাকেন। এই বিষয়ে কবির কাছে দিলীপকুমার রায় প্রশ্ন তুললে, তার জবাবে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : "হিন্দুস্থানী সংগীতকার তাদের সুরের মধ্যকার ফাঁক গায়ক ভরিয়ে দেবে এটা

যে চেয়েছিলেন। তাই কোনো দরবারী কানাড়ার খেয়াল সাদামাটা ভাবে গেয়ে গেলে সেটা নেড়া নেড়া না শুনিয়েই পারেনা, কারণ দরবারী কানাড়া তানালাপের সঙ্গেই গেয়, সাদামাটা ভাবে গেয় না। কিন্তু আমার গানে তো আমি সেরকম ফাঁক রাখিনি যে সেটা অপরে ভরিয়ে দেওয়াতে আমি কৃতজ্ঞ হয়ে উঠব।"

কিন্ত নানা প্রশ্ন ও সমালোচনার মুখোমুখি হয়ে তিনি শেষযুগে কিছু গান রচনা করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন কি করে প্রক্ষিপ্ত না করে গানের ভেতরই তান ও বিস্তার গ্রথিত করে গানকে সমৃদ্ধতর ও বৈচিত্র্যশীল করে তোলা যায় ও এরূপ গানের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ এই যুগে রচিত 'শুভ্র প্রভাতে উদিল কল্যাণী শুকতারা' গানটি।

এর অংশবিশেষের স্বরলিপি নীচে দিয়ে আমার বক্তব্যকে পরিস্ফুট কবতে চেষ্টা করবো :

রা -মজ্ঞারজ্ঞা রা সা | রা মা ঝমা -পা | -মপা -দা -পদা -ণা
ক ০০০ ল্ লা ণী | শু ক তা০ ০ | ০০ ০ ০০ ০

-দণা -র্সা -ণর্সা র্রা | র্সণা -র্সর্সা -দপা -মজ্ঞা | -রসা -া -া -া
০০ ০ ০০ ০ | রা০ ০০ ০০ ০০ | ০০ ০ ০ ০ = তান

পদা -া দা দা দা পা -মজ্ঞাঃ -া পা পদা পা -া
পূ র্ ব গ | গ নে ০ ০ উ দি ল ০

-া -া -া -া | দা -া দা দা দা পদণা-দপমজ্ঞা -া | পা দা পা -া | -া -া -া -া
০ ০ ০ ০ | পূ র্ ব গ | গ নে০০ ০ ০ ০ | উ দি ল ০ | ০ ০ ০০

মপদা -ণর্সর্রা -া -জ্ঞর্সা র্সর্সা -া -া -া | -া -া ণা -দা | পদা পাঃ মজ্ঞাঃ -া
পূ০০ ০০০ ০ র্ ব ০ ০ ০ ০ | ০ ০ গ ০ | গ নে ০ ০

পা দা পা -া | -া -া -া -া
উ দি ল০ | ০ ০০০ = বিস্তার

স্বদেশী সংগীত

শেষযুগে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গানের সংখ্যা অনেকটা কমে এসেছে ও এই সময়ে রচিত যে কয়টি স্বদেশী গান আমরা পাই, তাদের প্রকৃতি-ও স্বাদ আগের

যুগের স্বদেশী গানের চেয়ে ভিন্নতর ও এদের স্বদেশী গান না বলে উদ্দীপনা বা আত্মজাগরণের গান বলাই বোধ হয় অধিকতর সংগত হবে।

এই যুগের উল্লেখযোগ্য স্বদেশী বা উদ্দীপনার গানের নমুনা হ'ল :

১. সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধদাহ,
২. শুভ কর্মপথে ধরো নির্ভয় গান,
৩. ওরে নূতন যুগের ভোরে,
৪. এখন আর দেরি নয়,
৫. চলো যাই চলো যাই,
৬. সঙ্কোচের বিহ্বলতা,
৭. ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা,

এর অধিকাংশ গানই কবি বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে রচনা করেন। ১নং গানটি রচিত হয় লাহোর জেলে যতীন দাসের অনশনে মৃত্যুকে উপলক্ষ করে ও পরে এই গানটি তপতী নাটকে যুক্ত হয়। ২নং গানটি, শোনা যায়, কবি রচনা করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বিশেষ অনুরোধে। ৬নং গানটি জাপানী যুযুৎসু-পালোয়ান টাকা গাকীর যুযুৎসু-প্রদর্শনের উদ্বোধনী সংগীত হিসেবে রচিত। ৫নং গানটি ১৯৩৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেনিং কোরের কুচকাওয়াজেব উপযোগী করে রচিত হয়। আগেই বলা হয়েছে যে, মধ্যযুগেয় শেষভাগে রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বদেশী গানে ভারতের ভৌগোলিক সীমা পার হয়ে সারা বিশ্বকে ভারতের পুণ্যক্ষেত্রে একযোগে মানবের কল্যাণের জন্যে আহ্বান করেছিলেন ও তাঁর ওইসব গানে সর্বভারতে প্রচলিত রাগ-রাগিণীকেই পুনরায় প্রয়োগ করতে শুরু করেছিলেন।

কিন্তু এ যুগের গানগুলি দেশাত্মবোধক হলেও, এগুলি আর স্বদেশ ব্যঞ্জনা বা স্বাধীনতার জন্যে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়—এইসব গানগুলি হ'ল আত্মজাগরণের গান, উদ্দীপনার গান।

এখানে এটা বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকলেও রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে গান্ধীজী প্রবর্তিত স্বদেশী আন্দোলন থেকে কিছুটা সরে এসেছিলেন। কিন্তু তাই বলে জাতীয় জীবনে যখনই শাসকগোষ্ঠী কোনো আঘাত হেনেছে তখনই কবি তার প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছেন। তবে সে-প্রতিবাদ হয়তো আগের যুগের মতো 'সবসময়ে সংগীতের ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেনি।

জালিয়ানওয়ালাবাগের নারকীয় হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে নাইট উপাধি ত্যাগ, মেদিনীপুরের হিজলী জেলের বন্দীদের নির্দয় হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে গড়ের মাঠে মনুমেণ্টের পাদদেশে অনুষ্ঠিত সভায় তাঁর দৃপ্ত ভাষণ, ইংরেজ অপশাসনেব বিরুদ্ধে তাঁর অসাধারণ প্রবন্ধ 'সভ্যতার সংকট' ও ইংরেজ শাসকদের চণ্ডনীতির প্রতিবাদে তাঁর অসাধারণ কবিতা 'ভগবান তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ

বারে বারে'—তাঁর জ্বলন্ত দেশপ্রেমের সাক্ষ্য বহন করে। কিন্তু তিনি লক্ষ্য করেছিলেন স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রে সভাসমিতি করে প্রতিবাদ জানানো এবং ভারত সরকারের কাছে আবেদন করার দিকে দেশবাসীর যতটা ঝোঁক ততটা কিন্তু চেষ্টা নেই নিজেদের এবং দেশের উন্নতিবিধানের দিকে। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন প্রকৃত শিক্ষায় যদি দেশবাসীরা শিক্ষিত না হয় ও নিজেদের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে না পারে তবে বাইরের এই আন্দোলনে তাদের কিছু উপকার হবে না। এই ধারার আন্দোলনের মাধ্যমে ভিক্ষাবৃত্তি করে যা পাওয়া যাবে, তাও সত্যিকার পাওয়া হবে না ও তা পেলেও তাকে ধরে রাখা যাবে না। তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন: "বিদেশী রাজা চলিয়া গেলেই দেশ যে আমাদের স্বদেশ হইয়া উঠিবে তাহা নহে।"

তখনকার রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন লেখা থেকে একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে তিনি জাতীয় আন্দোলনের সংগে যুক্ত থেকেও গতানুগতিক রাজনীতির বিরোধিতা করেছেন। তাছাড়া স্বদেশের স্বাধীনতার জন্যে আন্দোলন করতে সবরকম আনন্দকে বিসর্জন দিয়ে জীবনকে শুষ্ক করে সংগ্রামে নামতে হবে, এটা রবীন্দ্রনাথ কখনই মানতে চাননি। তিনি আলাপ-আলোচনা প্রসংগে এই বিষয়ে দিলীপকুমার রায়ের কাছে তাঁর মনোভাব এইভাবে ব্যক্ত করেছিলেন: "এটা আমি কিছুতেই ভেবে পাইনে নিরবচ্ছিন্ন রাজনীতির চর্চাতেই কী করে দেশ উদ্ধার পেতে পারে। শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, নাচ, গান এদের কি কিছুই দাম নেই? আনন্দকে অপাঙ্‌ক্তেয় করে রেখে এমন কি চতুর্বর্গ ফল লাভ হবে বুঝিনে। দেশের অস্থি মজ্জায় আনন্দকে চাগিয়ে তোলো তাতে সব দিক থেকেই লাভ হবে, এমনকি রাজনীতিক দিক থেকেও।"

এই স্বদেশী আন্দোলনের সময়েও তিনি ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে শিল্পকলা-সৃষ্টির কাজে নিযুক্ত ছিলেন বলে তাঁকে দেশবাসীর কাছ থেকে অনেক বিদ্রূপ ও কটাক্ষ সহ্য করতে হয়েছিল। এই প্রসংগে শ্রীশান্তিদেব ঘোষ তাঁর বই রবীন্দ্রসংগীত গ্রন্থে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন:

"ননকোঅপারেশনের পরের কথা। কলকাতায় খুব ধরপাকড় চলছে। আশ্রমে খবর এল বাসন্তী দেবীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে.........একখানি বেনামী চিঠি এল কবির নামে, তাতে লেখা আছে—'দেশে আগুন লেগেছে আর আপনি গান গেয়ে বেড়াচ্ছেন?'—আমাদের তখন গানের ক্লাস চলছিল। সংগীত-অধ্যাপক (প্রাক্তন) পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রীকে কবি এসে বললেন, 'পণ্ডিতজী, এই দেখুন আমার নামে অভিযোগ এসেছে আমি গান গাই কেন? তা আমার ত আর কোনো গুণ নেই—তাঁর সেই আক্ষেপই পরে মূর্ত হয়ে উঠেছে তাঁর অননুকরণীয় ভাষায়—

সময় কারো যে নাই ওরা চলে দলে দলে
গান হায় ডুবে যায় কোন কোলাহলে॥

—রবীন্দ্রসংগীত, শান্তিদেব ঘোষ

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, ব্যক্তিস্বাধীনতা সমাজের নূতন ও শৃঙ্খলাবন্ধস্বরূপ। সামাজিক চেতনা ও সমাজের প্রতি স্তরের লোকের প্রতি মমত্ব ও কল্যাণবোধই তাঁর কাছে প্রধান ও প্রাথমিক কর্তব্য বলে মনে হয়েছে ও সেই যুগের দেশাত্মবোধক গানের মধ্যেও এই ভাবেরই প্রকাশ দেখা যায়। ফলে, এই সমস্ত গান সাময়িক উত্তেজনার ঊর্ধ্বে উঠে চিরস্থায়ী হয়ে উঠেছে ও স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পরও এইসব গানের কার্যকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায়নি। এইসব গানে দেশবাসীকে সঙ্কোচ জড়তা পরিহার করে গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করার একটা আহ্বান এসেছে।

এইসব আত্ম-উদ্দীপনার গানে কবি সাধারণত আর লোকসংগীতের সুর প্রয়োগ করেননি। তিনি সুরারোপে রাগ-রাগিণীর ওপরই নির্ভর করেছেন। অবশ্য 'ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা' গানটি ছাড়া। এই যুগে তাঁর সমস্ত গানেই কবি কথা ও সুরের একটা সার্থক মিলনের চেষ্টা করেছেন এবং তাতে সফলতা লাভও করেছেন। এই কথা ও সুরের সামঞ্জস্যের বৈশিষ্ট্য তাঁর শেষযুগের সব গানেই ফুটে উঠেছে—হউক তা রাগভিত্তিক, গণসংগীত বা প্রেম বা ধর্মসংগীত। এই যুগে রচিত স্বদেশী গানগুলিও তার ব্যতিক্রম নয়।

'ওরে নূতন যুগের ভোরে' গানটিতে সকালবেলাকার ও জাগরণের ইঙ্গিত থাকায়, এতে সকালবেলায় গেয় আশাবরী বলে ব্যবহৃত হযেছে। 'শুভ কর্মপথে ধর নির্ভয়' গানে 'ক্লান্তি জাল কর দীর্ণ বিদীর্ণ' অংশের সুরারোপ লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে 'বিদীর্ণ' অংশের সুরারোপে যেন কিছুকে আঘাত করে ভেঙে ফেলার প্রচণ্ডতা :

I র্সর্রা -র্সা র্রা র্রা	র্জ্জা -া র্জ্জা -া I
দী-০ -র্ ণ -বি	দী র্ ণ ০

'সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধদাহ' গানটির 'দূর করো মহারুদ্র যাহা মুগ্ধ যাহা ক্ষুদ্র' অংশের সুরে যেন প্রচণ্ড গতিবেগ অনুভব করা যায়।

II র্গা -া -া	র্গা র্গা -া I	র্গা র্গা -া	র্গা -র্রা র্গা I
দূ ০ র্	ক রো ০	ম হা ০	রু দ্ দ্র
I র্গর্পা র্পা -া	র্গা -া র্গর্রা I	র্গা র্গা -া	র্রা -া র্সা I
যা০ হা ০	মু গ্ ধ০	যা হা ০	ক্ষু দ্ দ্র

এইভাবে এই ধারার গানের কথা ও সুরের কণ্ঠের মিলনের বহু দৃষ্টান্ত উপস্থাপনা করা যেতে পারে।

এই যুগের লোকসংগীত ও কীর্তনাঙ্গ সুরে রচিত উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রসংগীতের একটি তালিকা নীচে দেওয়া হলো :

১ আনমনা, আনমনা : কীর্তনাঙ্গ
২ পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে : লোকসংগীতের সুর
৩ দিনের পরে দিন যে গেল : বাউলাঙ্গ
৪ ওরে গৃহবাসী খোল দ্বার : লোকসংগীতের সুর
৫ যখন মল্লিকাবনে : কীর্তনাঙ্গ
৬ আমার প্রাণের মাঝে সুধা . কীর্তনাঙ্গ
৭ যা ছিল কালো ধলো : বাউলাঙ্গ
৮ আমি মারের সাগর : সারী গানের সুর
৯ আগুন আমার ভাই : বাউলাঙ্গ
১০ ওরে মন যখন জাগলিনা রে : বাউলাঙ্গ
১১ পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে : বাউলাঙ্গ
১২ তোমরা যা বলো তাই বলো : কীর্তনাঙ্গ
১৩ আমি কান পেতে রই : বাউলাঙ্গ
১৪ মেঘের কোলে কোলে : বাউলাঙ্গ
১৫ ব্যর্থপ্রাণের আবর্জনা : বাউলাঙ্গ
১৬ রোদনভরা এ বসন্ত : কীর্তনাঙ্গ
১৭ আজি এ নিরালা কুঞ্জে : „
১৮ পুরানো জানিয়া চেয়োনা : „
১৯ কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি : কাব্যসংগীত—মিশ্রকীর্তনের সুর

এটা লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, রবীন্দ্রনাথ যে-সমস্ত গান লোকসংগীতের সুরে বেঁধেছেন তা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন নাটকে প্রযুক্ত হয়েছে।

বাউল গানের কথা নিয়েই প্রথমে আলোচনা করা যাক। প্রথম থেকে এই যুগ অবধি রচিত বাউলাঙ্গ গান পর্যালোচনা করলে এটা স্পষ্ট বোঝা যাবে যে এই ধারার গান ধীরে ধীরে অন্তর্মুখী হয়ে উঠে খাঁটি বাউল গানে পরিণত হয়েছে। তাঁর স্বদেশী বাউল গানে যে নাচের মাতন ও প্রাণের উচ্ছ্বাস ছিল তা ধীরে ধীরে কমে এসে এযুগের বাউল গানগুলির মুখ্য আবেদন প্রকাশিত হলো কবিসত্তার অন্তরবাণীতে ও তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো : 'আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে', 'মন যখন জাগলিনারে', 'আমি কান পেতে রই' সদৃশ গানগুলি।

বাউলরা সহজিয়া ধর্মমতের পক্ষপাতী। তারা নিজেদের ভিতর নিজের মনের মানুষ অর্থাৎ ভগবানকে খুঁজতে চেষ্টা করেছে। বাউলদের ধর্মের যে মূল কথা 'যাকে জানবার সেই পরমপুরুষকেই জানো' সেটাই যেন সার্থক রূপ পেলো রবীন্দ্রনাথের 'প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে' বা 'মন যখন জাগলিনারে' গান-

গুলিতে। অবশ্য শেষযুগে কীর্তন ও বাউল গানের সংমিশ্রণে এক বিচিত্র ধারার সৃষ্টি হয়েছিল তা কীর্তন সম্বন্ধে আলোচনার সময় ব্যাখ্যা করা যাবে।

তাঁর শেষযুগে রচিত কীর্তনাঙ্গ গান সম্বন্ধে এইটুকু বলা চলে যে, তাঁর সংগীতসৃষ্টির বেশ কিছু আগে থেকেই কীর্তন গান রচনায় স্বকীয়তা প্রকাশ পাচ্ছিল, কারণ এই ধারার গানে চিরাচরিত রাধাকৃষ্ণের প্রেম বিষয়ে আবদ্ধ না রেখে বেশ কিছু পূজা পর্যায়ের গান কীর্তনাঙ্গ সুরে বেঁধেছিলেন। কিন্তু এর মধ্যে তাঁর শান্তিনিকেতনে বাসকালীন রচিত কীর্তনাঙ্গ গানে আর একটি নতুন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেলো।

এর আগে কীর্তনাঙ্গ সুরে কোনো ঋতুসংগীত ('গীতাঞ্জলি'র 'শরতে আজ কোন অতিথি') ছাড়া রচনা করেননি, কিন্তু এবার তিনি প্রকৃতিকে নিয়ে রচিত কিছু গানে কীর্তনাঙ্গ সুর আরোপ করলেন—যথা 'তোমরা যা বলো তাই বলো' বা 'আমার মল্লিকাবনে' প্রভৃতি গানে।

এছাড়া তাঁর কীর্তনাঙ্গ গানে আর একদিক থেকেও বৈশিষ্ট্য দেখা দিলো।

তাঁর আগের যুগের রচিত কীর্তনাঙ্গ গানের কলিগুলিতে একই সুরের পুনরাবৃত্তি দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু পরবর্তীকালে রচিত অনেক কীর্তনাঙ্গ গানে সুরপ্রয়োগের এই রীতি তিনি পরিহার করেছিলেন ও তাতে সুরের বৈচিত্র্য ও বিভিন্ন বিন্যাস দেখা যায় প্রত্যেকটি কলিতে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, 'আজি এ নিরালা কুঞ্জে', 'পুরানো জানিয়া চেয়োনা' প্রভৃতি গানগুলির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

কবির শেষজীবনে বাংলার নিজস্ব সুর ও ঢঙে রচিত আর একটি নতুন সৃষ্টির প্রকাশ দেখা দিল, যাকে শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষের মতে, রাবীন্দ্রিক কীর্তন বা রাবীন্দ্রিক বাউল বলা যেতে পারে। এই সৃষ্টি কীর্তনের আখর ইত্যাদি বর্জিত ও বাউলের প্রভাব যুক্ত। এ গানগুলি হলো কীর্তন ও পূর্ববঙ্গের বাউলদের সুরের মিশ্রণে গঠিত এক বিশেষ ধারার গান।

দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে :

১ ওরা অকারণে চঞ্চল—৪ মাত্রার ছন্দ

২ আমার কী বেদনা সে কি জান—৩ মাত্রার ছন্দ

৩ যেতে যেতে চায়না যেতে— ঝাপতালের ছন্দ

৪ লহ লহ তুলে লহ—তেওড়া তালের ছন্দ

কীর্তন ও বাউলের মিশ্রণের প্রসঙ্গে আর একটি গানের কথা উল্লেখ করা যায়, তা হলো : 'এই তো ভালো লেগেছিল'।

সুতরাং দেখা যাবে যে প্রথমে চিরাচরিত কীর্তনের ধারা অবলম্বন করে গান রচনা শুরু করলেও, শেষে রবীন্দ্রনাথ কীর্তন গানকে এমন এক রূপ দিয়েছেন যা তাঁর একান্ত নিজস্ব। আগেই বলা হয়েছে যে প্রথমযুগে রচিত ধর্ম বা ব্রহ্ম-সংগীত রচনায় রবীন্দ্রনাথ ভাব ও সুরের দিক দিয়ে তার পূর্বসূরীদের মোটামুটি

ভাবে অনুসরণ করেছেন—কিন্তু মধ্যযুগে ধর্মসংগীত রচনায় রবীন্দ্রনাথ এই প্রভাব থেকে অনেকটা মুক্ত হয়ে নিজস্ব অন্তকের আকৃতির পরিচয় দিতে শুরু করেছেন এবং সুরে ও তালে নেই সেই ধ্রুপদী প্রভাব এবং গানের বাণীও ব্রাহ্ম-ধর্মের সেই গোষ্ঠীবন্ধতা থেকে অনেকটা মুক্ত। আমরা মধ্যযুগে পেলাম গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য ও গীতালীর রাগসম্মত অথচ কাব্যমণ্ডিত বিশিষ্ট ধর্মসংগীত—তাঁর ধর্মসংগীত ধীরে ধীরে পূজা পর্যায়ের গানে রূপান্তরিত হলো।

কিন্তু জীবনের শেষপর্বে রচিত ধর্ম বা পূজা পর্যায়ের গানকে রবীন্দ্রনাথ আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেলেন। শেষযুগে তিনি রাগভিত্তিক গান ছাড়াও তাঁর পূজা পর্যায়ের গান দেশী বা লোকসংগীতের সুরের প্রয়োগে বাঁধলেন। অবশ্য এর সূচনা মধ্যযুগ থেকেই হয়েছিল।

এই যুগে বাউল এবং কীর্তনের সুর তাঁর ধর্মসংগীতকে বিশেষভাবে আশ্রয় করেছে ও শুধু সুরেতেই নয়, গানের কথাতেও উপনিষদের বাণী ছাড়াও বাউল ও বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব বহুল পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, মধ্যযুগের শেষভাগে রচিত বাউলাঙ্গ পূজা পর্যায়ের গান 'আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে' ও 'মন যখন জাগলিনারে' বা এই যুগে রচিত 'আমি কান পেতে রই' ও পূজা পর্যায়ের কীর্তনাঙ্গ গান 'তোমার সুরের ধারা ঝরে যেথায় তারি পারে' বা 'আমার না বলা বাণীর' গানগুলির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

শেষযুগে "রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভগবান বা জীবনদেবতাকেও বিশ্বপ্রকৃতি এবং প্রেমিকার মধ্য দিয়েও উপলব্ধি করেছেন। তাঁর এই দ্বৈতলীলায় বৈষ্ণবকবিদের অনুরূপ প্রেমবৈচিত্র্য প্রকাশিত হয়েছে। যে সত্তা প্রেমিকার প্রেমের অনন্ত মাধুর্যে ধরা দিয়েছে, সে সত্তাকেই তিনি বিশ্বপ্রকৃতির রূপবৈচিত্র্যের মধ্যে উপলব্ধি করেছেন"। —'সুরের গুরু', অমিয় সেন ও নীলিমা সেন।

এই সময়ে ভগবদ্‌ভক্তি ও মানবিক প্রেমানুভূতি তাঁর ধর্মসংগীতে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে ও মিশে আছে। বিশ্বজীবনের সঙ্গে মানব-জীবনের যে ঐক্য ও নিবিড় সম্পর্ক আছে সেই অনুভূতির আনন্দ বা উপ-লব্ধিতেই তাঁর মন পরিপূর্ণ। তাঁর এই জীবনদর্শন কবি অনুপম ভাষায় শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবীর কাছে এইভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন :

"ভোর বেলায় আমার আকাশের মিতা যখন আমায় আলোর ধারায় স্নান করিয়ে দেয় তখন আমি চেষ্টা করি আমার নিজের থেকে দূরে সরে যেতে। আমাদের মধ্যে দুটো 'আমি' আছে—দুটো মানুষ, একজন লোভে ক্ষোভে শোকে দুঃখে আনন্দে বিষাদে সর্বদাই দোদুল্যমান। আর একজন যে বড়ো 'আমি', সে এ সমস্তের অতীত, সে স্থির আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ অথচ ঢাকা পড়ে থাকে সেই বড়ো সত্তাটাই। এরই বিষয়ে আমি বলেছি মানুষের দুটো রূপ, একটা তার বিশেষ রূপ, আর একটা তার বিশ্বরূপ। সেই বিশ্বরূপেই সে অসীমের সঙ্গে

এক। আমি যাত্রা করে বেড়িয়েছি সেই ছোটো আমিটার থেকে দূরে যেতে, তা না হলে এই ক্ষণিক সুখ দুঃখ আবিল তুচ্ছতায় ঢাকা পড়ে যেতে চায় আমার মধ্যে আমার অতীত সেই অমর অজেয় আত্মা। সে বড় ভয়ানক ক্ষতি। সেই বড়ো সত্তার মধ্যে দৃঢ় ভাবে সত্য ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারলে মানুষের আর কোনো ভয় থাকেনা। যখনই কোনো কারণে চঞ্চল হই তখনি বুঝতে পারি আমার সাধনা সম্পূর্ণ হয়নি। তাই আমি ভোর বেলায় সূর্যালোকে বসে প্রত্যহ চেষ্টা করি, সেই ছোট আমিটার থেকে দূরে যেতে।

"আমি কোনো দেবতা সৃষ্টি করে প্রার্থনা করতে পারিনে, নিজের কাছ থেকে নিজের যে মুক্তি, সেই দুর্লভ মুক্তির জন্যে চেষ্টা করি।"

—'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ', পৃ. ২৪৪-২৪৫।

কবি উপলব্ধি করেছেন সমগ্র সৃষ্টি জুড়ে অনাদি সংগীত ধ্বনিত হয়ে বয়ে চলেছে ও সে-সংগীতের ধারা জগৎকে প্লাবিত করে তাকে বিভিন্ন সৌন্দর্যে অভিষিক্ত করে তুলেছে। সে ধ্বনির সেই অভিব্যক্তির আনন্দে কবি যোগ দিতে বিশেষ উৎসুক :

তোমার সুরের ধারা ঝরে
যেথায় তারি পারে
দেবে কিগো বাসা আমায় একটি ধারে
আমি শুনব ধ্বনি কানে
আমি ভরব ধ্বনি প্রাণে
সেই ধ্বনিতে চিত্তবীণায় তার বাঁধিব বারে বারে।

—এই গানটিতে কবির সেই মনোভাবই ব্যক্ত হয়েছে।

"কোথাও সুরের বেদনায়, কখনওবা সুরের আনন্দের মধ্য দিয়েই কবির আত্ম নিবেদনের গানগুলি জীবনদেবতার সঙ্গে তাঁর অনাদি বিচ্ছেদ, অসীম বিরহকে দূর করার পথে যাত্রা করেছে।" —'সুরের গুরু', অমিয় সেন ও নীলিমা সেন।

এই যুগে রচিত

তোমার আমার ঐই বিরহের অন্তরালে
কত আর সেতু বাঁধি সুরে সুরে তালে তালে।
তবু যে পরাণ মাঝে গোপনে বেদনা বাজে
এবার সেবার কাজে ডেকে লও সন্ধ্যাকালে।

গানটিতে উপরোক্ত মনোভাবেরই প্রতিফলন দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্য ও সংগীতে মৃত্যুর প্রতি একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণ করেছেন দেখা যায়। তিনি অনন্ত মহাজীবনে বিশ্বাসী, সুতরাং পৃথিবীর সুখদুঃখকে তিনি চরম প্রাপ্তি বলে মনে করতে পারেন না। মৃত্যুও তাঁর কাছে সে মহাজীবনের পথে একটি তোরণ বা বাঁক মাত্র এবং এই বিশেষ ভাব গৃহপ্রবেশ নাটকে উপস্থাপিত 'জীবন-মরণের সীমানা ছাড়ায়ে' ও 'কেনরে এই দুয়ারটুকু পার হতে সংশয়'

গান-দুটির মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে।

আমরা মৃত্যুকে চিরাচরিত ভয়ালরূপে দেখতে অভ্যস্ত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের চোখে মৃত্যু সম্পূর্ণ অন্য রূপে ধরা পড়েছে। তাঁর উপলব্ধিতে—

"মৃত্যু বড়ো সুন্দর বড়ো মধুর। মৃত্যুই জীবনকে মধুময় করে রেখেছে। জীবন বড়ো কঠিন, সে সবই চায় সবই আঁকড়ে ধরে; তার বজ্রমুষ্টি কৃপণের মতো, কিছুই ছাড়তে চায়না। মৃত্যুই তার কঠিনতাকে রসময় করেছে তার আকর্ষণকে আলগা করেছে, মৃত্যুই তার নীরস চোখে জল এনে দেয়, তার পাষাণ-স্থিতিকে বিচলিত করে।

এইসময়কার পূজা পর্যায়ের গানের সুর ও গঠনপ্রণালীর দিকে লক্ষ্য করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, এতে নেই ধ্রুপদী চালের ও ভারী ভারী তালের অবলম্বন, অবশ্য এর সূচনা তাঁর মধ্যযুগের পূজার গানেই হয়েছিল। এই যুগের এই ধারার গানে তার আরো সহজ ও সরলতম রূপ পেয়েছে।

আগেই বলা হয়েছে যে, এই যুগের ধর্ম বা পূজা পর্যায়ের গান আগের যুগের মতো শুধু রাগাভিত্তিক আঙ্গিকের মাধ্যমেই প্রকাশ পাচ্ছে না, লোক-সংগীত ও কীর্তনকে আশ্রয় করেও প্রকাশ পাচ্ছে।

এই যুগে তাঁর ধর্ম বা পূজা পর্যায়ের গানে কবির হয়তো একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী আছে, যা হয়তো সাহিত্যগতভাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। কিন্তু গানের মাধ্যমে তার প্রকাশ শুধু কোনো একটা বিশেষ আঙ্গিকেই আর আবদ্ধ নয় ও তা থেকে একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে রবীন্দ্রনাথ তার সংগীতসৃষ্টিতে এমন এক স্তরে পেঁৗছেছেন যেখানে এই ধারার বা কোন ধারার গান রচনায়ই তাঁকে বিশেষ কোনো আঙ্গিকের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে হয় না। সেখানে তিনি যে-কোনো আঙ্গিকের মধ্যে যে-কোনো ধারার গান রচনা করতে পারেন, তবে তাতে সব সময়েই একটা বিশেষ আদর্শ অনুসৃত হয় এবং তা হলো কথা ও সুরের সার্থক সমন্বয়।

প্রেমসংগীত

কবির শেষযুগের গানকে কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করার অসুবিধার কথা আগেই বলা হয়েছে; কারণ একই গান হয়তো প্রেম, পূজা, ঋতু বা রাগসংগীতের পর্যায়ে পড়ে।

নিছক দৈহিক প্রেমের উপর ভিত্তি করে অবশ্য কবির প্রেমসংগীত কোনো-দিনই রচিত হয়নি। কৈশোর বা যৌবনে রচিত প্রেমের গানে যদি কিছুটা দৈহিক প্রেমের অবলম্বন হয়েও থাকে, পরবর্তীকালে প্রকৃতির সৌরভ এবং ভগবৎচেতনার সংগে মিশে তা এক হয়ে গেছে। প্রেমিকা প্রকৃতি ও ভগবানের সমন্বয়ে তাঁর মানসী প্রেয়সী গড়ে উঠেছে। সেই প্রেয়সীর দৈহিক সৌন্দর্যের আকর্ষণের চেয়ে তার মনের মাধুরী কবির কাছে অধিক প্রিয়, যেজন্যে এই

যুগের প্রেমসংগীতকে অনেকক্ষেত্রেই পূজার গান বলেও গণ্য করা চলে এবং সেক্ষেত্রে প্রেম ও পূজার গানের তফাত করা বা তাদের মধ্যে প্রভেদের সীমারেখা টানা কঠিন।

কিছুটা রাগভিত্তিক ও নৈর্ব্যক্তিক প্রেমের গানের নমুনা আমরা পাই :

'বাণী মোর নাহি
স্তব্ধ হৃদয় বিছায়ে চাহিতে শুধু জানি'

বা পরজে

'ওগো স্বপ্নস্বরূপিণী তব অভিসারের পথে পথে
স্মৃতির দীপ জ্বালা

সদৃশ গানে এবং প্রেম ও পূজা এই দুইয়ের সমন্বয়ের সার্থক রচনা হিসেবে :

'মম দুঃখের সাধন
যবে করিনু নিবেদন
নয়নজলে
শুভ লগন গেল চলে
প্রেমের অভিষেক কেন হলনা তব নয়নজলে
যদি দিতে বেদনার দান
আপনি পেতে তারে অমৃত ফলে'

গানখানির উল্লেখ করা যায়।

"দুঃখবেদনার দান নিবেদন করে প্রতিদানে প্রেমাস্পদের কাছ থেকে তার বেদনার দান যদি প্রতিনিবেদিত হয় তবে বেদনা বিনিময়ের দ্বৈতলীলার দুঃখ মন্থনের থেকে অমৃত লাভ হবে।"

—'সুরের গুরু', অমিয় সেন ও নীলিমা সেন।

উপরের গানে এই ভাবটিই ফুটে উঠেছে। এই গানটিকে রবীন্দ্রনাথ নিজেই গীত-বিতানের প্রেম অংশে যুক্ত করেছেন, কিন্তু পূজার গানের পর্যায়ে তাকে অন্তর্ভুক্ত করলে খুব একটা অসংগত কিছু হতোনা।

এ যুগে সুরারোপিত 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি' গানখানিকে কাব্য-সংগীতের পর্যায়ে প্রেমসংগীত বলা যেতে পারে।

তবে শ্যামা ও চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যে আমরা এমন কিছু গান পাই যেখানে তাঁর প্রেমের গান ঐ নৈর্ব্যক্তিক স্তর থেকে নেবে এসে কিছুটা মানবিক সাধারণ স্তরে নেমে এসেছে ও যা সাধারণ মানবিক প্রেম ও পুরুষ-রমণীর পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ ও অনুরাগকে ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, শ্যামা নৃত্য-নাট্যের 'আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া', 'ন্যায় অন্যায় জানিনে জানিনে জানিনে' গানের কথা উল্লেখ করা যায়।

নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদার 'শুনি ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে', 'আমার অংগে অংগে কে বাজায়', বা 'রোদনভরা এ বসন্ত' গানগুলির কথাও উল্লেখ করা যায়। এই-

সব গান যদিও বা কিছুটা দৈহিক প্রেমের উপর ভিত্তি করে রচিত, কিন্তু তা হলেও তার অনুপম কাব্য ও অতুলনীয় সুরসম্ভার নিছক দৈহিক প্রেম-উপলব্ধি থেকে আমাদের মনকে অনেক উর্ধ্বে নিয়ে যায় ; উদাহরণস্বরূপ 'আমার জীবন পাত্র উচ্ছলিয়া' গানটির

"বিদায় নেবার সময় এবার হলো
প্রসন্নমুখ তোলো মুখ তোলো'

অংশের কথা ও সুরপ্রয়োগের অপূর্ব সমন্বয়ের, বিশেষ করে কোমল 'ঋষভ' প্রয়োগে যা ফুটে উঠেছে তার উল্লেখ করা যায়—যাতে বিদায় নেবার আগে প্রেমিকার কাছে শেষবারের প্রেম নিবেদনের আকুলতা ফুটে উঠেছে, যা আমাদের মনকে এক নিবিড় অথচ দেহাতীত বেদনায় সমাচ্ছন্ন করে রাখে।

সুরপ্রয়োগের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে কীর্তনাঙ্গ 'রোদনভরা এ বসন্ত' গানটি ছাড়া নৃত্যনাট্যের অন্যান্য অধিকাংশ গানই মিশ্ররাগে বা কোনো রাগের উপর ভিত্তি করে রচিত। 'আমার জীবনপাত্র' গানটির সুররূপে ভৈরব-যোগিয়া রাগের আভাষ আসে। 'জীবনে পরম লগনে করোনা হেলা' গানটি ভৈরবী, 'আমার অঙ্গে অঙ্গে কে বাজায়' গানটি বেহাগে ও 'শুনি ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে' গানটি মুলতান রাগের ওপর ভিত্তি করে রচিত। এই যুগে রবীন্দ্রনাথ রাগ-রাগিণীকে মনের ভাবপ্রকাশের বাহন হিসেবে ব্যবহার করার ব্যাপারে সিদ্ধি লাভ করেছেন বলা চলে।

এ যুগের রচিত কয়েকটি গানে রবীন্দ্রনাথ প্রেমকে মহাজাগতিক বা সৌরজগতে এনে উপস্থিত করেছেন। প্রেমিকা এবং প্রেমের লীলা সেখানে মহাবিশ্বের পটভূমিকায় উপস্থাপিত। জগতের সীমার বাইরে স্থাপিত এই প্রেমের গান-গুলির সুরের মধ্যেও যেন এই সুদূরের ছোঁয়াচ লেগেছে। উদাহরণস্বরূপ, কানাড়া রাগে রচিত 'আমার আপন গান' ও কাফি-কানাড়া রাগে রচিত 'বাণী মোর নাহি' গান দুটির কথা উল্লেখ করা যায়।

প্রথম গানটিতে :

'কোথায় তুমি মম অজানা সাথী
কাটাও বিজনে বিরহ-রাতি
এসো এসো উধাও পথের যাত্রী
তরী আমার টলোমলো ভরা জোয়ারে।'

—এই অংশের সুরের পালে দুরন্ত হাওয়ার টানে কবির গানের তরী জগতের সীমা ছাড়িয়ে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছে। এই অংশের 'টলোমলো' ও 'জোয়ারে' অংশের স্বরবিন্যাস বিশেষভাবে লক্ষণীয় :

I র্রা -া র্রা -র্সা | র্রা -র্সর্রা র্রা -র্মা I -র্জ্ঞা -া -া -া | -া -া -া -া I

ট ০ লো ০ | ম ০০ লো ০ ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০

I র্জ্ঞা র্জ্ঞর্মা র্জ্ঞ র্মা -র্রা | র্সর্র -না র্ন র্সা -ধা I -ণা -পা -মপা -ধপা

ভ রা ০ জো ০ য়া ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০০

মা -জ্ঞা -া -া II II

রে ০ ০ ০

মনে হবে যেন তরী সত্যিই টলমল করছে—জোয়ারের উচ্ছ্বাসও যেন আমরা সুরে উপলব্ধি করতে পারি।

অন্য গানটিতে "কবির বিরহ মহাজাগতিক অসীমতার পটভূমিতে মহাবিরহের অনন্ত আকৃতিতে পরিণত হয়েছে।" —'সুরের গুরু', অংশুয় সেন ও নীলিমা সেন।

'বাণী মোর নাহি
স্তব্ধ হৃদয় বিছায়ে চাহিতে শুধু জানি
আমি অমা বিভাবরী আলোহারা
মেলিয়া অগণ্য তারা
নিষ্ফল আশায় নিঃশেষ পথ চাহি ॥'

—সুরের পাখনায় ভর করে এ যেন মহাকাশযাত্রা করেছে। আগেই বলা হয়েছে যে, এইসময়কার গানে রবীন্দ্রনাথ কোনো ধারার গান রচনাতেই আর গতানুগতিক পর্যায়ের বা গায়ন-শৈলীর উপর নির্ভরশীল নন। সেজন্যে ঋতুসংগীত, রাগ-ভিত্তিক গান বা কীর্তন ও লোকসংগীতের সুরে রচিত গান—সবেতেই রবীন্দ্রনাথ প্রেমসংগীত রচনা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, বর্ষাঋতুর 'আজি তোমায় আবার চাই শুনাবারে', 'মনে কি দ্বিধা রেখে গেলে চলে', 'চিনিলেনা আমারে কি' প্রভৃতি গানগুলির কথা উল্লেখ করা যায়। ঐগুলিকে আবার রাগভিত্তিক কাব্যমণ্ডিত গানও বলা যেতে পারে। গ্রীষ্মের 'বৈশাখের এই ভোরের হাওয়া', 'মধ্যদিনের বিজন বাতায়নে', শরতের 'শরৎ আলোর কমল বনে', হেমন্তের 'সে দিন আমায় বলেছিলে', বসন্তের 'আজি দক্ষিণ পবনে' প্রভৃতি গানগুলিকে যুগপৎ ঋতু-সংগীত ও প্রেমসংগীতও বলা চলে। আবার 'আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে', 'আনমনা আনমনা' বা 'ডাকবনা ডাকবনা অমন করে বাইরে থেকে' গানগুলিকে যুগপৎ কীর্তন ও লোকসংগীতের সুরে রচিত প্রেমসংগীত বলে গণ্য করা যেতে পারে।

ঋতুসংগীত

এই যুগের কবির গানগুলিকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তবে দেখতে পাব যে, তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভা ঋতুসংগীত ও নৃত্যনাট্যগুলির গানের মাধ্যমেই বেশী প্রকাশ পেয়েছে।

মধ্যযুগের শেষভাগ থেকে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়ার যে সাধনা কবির সুরু হয়েছিল, এই যুগে তা পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল। এছাড়াও এই যুগে কবির প্রকৃতির প্রতি মনোভাবের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো, প্রকৃতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপাদানের প্রতিও তাঁর বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ ও এর পশ্চাতে নিম্নোক্ত কারণগুলি বিশেষভাবে কাজ করছিল।

"সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ঐতিহাসিক বহু বিচিত্র সত্তার সংমিশ্রণ এবং সংঘাতে রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনের কাব্যে যে পটভূমিকা গড়ে উঠেছিল তাতে সাধারণের প্রতি তাঁর দৃষ্টি নতুন করে আকৃষ্ট হয়েছিল।" ('প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ', অমিয় সেন)। ফলে, এ যুগে যেমন সাধারণ মানুষের দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়ল তেমনি প্রকৃতির অত্যন্ত সাধারণ ও আপাতদৃষ্টিতে অকিঞ্চিৎকর বস্তুর মধ্যেও কবি সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করলেন। তাই দেখতে পাওয়া যায় যে কবিত্বের রীতিতে যে-সমস্ত প্রাকৃতিক উপাদান সুন্দর বলে গৃহীত হয়ে আসছে, তা ছাড়া বহু সাধারণ প্রাকৃতিক উপাদান নিয়েও তিনি এই যুগে কবিতা লিখেছেন। এরই ফলশ্রুতিস্বরূপ এই যুগে তাঁর ঋতুসংগীতে গ্রীষ্ম, হেমন্ত ও শীত ঋতু প্রবেশাধিকার পেল: এর আগের যুগে বর্ষা, বসন্ত ও শরৎ ঋতুই প্রাধান্য পেয়ে আসছিল—অবশ্য এই যুগেও তাঁর ঋতুসংগীতে বর্ষাঋতুরই প্রাধান্য ও বৈচিত্র্য।

এখানে গ্রীষ্ম, শীত ও হেমন্ত ঋতুর উপর কবি যে গান রচনা করলেন তার সম্বন্ধে একটু আলোচনা করে নিলে ভালো হবে।

গ্রীষ্মঋতুকে রবীন্দ্রনাথ তুলনা করেছেন মৌনীতাপস ও রুদ্রভৈরবের সঙ্গে ও এর রুদ্ররূপকে অনুভব করেছেন তপোবহ্নিশিখার ন্যায়। যে-সমস্ত গানে গ্রীষ্মের এই খররূপের বর্ণনা রয়েছে, তাকে বিশেষভাবে আশ্রয় করেছে মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্নে গেয় সারং ও মুলতান রাগ। উদাহরণস্বরূপ, 'দারুণ অগ্নিবাণে', 'চক্ষে আমার তৃষ্ণা' ও 'নাই রস নাই দারুণ দহনবেলা' গানগুলির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। আবার গ্রীষ্মের যে-সব গানে মধ্যাহ্নের এই রুদ্র ও খর রূপ প্রাধান্যলাভ করেনি তাতে অনেক সময়েই সন্ধ্যায় ও রাত্রিতে গেয় ইমন, হাম্বীর, কেদার—এইসব রাগ ব্যবহার করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, 'এসো এসো হে বৈশাখ', 'তৃষ্ণার জল এসো এসো হে', 'মধ্যদিনে যবে গান বন্ধ করে পাখি', 'বৈশাখ হে মৌনী তাপস' গানগুলির কথা উল্লেখ করা যায়।

'বৈশাখের এই ভোরের হাওয়া', 'মধ্যদিনের বিজন বাতায়নে' গ্রীষ্মের এই দুটি গান বিশেষ স্বাতন্ত্র্যের দাবী করে, কারণ এগুলি ঋতুকালীন-প্রেমসংগীতের

পর্যায়ে পড়ে। 'প্রখর তপনতাপে' গানটি রাগ-মিশ্রণের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ, কারণ এতে ভীমপলশ্রী, পটদীপ, মুলতান ও ভৈরবী—এই ৪টি রাগের মিশ্রণ ঘটেছে ও এর সম্বন্ধে আগেই বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আর এটি বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, কবিকে গ্রীষ্মের গানে সাধারণত ভোরের বা সকাল বেলাকার রাগ ব্যবহার করতে দেখা যায় না।

শীতঋতুকে রবীন্দ্রনাথ শুষ্ক আসনে আসীন সন্ন্যাসীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। শীতের যে ক'টি গান রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন তার প্রায় সব ক'টিতেই শূন্যতার বর্ণনা (অবশ্য 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে' গানটি ছাড়া)। শীত ঋতুরও অধিকাংশ গানে সন্ধ্যায় ও রাত্রিতে গেয় রাগ ব্যবহৃত হয়েছে, কারণ রবীন্দ্রনাথের কাছে শীত যেন কুহেলী ও কুয়াশায় সমাচ্ছন্ন অপরাহ্ণ বা সন্ধ্যা।

'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে' গানটিতে যেন শীতে পল্লী অঞ্চলে অনুষ্ঠিত। 'নবান্ন' উৎসবের কথাই রবীন্দ্রনাথ বলতে চেয়েছেন ও সেজন্য পল্লী অঞ্চলেব সেই প্রাণচাঞ্চল্যপূর্ণ উৎসবের রূপ দেবার জন্যে বোধহয় ছন্দবহুল লোক সংগীতের সুরে এই গানটি বেঁধেছেন।

হেমন্তঋতুর নিজস্ব বিশেষ কোনো প্রাকৃতিক স্বাতন্ত্র্য নেই, এজন্যে বোধহয় কবিগুরু এই ঋতুর উপর বেশী গান রচনা করেননি ও এই ঋতুর গানেও সন্ধ্যা বা রাত্রের গেয় রাগ-রাগিণীই বেশী ব্যবহৃত হয়েছে।

শীতের পুরানো আচ্ছাদন ঘুচিয়ে বসন্তঋতুর প্রবেশ—শীতের জড়তা তারই স্পর্শে চঞ্চল হয়ে ওঠে ও কেটে যায়, সেজন্যে বসন্ত নবযৌবনের ঋতু।

বসন্ত মিলনদিনের ঋতু। তবে বিরহ আর মিলন আকাঙ্ক্ষা যে বসন্তে একেবারে নেই তা নয়। তবুও আনন্দ ও উচ্ছলতাই এই ঋতুর বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথের বসন্তঋতুর গানে তার স্পর্শ আমরা পাই ; যথা,

'নববসন্তের দানের ডালি এনেছি তোদেরই দ্বারে
আয় আয় আয়
পরিবি গলার হারে'

বা,

'এস এস বসন্ত ধরাতলে
আনো মুহু মুহু নব তান, আন নব প্রাণ নব গান।'

বসন্তকে কবি নবযৌবনের ঋতু বলেছেন। গীতিনাট্য 'নবীন' নামটিও এই দিক দিয়ে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু পরিণামহীন আনন্দ লক্ষ্যহীন যৌবনের প্রকাশ কবিকে পরিতৃপ্ত করতে পারে না। তাই এই যুগে বসন্তঋতুর উপর ভিত্তি করে রচিত বসন্ত ও ফাল্গুনী নাটকে আমরা বসন্তের প্রৌঢ় পরিণতির রূপ প্রকাশ পেতে দেখি।

বসন্ত নাটক দ্রষ্টব্য :

রাজা। এ জীর্ণ বসন পরে শুকনো পাতা ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে ? ওতে তো নবীনের

রূপ দেখলুমনা। ও তো মূর্তিমান পুরাতন।

কবি। তবে তো চিনতে পারেননি, ঠকেছেন, আমাদের ঋতুরাজের যে গায়ের কাপড়খানা আছে তার একপিঠ নতুন, একপিঠ পুরাতন। যখন উলটে পরেন তখন দেখি শুকনো পাতা ঝরাফুল, আবার যখন পালটে নেন তখন সকাল-বেলাকার মল্লিকা, সন্ধ্যাবেলার মালতী, তখন ফাল্গুনের আম্রমঞ্জরী, চৈত্রের কনকচাঁপা।

ফাল্গুনী নাটকেও এই ভাবটি কবি অন্যভাবে ব্যক্ত করেছেন: "প্রৌঢ়দেরই যৌবনটি নিরাসক্ত যৌবন। তারা ভোগবতী পার হয়ে আনন্দলোকের ডাঙা দেখতে পেয়েছে। তারা আর ফল চায়না, তারা ফলতে চায়।"

এই তত্ত্বটুকুও বসন্ত ও নবীন নাটকে নানা গানের মধ্যে দিয়ে উপস্থাপিত করেছেন। যেহেতু এই নাটকগুলিতে বসন্তঋতু ও তার উচ্ছলতার বর্ণনা প্রাধান্য পায়নি, সেজন্যে তিনি এইসব নাটকের গানের সুরারোপে বসন্তঋতুর গানে ব্যবহার্য রাগ রাগিণীর, যথা—বাহার বসন্ত রাগে আর আবন্ধ নন। তাই এই-সব নাটকে ভৈরবী, পিলু, ইমন, কাফি—এইসব রাগ, দক্ষিণী ভাঙা গান, ঠুংরী ভাঙা গান, লোকসংগীতের ও কীর্তনের সুর সব-কিছু ব্যবহৃত হয়েছে ও এইসব বিচিত্র উপকরণ ব্যবহার করে তিনি তাঁর এই বসন্তঋতুর নাটক সাজিয়েছেন। এটি লক্ষ্য করবার বিষয় যে কবি তাঁর শেষদিককার রচিত ঋতুসংগীতে আর নিছক ঋতুর বর্ণনা করেননি—বসন্তঋতুর গানের মাধ্যমে তাঁর কিছু বক্তব্য রেখেছেন, সেজন্যে এইসময়কার ঋতুসংগীত বিশেষ কোনো রাগ-রাগিণীর বা অঙ্গিকের মধ্যেই আর আবন্ধ নয়। তবে নিঃসন্দেহে বলা চলে যে এই যুগে ও সাধারণভাবে তাঁর ঋতুসংগীতের উপর বর্ষাঋতুরই প্রাধান্য শুধু আয়তনেই নয়, গভীরতায়ও। তাঁর বর্ষার গানে বর্ষার যে কত বিচিত্র রূপ প্রকাশ পেয়েছে তার সীমা নেই। কখনো 'নবযৌবনা বরষা', 'ভুবন ভরসা' কখনো 'নীল অঞ্জন ঘন পুঞ্জ ছায়ায়' তার প্রশান্ত ও গম্ভীর রূপ। কখনো বর্ষা নারীরূপিণী, আবার কখনো তার কঠোর রূপ 'বজ্রমানিক দিয়ে গাঁথা', কখনো বর্ষার গানে কবি বৈষ্ণবকাব্যের পরিবেশে বিহার করেছেন, আবার কিছু বর্ষার গানে তাঁর কালি-দাসের যুগে মানসিক প্রস্থানের ইচ্ছাও প্রকাশ পেয়েছে। কখনো বর্ষাকে কবি তাঁর গানে বিরহ, প্রত্যাশা ও ব্যাকুলতার প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছেন, আবার কখনো তাঁর গানে বর্ষা আনন্দ ও উল্লাসের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত।

এই যুগে কবি যেন প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছেন ও এর ফলে অনেক ঋতুসংগীতে আমরা প্রকৃতির বর্ণনা ছাড়াও প্রাকৃতিক পরিবেশে মনের যে অনুভূতি প্রকাশ পায়, মুখ্যত তারই বর্ণনা পাই তাঁর গানে। উদাহরণস্বরূপ, এই যুগে মিশ্র কাফি রাগে রচিত 'অশ্রুভরা বেদনা' বর্ষাসংগীতটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই গানটিতে বর্ষাঋতুর প্রাকৃতিক বর্ণনার চেয়ে বর্ষার প্রভাবে মানবমনের যে অভিব্যক্তি, তাই প্রকাশ পেয়েছে। এই-

ভাবে তাঁর শেষযুগের ঋতুসংগীত আর শুধু ঋতুসংগীত থাকেনি, সেগুলি অপূর্ব কাব্যমণ্ডিত মানবসংগীতে পরিণত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, বেহাগে 'আজি তোমায় আবার চাই শুনাবারে', 'আজি গোধূলি লগনে', মুলতানে 'শেষ গানেরি রেশ নিয়ে যাও', বাগেশ্রীতে 'যখন গহন রাত্রি' প্রভৃতি বর্ষাসংগীতগুলির কথা উল্লেখ করা যায়। যেহেতু এইসব গানে নিছক ঋতুর বর্ণনাকে অতিক্রম করে ঋতুর প্রভাবে মানবমনের নানা অনুভূতির প্রকাশই প্রাধান্য পেয়েছে, সেজন্যে কবি আর বর্ষাঋতুর জন্য নির্দ্দিষ্ট রাগ-রাগিণীতে আবদ্ধ থাকার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেননি। আর এইসব গানের মূল লক্ষ্য হচ্ছে কথা ও সুরের সার্থক সমন্বয়। সেইদিকে লক্ষ্য রেখেই তিনি ইমনে, বেহাগে, বাগেশ্রীতে বর্ষার গান রচনা করতে দ্বিধাবোধ করেননি।

এখানে প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথের কী স্বাতন্ত্র্য ছিল, তা তাঁর শেষযুগের ঋতুসংগীতে বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এখানে সে-সম্বন্ধে একটু আলোচনা করে নিলে ভালো হবে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রকৃতিপ্রেমে পাশ্চাত্য ও ভারতীয় উভয় ভাবধারা দ্বারা প্রভাবান্বিত হলেও তাঁর প্রকৃতিপ্রেমে একটা বিশেষ স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়।

প্রাচীন ভারতীয় দৃষ্টিতে প্রকৃতি এবং মানুষ সৃষ্টিকর্তারই প্রকাশ এবং সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে অভিন্নতাই উভয়ের প্রতি উভয়ের আকর্ষণের প্রধান কারণ। কিন্তু পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রকৃতির প্রতি মানুষের ভিন্নজাতীয় সত্তার প্রতি আকর্ষণ এবং পাশ্চাত্য কবি প্রকৃতিকে স্বতন্ত্র সত্তা রূপেই উপভোগ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী এই দুই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে কিছুটা ভিন্নতর। তিনি প্রকৃতিকে স্বতন্ত্র রূপে কল্পনা করে তাকে যেমন উপভোগ করেছেন, বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে প্রকৃতিকে স্থাপন করে তেমনি তাকে উপলব্ধি করেছেন। এই দুটির কোনোটিই তাঁর কাছে কম সত্য নয়।

কিন্তু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সকল কবির চেয়ে প্রকৃতিপ্রেমের আদর্শে রবীন্দ্রনাথের যে প্রভেদ সবচেয়ে বড়ো, সে হলো প্রকৃতির সঙ্গে অচ্ছেদ্য ও নিবিড় সম্পর্কের উপলব্ধির গভীরতায় ও প্রকৃতিতে আত্মবিলুপ্তিতে। এই যুগে কবি আর প্রকৃতি এক ও অভিন্ন হয়ে যাওয়ার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন বলা চলে ও তিনি আকাশের সঙ্গে এক হয়ে গেয়ে ওঠেন :

> 'আজ আকাশের মনের কথা ঝরো ঝরো বাজে
> সারা প্রহর আমার বুকের মাঝে'

শুধু তাই নয়, আপন মনের মাধুরী দিয়ে প্রকৃতিকে মাধুর্যমণ্ডিত করে তোলার মনোভাবে রবীন্দ্রনাথ প্রায় একক ও অনন্য। তাঁর গানে প্রকৃতির মধ্যে নিজের আশা, আনন্দ বা দুঃখবেদনাকে সঞ্চারিত বা ছড়িয়ে দিয়ে তাকে উপলব্ধি ও অনুভব করার উদাহরণও আছে :

'আমি শ্রাবণ আকাশে ওই দিয়েছি পাতি
মম জল ছলোছলো আঁখি মেঘে মেঘে।'

এইসময়কার তাঁর ঋতুসংগীতে যে এই বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধতা, তার মূলে কাজ করেছে শান্তিনিকেতনের প্রাকৃতিক পরিবেশ। শান্তিনিকেতনের প্রাকৃতিক আবেষ্টনী তাঁকে ঋতুসংগীত রচনার উপযুক্ত প্রেরণা যুগিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন: "আর কোনোখানেই শান্তিনিকেতনের মতো ঋতুর লীলারঙ্গ দেখিনি। তারই সঙ্গে মনের ভাষায় উত্তর প্রত্যুত্তর কিছুকাল থেকে আমার চলেছে।

এই উত্তর-প্রত্যুত্তরের পালা তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত চলেছিল। প্রতি-বৎসর শান্তিনিকেতনে বর্ষামঙ্গল, শেষবর্ষণ, শারদোৎসব, বসন্ত-উৎসব—এই উত্তর-প্রত্যুত্তরেরই ফসল।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক প্রমথনাথ বিশী তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের সংগীতসৃষ্টিতে শান্তিনিকেতনের প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব সম্বন্ধে বলেছেন: "শান্তিনিকেতনের প্রকৃতি রবীন্দ্রকাব্যের টীকাকার। এখানকার আকাশ-বাতাসের সঙ্গে রবীন্দ্রকাব্য মিলাইয়া লইলে তবেই তাহার সঠীক সংস্করণ হওয়া সম্ভব। আর স্বয়ং বিশ্বপ্রকৃতি সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যের মল্লিনাথ, সে ফুলে ফলে লতায় পাতায় মেঘে মেঘে বনে বনে ঋতুতে ঋতুতে রবীন্দ্রকাব্যের সঞ্জীবনী টীকা লিখিয়া চলিয়াছে। কবির লেখনী থামিয়াছে কিন্তু টীকাকারের কোনোদিন থামিবার উপায় নাই।

"শান্তিনিকেতনের অবারিত প্রান্তর ও দিক বিনত আকাশ একজোড়া যুক্ত খঞ্জনীর মতো পড়িয়া আছে। এই খঞ্জনীর তালে তালে চল্লিশ বৎসরের উপর এখানে বিশ্বকবির কণ্ঠ ধ্বনিত হইয়াছে, বিশ্বকবির কণ্ঠ আর সেই কণ্ঠের দোহার ছয় ঋতুর ছয় রাগ আর ছত্রিশ রাগিণী।'

এই যুগে কবির গানের প্রকৃতি আর শান্তিনিকেতনের প্রকৃতি একই তালে বাঁধা পড়ল। কবি লিখলেন: "অনেকদিন আছি শান্তিনিকেতনে। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্যে অবশ্য গিরিনদীর আয়োজন নেই··· ।

"এখানকার দৃশ্য আয়োজনের বিরলতায় আমাকে বিশেষ আনন্দ দেয়। সকাল বিকাল মধ্যাহ্ন এই অবারিত আকাশে আলোছায়ার তুলিতে কত রকমের সূক্ষ্ম রঙের মরীচিকা এঁকে যায়। আমার মিতভোগী অক্লান্ত চোখের ভিতর দিয়ে আমার মন তার সমস্তটার স্বাদ পুরোপুরি আদায় করে। এখানকার বাধাহীন আকাশ-সভায় বর্ষা, বসন্ত, শরৎ তাদের ঋতুবীণায় যে গভীর মীড়গুলি দিতে থাকে, তার সমস্ত সূক্ষ্ম শ্রুতি কানে এসে পেঁছয়। এখানে রিক্ততা আছে বলেই মনের বোধশক্তি অলস হয়ে পড়েনা, অথবা বাইরের চাপে অভিভূত হয়না।"

সেই অশ্রুত শ্রুতিলিপিকে ভরিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষের গানগুলি বেঁধেছিলেন ও রবীন্দ্রসংগীতের স্বাভাবিক নিখুঁত রূপই যেন শান্তিনিকেতনের পরিবেশে, বিশেষ করে এই যুগে রচিত তাঁর ঋতুসংগীতের মাধ্যমেই সবচেয়ে

ভালো ভাবে ফুটে উঠবার সুযোগ পেলো।

কবির সংগীতসৃষ্টির এই যে গতি বা বিবর্তন যা তাঁকে ক্রমে ক্রমে আরো মানব ও প্রকৃতিমুখী করে তুলেছিল তা শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী তাঁর গ্রন্থ 'রবীন্দ্রনাথ—গৃহে ও বিশ্বে' এইভাবে ব্যক্ত করেছেন :

"কবির নিজের জীবনের গতির সঙ্গেও সংগীতগতি সমরেখায় প্রবাহিত। যে কবি অল্পবয়সে ব্রহ্মসংগীতের গান লিখেছিলেন তিনিই বৃদ্ধবয়সে প্রকৃতির গান লিখলেন অজস্র। বসন্তের বনমর্মর শোনা গেলো তাঁর পরিণত বয়সের গানেই বেশী। যে ধরনের ঈশ্বরোপাসনার আবহাওয়ায় তিনি অল্পবয়সে মানুষ হয়েছিলেন, ক্রমেই তাঁর মত বিশ্বাস ও ধারণা তার থেকে সরে গেলো—তাঁর বন্দনার প্রকৃতি গেলো বদলে। তা আরও মানবমুখী ও বিশ্বসৌন্দর্যে আবিষ্ট হল।"

নৃত্যনাট্য

নেপথ্যে গান ও দৃশ্যত নাচের মাধ্যমে মঞ্চস্থ করে নৃত্যনাট্যের বিষয়বস্তু পরিস্ফুট করা হয়। শাস্ত্রে উল্লিখিত সংগীত শব্দের অর্থ নৃত্যনাট্যে গীত বাদ্য ও নৃত্যের সমন্বয়ে অভিব্যক্ত হয়।

নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদার বিজ্ঞপ্তিতে এইরূপ উল্লেখ আছে: "এই গ্রন্থের অধিকাংশই গানে রচিত এবং সে গান নাচের উপযোগী। এ কথা মনে রাখা কর্তব্য যে এইজাতীয় রচনায় স্বভাবতই সুর ভাষাকে বহুদূরে অতিক্রম করে থাকে এই কারণে সুরের সঙ্গ না পেলে এর বাক্য ও ছন্দ পঙ্গু হয়ে থাকে। কাব্য আবৃত্তির আদর্শে এই শ্রেণীর রচনা বিচার্য নয়। যে পাখীর প্রধান বাহন পাখা, মাটির উপর চলার সময় তার অপটুতা অনেক সময় হাস্যকর বোধ হয়।" কবির জীবনের প্রায় শেষপর্বে এই বিস্ময়কর সৃষ্টি নৃত্যনাট্যগুলি রচিত হয়েছিল। সাধারণভাবে এগুলি আগের রচিত কোনো কাব্য বা নাটকের পরিবর্তিত রূপ। এগুলি হলো সংগীত, নৃত্য, অভিনয় এবং সর্বোপরি মঞ্চসজ্জা এবং নাট্য-পরিবেশনার নিপুণ সম্মিলনের এক অপূর্ব পরিণত ফসল।

মুখ্যত চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা ও শ্যামা—এই ৩টি নাটককেই নৃত্যনাট্য নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে, যদিও অনেকে বলে থাকেন নটীর পূজা নাটকের শেষ দৃশ্যে শ্রীমতীর গাওয়া 'আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো নমো হে নমো' গানের সঙ্গে নাচের দৃশ্যেই নাকি নৃত্যনাট্যের সূচনা হয়। যাক, এই ৩টি নাটককে নৃত্যনাট্য বলার প্রধান কারণ হলো, এই ক'টি নাটকের সংগীতাংশ নৃত্যের বাঁধা ছন্দের ভিত্তিতে রচিত।

দেখা যায় যে রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য, হয় কবির একেবারে প্রথমজীবনের, নয়তো জীবনের শেষপর্বের রচনা। এর ফলে এইসব নাটকের গানের মধ্যে আমরা দুইটি যুগের সংগীতরচনা ও সুরযোজনার বৈশিষ্ট্যের

পরিচয় পাই। তাঁর অন্যান্য ধারার গানের মতো গীতিনাট্যের গানগুলিতে সেযুগের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী বহু হিন্দী ভাষা ও পাশ্চাত্য সুরের গানের সমাবেশ দেখতে পাই ও এদের রচনায় কবির পূর্বসূরীদের, বিশেষ করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। শেষযুগে রচিত নৃত্যনাট্যের গানগুলি কিন্তু ভিন্নধর্মী।

নৃত্যকে আঙ্গিকের দিক দিয়ে ততটা নয়, কিন্তু প্রেরণার দিক থেকে পরিপূর্ণ রূপে সংগীতের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়ে নাট্যরসসৃষ্টির প্রয়াস নৃত্যনাট্যগুলিকে একটা স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছে।

এই প্রসঙ্গে শান্তিনিকেতনে প্রবর্তিত নৃত্যকলা নিয়ে একটু আলোচনা করে নিলে, এইসকল নৃত্যনাট্যের নৃত্য-পরিকল্পনার দিকে দিয়ে বৈশিষ্ট্য বুঝতে আমাদের সুবিধে হবে।

রবীন্দ্রনাথ নৃত্যকলা ও সংগীতের মধ্যে একটা যোগসূত্র স্থাপন করেছিলেন তাঁর বিভিন্ন সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে এবং বহুক্ষেত্রেই এই দুটি শিল্পকলা পারস্পরিক ভাবে নির্ভরশীল।

একটা প্রশ্ন উঠতে পারে যে রবীন্দ্রনাথ এদেশে প্রচলিত ভরতনাট্যম, কথাকলি, মণিপুরী ও কত্থক ছাড়াও শান্তিনিকেতনে আর একটি স্বতন্ত্র ধারার নৃত্য-শৈলীর প্রবর্তন করেছিলেন কিনা। এর উত্তরে বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথ কথাকলি, মণিপুরী ও কথ্যক এই ৩টি ভারতীয় নৃত্যধারা ও সিংহলের ক্যাণ্ডি ও জাভার কিছু নাচের সমন্বয়ে একটি নৃত্যধারার সৃষ্টি করেছিলেন, যাকে আমরা শান্তিনিকেতনী ধারার নৃত্যপদ্ধতি বলতে পারি। এই বিষয়ে প্রতিমা দেবী বলেছেন : "শান্তিনিকেতনের নাচে বাজনার বৈচিত্র্য তেমন হয়নি তার কারণ গুরু-দেবের সংগীত ও সুর বাজনার অভাব পুরিয়ে দেয়। তাছাড়া বাজনার অভাবে বা আধিক্যে গানের কথা অর্থাৎ বিষয়বস্তু চাপা পড়ে যাবার আশঙ্কাও আছে। এখানে তাঁর সুরের ও গানের সঙ্গে প্রাচীন নৃত্যের এক অভাবনীয় মিলন হয়েছে। এই ত্রিবেণী-সঙ্গমের ধারা এবং নৃত্য নতুন রসসৃষ্টির পথটিকে অনুসরণ করে। এই সংগীত ও নৃত্যে অপূর্ব ঐক্য, এখানে কেউ কাউকে পূর্ণ প্রকাশের পথে বাধা না দিয়ে নিজের পরিধি ও শক্তির মধ্যে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করেছে।··· বাংলার নতুন চিত্রকলা যেমন ভারতের চিত্রাঙ্কন পদ্ধতির সুর ফিরিয়ে দিয়ে চারুশিল্পজগতে নতুন প্রাণ সঞ্চার করল বাংলার বা শান্তিনিকেতনের নাচ সেই একই কাজ করেছে নৃত্যকলা জগতে।"

মণিপুরী নৃত্যকলা ভাবপ্রকাশের বাহক—বীর্য ও শক্তি প্রকাশ করার সুযোগ এতে নেই। কথাকলির বৈশিষ্ট্য হলো শক্তি ও তেজস্বিতার বিকাশ, আর কত্থকের বৈশিষ্ট্য হলো ছন্দব্যঞ্জনা। ১৯৩৮ সালে শ্যামা নৃত্যনাট্যের পরিবেশনে ভারতের এই ৩টি নৃত্যধারার সমন্বয় দেখা গিয়েছিল। এই নৃত্যনাট্যে বজ্রসেন ও প্রহরীর অভিনয় হয়েছিল কথাকলির পদ্ধতিতে, উত্তীয় পরিবেশন করলো কত্থক আর শ্যামা

ও সখীর দল অভিনয় করলো মণিপুরী নৃত্যকল্যয় আদর্শে। তাছাড়া চণ্ডালিকায় একটি দক্ষিণী তালের নাচের কথা ভেবে লিখেছিলেন 'আমার মালার ফুলের দলে আছে' গানটিও ঐ নৃত্যনাট্যে সিংহলের ক্যাণ্ডিনাচের তালে রবোলের সংগে মিলিয়ে আর একটি গান বেঁধেছিলেন 'যে আমারে এনেছে অপমানের অন্ধকারে'।

এই স্বল্পসংখ্যক নৃত্যনাট্য রচনা দ্বারা তিনি শুধু বাংলা সাহিত্যেই নয়, ভারতীয় কাব্য নাটক নৃত্য ও সুরযোজনার ক্ষেত্রে একটি নতুনতর পথের ইংগিত দিয়ে গেছেন। " 'নৃত্যনাট্য' কথাটি যেমন তাঁরই উদ্ভাবিত, 'নৃত্যনাট্য' রূপে নতুন সাহিত্যসৃষ্টিও তাঁরই প্রতিভার দান। আঙ্গিকের সীমানা ছাড়িয়ে এগুলিতে নৃত্যকে তিনি চলমান শিল্প রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। নৃত্যকে তিনি 'দেহভংগীর সংগীত' বলে উল্লেখ করেছেন। অভিনয় করার মধ্যে এই দেহভংগীর সংগীতকে সমন্বিত করার প্রকাশের শ্রেষ্ঠ বাহন কণ্ঠের সংগীতকে তিনি পরিপূর্ণ মর্যাদায়ই রক্ষা করেছেন। শিল্পের তিনটি বাহনের এই সম্মিলনে তাঁর নৃত্যনাট্যগুলি রচিত হয়েছে।" —'সুরের গুরু', অমিয় সেন ও নীলিমা সেন।

এই ক'টি নৃত্যনাট্যের মধ্যে চিত্রাংগদা রচিত হয় প্রথম। কী জীবনদর্শন থেকে এই নাটকের পরিকল্পনা—রবীন্দ্রনাথ তা এইভাবে ব্যক্ত করেছেন : "অনেক বছর আগে রেলগাড়িতে যাচ্ছিলুম শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতার দিকে। তখন বোধ করি চৈত্র মাস হবে। রেললাইনের ধারে ধারে আগাছার জংগল। হলদে, বেগনি, সাদা রঙের ফুল ফুটেছে অজস্র। দেখতে দেখতে এই ভাবনা এল মনে যে আর কিছু কাল পরেই রৌদ্র হবে প্রখর, ফুলগুলি তার রঙের মরীচিকা নিয়ে যাবে মিলিয়ে—তখন পল্লীপ্রাংগণে আম ধরবে গাছের ডালে ডালে, তরু প্রকৃতি তার অন্তরের নিগূঢ় রস সঞ্চয়ের স্থায়ী পরিচয় দেবে আপন অপ্রগল্‌ভ ফলসম্ভারে। সেই সংগে কেন জানি হঠাৎ আমার মনে হল সুন্দরী যুবতী যদি অনুভব করে যে সে তার যৌবনের মায়া দিয়ে প্রেমিকের হৃদয় ভুলিয়েছে তা হলে সে তার সুরূপকেই আপন সৌভাগ্যের মুখ্য অংশে ভাগ বসাবার অভিযোগে সতিন বলে ধিক্কার দিতে পারে। এ যে তার বাইরের জিনিস, এ-যেন ঋতুরাজ বসন্তের কাছ থেকে পাওয়া বর, ক্ষণিক মোহ বিস্তার দ্বারা জৈব উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্যে।···

"এই ভাবটাকে নাট্য আকারে প্রকাশ-ইচ্ছা তখনই মনে এল, সেই সংগেই মনে পড়ল মহাভারতের চিত্রাংগদার কাহিনী···।"

✓'চিত্রাংগদা' নৃত্যনাট্যে আগের রচিত কিছু গান ও কথা বদলে কিছু পুরানো গান এতে স্থান পেয়েছে।

'শাপমোচন' নাটকটিকেও বাঁধা হয়েছিল এরূপ আগের রচিত গান জুড়ে ও চিত্রাংগদা নৃত্যনাট্যেও মনে হয় যেন শাপমোচনের সেই রেশ রয়ে গেছে।

আগেকার রচিত গানের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় 'ওরে ঝড় নেবে আয়' ও 'কেটেছে একেলা বিরহের বেলা' গান দুটির কথা। শেষের গানটি রচিত

হয়েছিল শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গুপ্তের বিবাহ উপলক্ষে।

আর কথার বদল করে আগেকার দেওয়া সুরের যে-সমস্ত গান এই নাটকে ব্যবহৃত হয়েছে তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় :

'আমার এই রিক্ত ডালি'—পুরানো গান ছিল 'বাকি আমি রাখবোনা' ;

'অশান্তি আজ হানল'—এই সুরে আগেব গান ছিল 'বসন্তে ফুল গাঁথল'।

'বঁধু কোন মায়া লাগল চোখে' বদলে রচিত হলো 'কোন আলো লাগল চোখে' ; 'আমি কি বলে করিব নিবেদন' বদলে এই নাটকে ব্যবহৃত হলো 'আমি তোমারে করিব নিবেদন' গানটি। ইন্দিরা দেবীর মতে এই নাটকের 'ক্ষমা কর আমায়' গানটির সুর নেওয়া হয়েছে 'জয় জয় ব্রহ্মন্ ব্রহ্মন্' নামক অতি পুরানো ব্রহ্মসংগীত থেকে।

এই নাটকে অর্জুনের নাচ পরিবেশিত হয় কথাকলির ভংগীতে ও চিত্রাঙ্গদার বেশীর ভাগ নাচ পরিবেশিত হয় মণিপুরী পদ্ধতিতে ; তবে কোনো কোনো জায়গায় কথাকলির নাচ আছে—যথা, চিত্রাঙ্গদার শিকারী নৃত্যে। 'বঁধু কোন আলো লাগল চোখে' গানটিব সংগে মণিপুরী নাচ প্রযুক্ত হয়, তবে এই গানটির লয় যেখানে মন্থর সেখানে নাকি জাভা-নৃত্যের প্রয়োগ করা হতো বলে শোনা যায়।

চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যে কিছু গদ্যছন্দের আবৃত্তি আছে যা পরে নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা ও শ্যামাতে আর ব্যবহৃত হয়নি।

এই নৃত্যনাট্যের জন্য কবিগুরু যে নতুন গান রচনা করেছিলেন তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে কীর্তনাঙ্গ বিরহসংগীত 'রোদন-ভরা এ বসন্ত' ও নতুন সৌন্দর্যলাভের পর চিত্রাঙ্গদার বিস্ময়মুগ্ধ সংগীত 'আমার অংগে অংগে কে বাজায়' গান দুটি। 'শুনি ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে' গানটিও বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।

শোনা যায় যে চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যের রিহার্সালের সময়ে প্রথমদিকে মায়ার খেলা গীতিনাট্যের 'সখী বহে গেল বেলা' গানটি রাখা হয়েছিল। পরে এই গানের বদলে 'রোদন-ভরা এ বসন্ত' গানটি স্থান পায়। এটিকে সাহিত্য, সংগীত ও নৃত্যের একটি সার্থক সমন্বয় বলা চলে। এই গানটি শুনলেই সংগে সংগে চিত্রাঙ্গদার বিরহতাপিত হৃদয়ের নৃত্যভংগীটি যেন আমাদের চোখের সামনে এসে উপস্থিত হয়।

বেহাগে রচিত ও এই নৃত্যনাট্যে প্রযুক্ত 'আমার অংগে অংগে কে বাজায়' গানটিতেও সাহিত্য, সংগীত ও নৃত্যের এক বিরল সমন্বয় ঘটেছে। তাই গানটির

রচনা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষ তাঁর ‘রবীন্দ্রসংগীত’ গ্রন্থে লিখেছেন : “চিত্রাঙ্গদা গীতিনাট্যের রচনা নিয়ে যখন তিনি মেতে আছেন সেই সময় একদিন অতি প্রত্যূষে ডাক পড়ল······বললেন একটি গান তাঁর মাথায় হঠাৎ ঘুমের মধ্যে মাঝরাতে এসেছিল, কিন্তু সেই যে ঘুম ভাঙল আর সারারাত ঘুমুতে পারেননি। গানের সুর ও অমার্জিত তার ভাষা নিয়ে সারারাত কাটালেন। সকালে বিছানা ত্যাগ করে তার পরে কাগজে কলমে তাকে লিখেছেন। দুঃখ করে বললেন, রাত্রে গানটি তাঁর মাথায় বেশ পরিষ্কার ছিল, সকালে নানা বাধায় একটু এদিক ওদিক হয়েছে সুরে। গানটি হল, ‘আমার অঙ্গে অঙ্গে কে বাজায় বাঁশী’।”

চিত্রাঙ্গদার পর চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্য রচিত হয়। এটি গদ্যনাটক চণ্ডালিকার পরিবর্তিত রূপ। অস্পৃশ্য চণ্ডালীকন্যার বুদ্ধবাণীতে অনুপ্রাণিত হবার কাহিনী এই নাটকের মাধ্যমে উপস্থাপনা করা হয়েছে ও এর কাহিনী বৌদ্ধ সাহিত্য থেকে নেওয়া হয়েছে। নৃত্যভঙ্গীর সঙ্গে সংগীতের পরিপূর্ণ সমন্বয় এই নাটকে ঘটেছে। চণ্ডালিকার কিছু গান সংলাপের গদ্যভঙ্গীর সুরে বাঁধা হয়েছে। ছন্দ বজায় রেখে গদ্যধর্মী সংলাপ—সংগীতে এইপ্রকার দুঃসাহসিক ও অসাধারণ প্রচেষ্টা রবীন্দ্রনাথের পর আর কারো দ্বারা সম্ভব হয়েছে বলে আমরা জানিনে। উদাহরণস্বরূপ চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্যের দ্বিতীয় দৃশ্যের একটি গদ্য-গানের উল্লেখ করা যেতে পারে :

“···সেদিন বাজল দুপুরের ঘণ্টা, ঝাঁ ঝাঁ করে রোদ্দুর, স্নান করাতেছিলাম কুয়োতলায় মা-মরা বাছুরটিকে। সামনে এসে দাঁড়ালেন বৌদ্ধ ভিক্ষু, আমায় বললেন, জল দাও। শিউরে উঠল দেহ আমার চমকে উঠল প্রাণ। বল দেখি মা, সারা নগরে কি কোথাও নেই জল। কেন এলেন আমার কুয়োর ধারে, আমাকে দিলেন সহসা মানুষের তৃষ্ণা মেটানো সম্মান।”

সংগীতে নাটকীয়তা—এই বিচারে চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্যের গানকে সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বশ্রেষ্ঠ বলা যেতে পারে। এই নাটকে গানে সুরের নানা প্রক্ষেপণ ও গানের গতি বা লয়ের রকমারি ঘটিয়ে যে বৈচিত্র্য ও নাট্যরসের সৃষ্টি হয়েছে তার কোনো তুলনা নেই।

সার্থক নাট্যসংগীতের দৃষ্টান্তস্বরূপ চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্যের প্রথম দৃশ্যের দুটি গানের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে :

মা :—

কী যে ভাবিস তুই অন্যমনে
নিষ্কারণে—
বেলা বহে যায় বেলা বহে যায় যে।

রাজবাড়িতে ঐ বাজে ঘণ্টা ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং
বেলা বহে যায়
...   ..   .
ত্বরা কর ত্বরা কর ত্বরা কর
জল তুলে নিয়ে তুই চল ঘর।

প্রকৃতি :—

কাজ নেই কাজ নেই মা
কাজ নেই মোর ঘরকন্নায়
যাক্ ভেসে যাক্ যাক্ ভেসে সব বন্যায়।

প্রথম গানটিতে কথায় ও সুরারোপে তাড়া দেবার একটা সুস্পষ্ট ইংগত রয়েছে ও 'ত্বরা কর ত্বরা কর' অংশে গানের দ্রুতগতি বা tempo আমরা যেন অনুভব করতে পারি। কিন্তু দ্বিতীয় গানটি এইভাবে বাঁধা হয়েছে যাতে আমরা প্রকৃতির উদাস ও বিষাদমাখা ভাবটি সুস্পষ্টভাবে অনুভব করতে পারি; গানের গতিও এখানে কিছু শ্লথ ও দুটি গানের কথা সুর, গতি (tempo)-র পার্থক্যে যেন দুজনের কর্তব্যের ও মানসিকতার বিভিন্নতা ও নাটকীয় সংঘাত স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে।

একই রাগকে রবীন্দ্রনাথ কী ভাবে বিভিন্ন ও কিছুটা পরস্পরবিরোধী নাট্য-রস সৃষ্টির কাজে ব্যবহার করেছেন তারও সার্থক উদাহরণ পাওয়া যেতে পারে চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্যের গানে।

উদাহরণস্বরূপ চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্যের প্রথম দৃশ্যে আনন্দের গাওয়া 'জল দাও আমায় জল দাও' গানটির সংগে তার উত্তরে প্রকৃতির গাওয়া 'ক্ষমা কর প্রভু ক্ষমা কর মোরে' গানটির তুলনা করতে বলি। দুটি গানই বাঁধা হয়েছে ভৈরবী রাগিণীতে ও নীচের স্বরলিপি থেকেই তা পরিস্ফুট হয়ে উঠবে।

(ক) আনন্দের গাওয়া :—

সা ণ্া II { সা -দা দা -া | পা -দা দপা মা I মা -পা -া -া
জ ল দা ও অা ০ | মা য়্ জ ল দা ও ০ ০

-া -া (সা ণ্া)} I -া -া I
০ ০ জ ল ০ ০

I ম -দা দা দা | দা দা দা পা I মা 'দা দা -া | দর্সা -ণা র্সা -া I
রৌ ০ দ্র প্র | খ র ত র প থ সু ০ | দী০ র্ ঘ ০

I সা -ঋা -গা -মা | -গা -মা -পা -দা I দা -া পা -দা | ণপা মা মা -পা I
হা ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ আ ০ মা য় | জ ল দা ও

(খ) প্রকৃতির গাওয়া :—

II র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা | র্জ্ঞা -র্রা র্জ্ঞা -া I র্জ্ঞা র্জ্ঞর্মা র্মর্জ্ঞা র্জ্ঞা | জ্ঞর্ঋা -া র্সা -া I
ক্ষ মা ক রো | প্র ০ ভু ০ ক্ষ মা০ ক রো | মো ০ রে ০

I র্সা র্সর্জ্ঞা র্জ্ঞা -র্ঋা | জ্ঞর্ঋা -া র্ঋা র্সা I না -া র্সা -া | -া -া র্সা া I
আ মি০ চ ন্ | ডা ০ লে র ক ০ ন্যা ০ | ০ ০ মো র্

I র্সা -র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞর্ঋা | জ্ঞর্ঋা -া র্ঋা র্সা I র্সা -ণা দা ণা |
ক্ ০ পে র | বা ০ রি অ শ্ ০ চি ০ |

র্সা র্সর্জ্ঞা র্জ্ঞা -র্ঋা I জ্ঞর্ঋা -া র্ঋা র্সা | না -া র্সা -া I
আ মি০ চ ন্ ডা ০ লে র | ক ০ ন্যা ০

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে আনন্দের গাওয়া গানটিতে ভৈরবী যে শান্ত ও প্রশান্ত রস ব্যক্ত করেছে, প্রকৃতির গাওয়া গানটিতে ভৈরবীর সেই শান্ত রস নেই ; চড়া গ্রামে বাঁধা, সেটা যেন একটা আর্তনাদে পরিণত হয়েছে।

আর একটি সার্থক রাগরূপায়ণের দৃষ্টান্ত হলো চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্যের তৃতীয় দৃশ্যে প্রকৃতির মায়ের গাওয়া 'জাগেনি এখনো জাগেনি' গানটি। একটু লক্ষ্য করলেই ধরা পড়বে যে বশীকরণের এই গানটি বাঁধা হয়েছে ভূপালী রাগে। অবশ্য মাঝে মাঝে এতে শুদ্ধ নিষাদের প্রয়োগ হয়েছে। বিষয়টির স্পষ্টীকরণের জন্যে এই গানের কিছু অংশের স্বরলিপি দেওয়া হলো :

II র্গা র্গা র্র্সা -া | -া -া -া -া I র্সা র্সা র্সা -া | ধা ধা পা -া I
জা গে নি০ ০ | ০ ০ ০ ০ এ খ নো ০ | জা গে নি ০

I -পা -ধা -না -ধা | পা ধা পা পা I পা পা গা -পা | গা রা সা -া I
০ ০ ০ ০ | র সা ত ল বা সি নী ০ | না 'গি নী ০

I -সা -রা -গা -পা | -ধা -র্সা -র্রা -র্গা I র্গা র্গা র্র্সা -া | -া -া -া -া I
০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ জা গে নি০ ০ | ০ ০ ০ ০

* * * * * * *

I র্গা র্গা র্গা র্গা | র্গা -া র্গা -া I -া -া -া া | -া -া -া -া I
বেঁ ধে তা রে | আ ন্ রে ০ ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০

I র্গা -র্পা র্গা -া | র্গা -র্পা র্গা -া I র্গা -র্পা র্গা -া | -া -া -া -া I
টা ন্ রে ০ টা ন্ রে ০ টা ন্ রে ০ | ০ ০ ০ ০

I র্গা -র্ধা র্ধা -র্পা | -র্গা -র্রা -র্সা -র্সা I -ধা -া -া -া | -া -া া -া I
টা ন্ রে ০ | ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ | ০০ ০ ০

ঔড়ব জাতীয় রাগ ভূপালী রাগের গা ও নি বর্জিত স্বরের জন্য অনেকটা লাফিয়ে লাফিয়ে চলে ; রাগের এই লাফিয়ে চলার ও স্বরের উলঙ্ঘনের গতিভঙ্গী ও প্রকৃতিকে রবীন্দ্রনাথ অদ্ভুত নৈপুণ্যের সঙ্গে এই গানে প্রয়োগ করেছেন যাতে গানটির স্বররূপের মধ্যে যেন উচাটন-বশীকরণ মন্ত্রের এক অদ্ভুত রস ও শক্তি ফুটে উঠেছে এবং গানটি শুনলেই যেন আমরা এরূপ অশুভ ও পাশব শক্তির প্রচণ্ড আকর্ষণ ও দুর্বার শক্তি অনুভব করতে পারি।

চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্যের গানে নাটকীয়তা প্রাধান্য পাওয়ায় এই নাটকের গান যে-সব শিল্পী পরিবেশন করবেন তাঁদের শুধু সুকণ্ঠ হলেই চলবে না, তাঁদের

নাট্যবোধও থাকতে হবে। তা না হলে এইসমস্ত গানের সফল রূপদান করা কখনই সম্ভব হবে না।

চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্যে অভিনয়ের প্রাধান্য থাকায় এতে কথাকলি ধারার নৃত্য বেশী ব্যবহার করা হয়েছে।

নৃত্যনাট্য হিসেবে চণ্ডালিকা চিত্রাঙ্গদার থেকে অনেকটা পরিণত ও এর গান প্রায় সবই এই নাটকের জন্যে কবিকে সৃষ্টি করতে হয়েছিল; পুরানো গান এতে খুব একটা বিশেষ স্থান পায়নি।

সর্বশেষে নৃত্যনাট্য শ্যামা রচিত হয়। অবশ্য এই নৃত্যনাট্যটি আগে রচিত পরিশোধ নাটকের পরিবর্তিত রূপ।

আগের দুটি নৃত্যনাট্যে হয়তো কিছুটা দার্শনিক তত্ত্ব বা বক্তব্য আছে। কিন্তু শ্যামা নিছক প্রেমের কাহিনী। সুর, ছন্দ ও বাণী—এই ত্রিবেণী-সঙ্গমে রচিত এই নৃত্যনাট্যকে আমার মতে রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যের সবচেয়ে পরিণত রূপ বলা চলে। পরিশোধ নৃত্যনাট্যকে পরিমার্জনা করে রচিত এই নৃত্যনাট্যে অভিনয়ের সঙ্গে নৃত্যের পরিপূর্ণ সমন্বয় ঘটেছে। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত শৈলজারঞ্জন মজুমদারকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি বিশেষ প্রাসঙ্গিক হবে বলে তার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হলো: "পরিশোধকে প্রধানত অভিনয়মূলক নাটক বলে ব্যবহার করা যায় কেননা সমস্ত আখ্যানটাই নাট্যপ্রধান। পরিশোধেই আমাদের নাচের সঙ্গে নাট্যের যথার্থ মিলন হয়েছিল। এজন্যে দক্ষিণী নাচিয়ে অনেক সাহায্য করেচে।"

গদ্যধর্মী ও সংলাপভঙ্গী গান এই নাটকেও ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু মাঝে মাঝে অনুপম কাব্যসংগীত এটিকে সংগীতের দিক দিয়ে অতি সমৃদ্ধ করে তুলেছে।

গদ্যগন্ধীও সংলাপভঙ্গী একটি গানের নমুনা নীচে দেওয়া হলো—এটি শ্যামা নৃত্যনাট্যের চতুর্থ দৃশ্যে আছে:

"তোমা লাগি যা করেছি কঠিন সে কাজ
আরো সুকঠিন আজ তোমারে সে কথা বলা
বালক কিশোর উত্তীয় তার নাম
ব্যর্থপ্রেমে মোর মত্ত অধীর
মোর অনুনয়ে তব চুরি অপবাদ নিজ 'পরে লয়ে
সঁপেছে আপন প্রাণ।"

গদ্যগান ছাড়াও উত্তীয়ের 'মায়াবন বিহারিণী' বা 'আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া' বা সখীর 'জীবনে পরম লগন কোরো না হেলা' প্রভৃতি গান গদ্যগন্ধী অন্যান্য গানের ভিতর অপরূপ ভাবে গেঁথে দেওয়া হয়েছে। অনেক সময়েই দেখা

যায় যে নাটকে উপস্থাপিত গান নাটক থেকে বিচ্যুত করে গাইলে, তাদের আর সেই আকর্ষণ থাকে না। কিন্তু শ্যামার গান তার ব্যতিক্রম। এই নাটকের অনেক গানই স্বতন্ত্রভাবে একক সংগীত হিসেবে অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এই বিচারে 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যের গানকে 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্যের সমগোত্রীয় বলা চলে।

রাগ-রাগিণীকে কী ভাবে গানে নাটকীয়তা উপস্থাপনা করার কাজে প্রযুক্ত করা যায় তার একটি অনুপম দৃষ্টান্তও তিনি রেখেছেন শ্যামা নৃত্যনাট্যের চতুর্থ দৃশ্যে বজ্রসেন ও শ্যামার নিম্নোক্ত দুটি গানে :

(ঘ) বজ্রসেন :—

পা -সা II -র্সা -া না -া | ধপা -া -ক্ষা -া I পা -না -ধা র্সা | না -া -া -পা I
কাঁ ০ ০ ০ দি ০ | তে০ ০ ০ ০ হ ০ ০ ০ | বে ০ ০ ০

I পা -ক্ষা -পা -ক্ষা | -পা -া -গা -া I -া -া গা পা | গা -া -গরা -া I
রে ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ ০ ০ রে পা | পি ০ ০ ষ্

I সা -া -া -া | সা -ন্া সা -ন্া I সা -া মা -া | মা -া গা -রা I
ঠা ০ ০ ০ | জী ০ ব ০ নে ০ পা ০ | বি ০ না ০

I সা -ন্া -রা -া | সা -া -া -া I
শা ০ ০ ন্ | তি ০ ০ ০

(ঙ) শ্যামা :—

II { সা -ণা -া ণধা | মজ্ঞা -া রা সা I রা -া -জ্ঞা জ্ঞরা | সা -া -রা সন্া I
হে ০ ০ ক্ষ | মা০ ০ ক রো না ০ থ্ ক্ষ | মা ০ ০ ক

I সা -া -া -া | -া -া -া -া } I মা ম্পা পা পা | পা -া পধা ধপা I
রো ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ এ পা০ পে র | যে ০ অ ভি

I মা -া পা -া | -া -া -া -া I প্মা -পা পা পনা | না -া না না I
স ম্ পা ০ | ০ ০ ০ ত্ হো ক্ বি ধা০ | তা র্ হা তে

I না নর্সা র্সর্রা র্সার্ব | না -ধনা র্সা -া I র্সা র্সর্রা র্বর্সা র্সা | ণর্সা -ণা ণা -া I
নি দা০ রু০ ণ | ত ০ র ০ তু মি০ ক্ষ মা | ক ০ রো ০

I ণধা ধর্সা র্সণা ণা | পধা -পা পা -া I পা পধা পা ধপা | মা -মগা রা -া I
তু মি০ ক্ষ মা | ক ০ রো ০ তু মি০ ক্ষ মা | ক ০ রো ০

বজ্রসেনের গানটি বাঁধা হয়েছে শঙ্করা রাগে ও বজ্রসেনের গানে যে অভিসম্পাত রয়েছে তার কাঠিন্য ভালোভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্যে বিলাবল ঠাটের শুদ্ধ পর্দার শঙ্করা রাগ ব্যবহার করে তাতে কড়ি মাধ্যমের প্রয়োগ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, ক্রুদ্ধ বা উত্তেজিত হলে যেমন আমাদের কথাবার্তা একটু উঁচু পর্যায় ও দ্রুত গতিতে উচ্চারিত হয়, এই গানটির বেলাতেও তাই করা হয়েছে। কিন্তু শ্যামার গানটিতে অনুনয়ের ভাব থাকায় এটিকে কোমল রূপ দেবার জন্যে কোমল নি যুক্ত কাফি-সিন্ধু রাগ এই গানটিতে প্রযুক্ত হয়েছে ও গানটির গতিও অনুনয়-বিনয় প্রকাশ এবং উপযুক্ত করার জন্যে অপেক্ষাকৃত শ্লথ করা হয়েছে।

হার্বার্ট স্পেনসারের প্রবন্ধে অনুপ্রাণিত হয়ে গীত শব্দগুলির ভাব যথাযথ ফোটাবার জন্য মানুষের কণ্ঠ স্বাভাবিকভাবে যে-সব উচ্চনীচ পর্দায় ওঠানামা করে, রবীন্দ্রনাথ তাই ধরবার চেষ্টা করেছিলেন ও তার প্রথম সফল প্রচেষ্টা বাল্মীকিপ্রতিভা ও কালমৃগয়া গীতিনাট্যে হয়েছিল। এই নৃত্যনাট্যগুলির গানেতে তার সার্থক ও পরিণত রূপ লাভ করেছে। নৃত্য, সাহিত্য ও সুরের সমন্বয়ে যে অপরূপ সৃষ্টি গড়ে উঠেছে, তার উত্তরসূরী আজো অবধি কেউ জন্মেছেন বলে আমরা জানিনে।

নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে শেষ বা নৃত্যনাট্যের যুগের গানে কথা ও সুরের সমন্বয়ে রবীন্দ্রনাথ সিদ্ধিলাভ করেছিলেন ; ফলে, তিনি তখন যে কোনো

ধারার গানই রচনা করে থাকুন না কেন, হোক তা রাগভিত্তিক কাব্যসংগীত বা লোকসংগীত, তা তাঁর একান্ত নিজস্ব সৃষ্টিতে পরিণত হয়েছিল। এই নৃত্যনাট্যের গানগুলিও তাঁর সংগীত-রচয়িতা হিসেবে এই সার্থকতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফসল।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-সৃষ্টিতে আশ্রমজীবনের প্রভাব

রবীন্দ্রনাথের জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, ১৯০১ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস থেকে তিনি শান্তিনিকেতনে স্থায়িভাবে বসবাস শুরু করেন ও এর প্রভাব তাঁর সংগীতসৃষ্টির উপর দুই ভাবে পড়ে। প্রথম ভাগে পড়ে শান্তিনিকেতনের প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব। যার ফলে সেইসময়-কার সংগীতসৃষ্টিতে আশ্রমের বিভিন্ন ঋতুবৈচিত্র্যের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় ও পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতনের প্রকৃতির সংগে কবির মন যে একই সূত্রে বাঁধা পড়েছিল তার সূত্রপাত হয়েছিল এই মধ্যযুগে আশ্রমবাস থেকেই।

আশ্রমবাসের প্রভাবের আর একটি ফলশ্রুতি হলো তাঁর আনুষ্ঠানিক গানের সৃষ্টি। তিনি যখন শান্তিনিকেতন আশ্রমে স্থায়িভাবে বসবাস শুরু করেন তখন শান্তিনিকেতন আশ্রমের ছেলেমেয়েদের দিয়ে নানা উৎসব-অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন ও সেই উপলক্ষে তাঁকে নানা আনুষ্ঠানিক গানও রচনা করতে হয়েছিল। তার মধ্যে ঋতুকেন্দ্রিক গীতিবহুল নাটকগুলির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা চলে।

আশ্রমপ্রতিষ্ঠার পর 'শারদোৎসব' নাটক এই ধরনের প্রথম রচনা ও তার কয়েকটি গানে বীরভূমের নতুন পরিবেশের সংগে ছেড়ে-আসা পদ্মাতীরের পরিবেশও এক হয়ে গিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ 'মেঘের কোলে রোদ হেসেছে', 'আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায়' এবং 'আমার নয়ন ভুলানো এলে' গানগুলির কথা উল্লেখ করা যায়। ফাল্গুনী নাটকেও তাঁর গানগুলির মধ্যে শান্তি-নিকেতনের আশ্রমের পরিবেশ স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে।

আশ্রমের প্রাংগণে সব ঋতুই তার চিহ্ন রেখে যায়। কিন্তু আশ্রমের সমগ্র পরিবেশের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে একটা উদাস বাউলের রূপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন তার ছায়া পড়েছে কয়েকটি নাটকের গানে ও তার মধ্যে প্রায়শ্চিত্ত নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগীর গাওয়া 'গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ' গানটিতে তা বিশেষ-ভাবে ধরা পড়েছে।

শুধু তাই নয়, এই গানখানি শুনলেই উত্তরায়ণের সামনে দিয়ে চলা সেই রাঙামাটির পথটিকে যেন বারবার মনে পড়ে।

আশ্রমের রাঙা ধুলির স্পর্শ যেন অনুভব করা যায় অরূপরতন নাটকে গাওয়া

সুরঙ্গমার একটি গানে :

"প্রভু বলো বলো কবে তোমার
পথের ধুলায় রঙে রঙে
আঁচল রঙীন হবে।"

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্যে, বিশেষ করে সংগীতে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রায় সমগ্ররূপেই ধরা পড়েছে কিন্তু তার মধ্যে বেশী প্রভাববিস্তার করে আছে ফেলে-আসা পদ্মাতীর আর বিশেষ করে বীরভূম বা শান্তিনিকেতন আশ্রমের প্রাকৃতিক পরিবেশ। শেষযুগে শান্তিনিকেতনের প্রকৃতি ও কবি একাত্ম হয়ে গেছেন। শান্তিনিকেতনের আশ্রমের প্রাকৃতিক পরিবেশ তাঁর সংগীত সৃষ্টিতে-ও জীবনে কী ভাবে প্রভাববিস্তার করেছিল তা প্রখ্যাত সাহিত্যিক প্রমথনাথ বিশী মহাশয় তাঁর 'শান্তিনিকেতন ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে এইভাবে ব্যক্ত করেছেন :

"এখানকার উৎসবের বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে এগুলি প্রকৃতিমুখী, ইহার ক্রমবিকাশ ও পরিণতি ঋতু উৎসবের দিকেই নিশ্চিত গতি। ইহার সম্যক রূপ অবগত হইতে হইলে কবিজীবনকে মিলাইয়া লইয়া দেখিতে হইবে। তাঁহার কবি-জীবনের সংগেই সমান তালে পা ফেলিরা শান্তিনিকেতনের জীবন চলিয়াছে। রবীন্দ্রজীবন ও শান্তিনিকেতন একই প্রবাহের সমান্তরাল দুই তটরেখা, একটিকে ছাড়িয়া অপরটিকে দর্শন একদেশ দর্শন মাত্র।

"রবীন্দ্রনাথের জীবনের চল্লিশ হইতে পঞ্চাশের কোঠা নৈবেদ্য, লেখা স্বদেশী আন্দোলনের প্রবন্ধাদি, গোরা, গীতাঞ্জলি দ্বারা চিহ্নিত। শান্তিনিকেতনের প্রাচীনদর্শী ব্রহ্মচর্যাশ্রম সেই যুগের সৃষ্টি। আবার পঞ্চাশের পরে যখন বৃহত্তর রবীন্দ্রনাথের উদ্ভব, বলাকা ফাল্গুনীর যুগ, বিশ্বভারতীর সৃষ্টি সেই যুগধর্ম-জাত। ইহার পরবর্তী রবীন্দ্রজীবনের তত্ত্বানুধাবন করিলে দেখা যায় তাহার সমগ্র প্রতিভাপ্রবাহ মানুষ ও ভগবানের দুই উপকূলের দ্বারা সীমায়িত প্রকৃতির উপসাগরের মধ্যে যেন আত্মবিসর্জন করিয়াছে। প্রকৃতির মধ্যেই মানুষ ও ভগবানের সমন্বয় তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন। বলাকার পরবর্তী তাঁহার অধিকাংশ কাব্য ও সংগীত এই সমন্বয়ের সাক্ষ্য বহন করিতেছে। তাঁহার বাল্য-কালের প্রকৃতিপ্রীতি শেষবয়সে গভীরতর অর্থলাভ করিয়াছে। অবশ্য এই পরিণতি তাঁহার কাব্যে অনুধাবন করা যায়। কিন্তু ইহার প্রত্যক্ষতর ক্ষেত্র শান্তিনিকেতন। শান্তিনিকেতনের ঋতু 'উৎসবের ক্রমবিকাশ এক অর্থে রবীন্দ্র-জীবনের প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠতর মিলনের ক্রমবিকাশ মাত্র।"

উত্তরকালে বর্ষা ও বসন্ত ঋতুকে কেন্দ্র করে তাঁর লেখা শ্রাবণগাথা, শেষ

বর্ষণ, নবীন, ফাল্গুনী, বসন্ত প্রভৃতি নাটকের গানগুলি কোনো কোনো ক্ষেত্রে শান্তিনিকেতনের বাইরে রচনা করা হয়ে থাকলেও তাদের মধ্যে শান্তিনিকেতন আশ্রমের পরিবেশের প্রভাব সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে।

"পুবহাওয়াতে ভেজামাটির গন্ধ, কদমকেশর বিকীর্ণ পথ, যুথীগন্ধে ভরা ঝিল্লীমুখর বাদলসন্ধ্যা, কেতকী-মালতীর সুবাস, গুরু গুরু মেঘের মাদল-ধ্বনি—এসবের মধ্যে যেন শান্তিনিকেতনের আশ্রমের বর্ষার রূপই প্রতিভাত।"

—'সুরের গুরু', অমিয় সেন ও নীলিমা সেন।

শরৎকালে আশ্রমের সকালবেলাকার যে অপরূপ সৌন্দর্য মনকে নাড়া দেয়, রবীন্দ্রনাথের সকালবেলাকার গেয় রাগে রচিত শরতের গানগুলিতে যেন তারই রূপ পেয়েছে :

"শীতের বনে কোন সে কঠিন আসবে বলে
শিউলিগুলি ভয়ে মলিন বনের কোলে
আমলকী তাল সাজল কাঙাল খসিয়ে দিল পল্লবজাল
কাশের হাসি হাওয়ায় ভাসি যায় যে চলে।"

উপরের শীতের গানটিতে কবি যে চিত্রটি এঁকেছেন তাতে শীতের আগমনে শান্তিনিকেতন আশ্রমের, বিশেষ করে তার আমলকী বনের যে চেহারা ফুটে ওঠে, তাই যেন ধরা পড়েছে।

"চক্ষে আমাব তৃষ্ণা
ওগো তৃষ্ণা আমার বক্ষ জুড়ে
আমি বৃষ্টিবিহীন বেশাখী দিন
সন্তাপে প্রাণ যায় যে পুড়ে।"

—এই গানটিতে যেন আশ্রমের বৃষ্টিবিহীন বৈশাখী দিনের চিত্রই ফুটে উঠেছে।

এছাড়া শান্তিনিকেতনের নানা উৎসব-অনুষ্ঠানের জন্যেও কবিকে অনেক গান রচনা করতে হয়েছিল। অনেকক্ষেত্রেই দেখা যায় যে উৎসবের প্রয়োজনে রচিত হলেও উৎসবকে ছাপিয়ে এক বিশালতর রসের ক্ষেত্রে এর বিচরণ। ১১ই মাঘের মাঘোৎসব অথবা ৭ই পৌষের পৌষ-উপাসনা ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে এই-জাতীয় আনুষ্ঠানিক গানের বিরাট একটা অংশের সৃষ্টি। ঋতু উৎসবের উপলক্ষে তাঁর সংগীতসৃষ্টির কথা তো আগেই বলা হয়েছে। পুরোপুরি অনুষ্ঠান-ভিত্তিক কিছু গান অবশ্যই আছে, যেমন দিনান্তিকা চা-চক্র উপলক্ষে রচিত 'হায় হায় দিন চলে যায়' কিংবা গৃহপ্রবেশ-জাতীয় অনুষ্ঠানের জন্য রচিত 'এসো হে গৃহদেবতা' ও সুধীজনের আহ্বান 'মাতৃমণ্গল পুণ্য অঙ্গন করো মহোজ্জ্বল' ইত্যাদি গানে।

রবীন্দ্রনাথ প্রায় সবরকম অনুষ্ঠান উপলক্ষেই গান লিখেছেন—তার অধিকাংশই শান্তিনিকেতনে নানাবিধ উৎসব এবং ক্রিয়াকর্মকে কেন্দ্র করে। সংখ্যায় অবশ্য বিয়ের গানই অনেক, যেগুলি পারিবারিক বিবাহ অথবা বন্ধু-বান্ধব, স্বজন-পরিজনের অনুরোধেই লেখা। শান্তিকেতনের বিশেষ অনুষ্ঠান বৃক্ষরোপণ-বসন্তোৎসব ও শ্রীনিকেতনে হলকর্ষণ এবং শিল্পোৎসবের জন্যেও রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করেছেন।

আশ্রমের জীবন হলো গোষ্ঠীজীবন ও এর জন্যে সকলে মিলে একত্রে গাইবার জন্যে রবীন্দ্রনাথকে সম্মেলক গান রচনা করতে হয়েছে ও এর জন্য আশ্রম-সংগীত 'আমাদের শান্তিনিকেতন' গানটি বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। রবীন্দ্রনাথের সংগীতসৃষ্টিতে শান্তিনিকেতনের আশ্রম ও তার পরিবেশের প্রভাব সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে প্রখ্যাত সাহিত্যিক প্রমথনাথ বিশী মহাশয় তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন' গ্রন্থে আরো বলেছেন : "শান্তিনিকেতনের প্রান্তরে শেষের জীবন অতিবাহিত না করিলে এবং সেই সঙ্গে শান্তিনিকেতনের বালক-বালিকাদের না পাইলে রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বনাট্য-ঋতুনাট্য ও নৃত্যনাট্য লিখিত হইত কিনা সন্দেহের বিষয়। এখানে বসিয়া ঋতুবীক্ষণজাত যে সত্য তিনি দর্শন করিয়াছেন তাহা এখানকার বালক-বালিকাদের অভিনয় কৌশলের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিভার বিকাশের জন্য এ দুটিরই আবশ্যক ছিল—প্রকৃতির কোলে বালক-বালিকাদের জন্য বিদ্যালয়। সত্য কথা বলিতে কি রবীন্দ্রনাথের কাছে বালক বালিকা গান যতখানি মানবিক ততখানি প্রাকৃতিক। তাহারা যেন প্রকৃতি হইতে মানবে যাইবার সেতু।"

ঘটনাভিত্তিক গান

আনুষ্ঠানিক গান ছাড়াও বেশ কিছু ঘটনাভিত্তিক গানেব কথা উল্লেখ করা যায় যা আশ্রমবাসের সময়েই রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন ও তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু রচনা নিম্নে উল্লিখিত হলো :

'আজ বরষার রূপ হেরি মানবের মাঝে'—প্রকৃতি পর্যায়ের এই গানটি ১১ আষাঢ় ১৩১৭ সালে রচিত। তার আগের দিন রবীন্দ্রনাথেব কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথের বন্ধু সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সরোজচন্দ্র আকস্মিক-ভাবে হৃদ্‌রোগে মারা যান। তাঁর মৃত্যু উপলক্ষে এই গানটি রচিত হয়।

কবির দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুতে রচিত হয় 'মরণসাগরপারে তোমরা অমর তোমাদের স্মরি' গানটি।

'কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ' গানটি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের স্মরণে রচিত।

রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুদিবস স্মরণে রচিত হয় 'কে যায় অমৃতধাম-যাত্রী' গানটি।

'কেন রে এই দুয়ারটুকু পার হতে সংশয়' গানটি বড় মেয়ে মাধুরীলতার মৃত্যুতে লেখা।

'আছে দুঃখ আছে মৃত্যু' গানটি রচিত হয় পত্নী মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু স্মরণে।

১৩৪২ সালের ৭ই ভাদ্র তৎকালীন আশ্রমিকরা অনিলকুমার চন্দ প্রমুখদের উৎসাহে এক 'হে হৈ সঙ্ঘ' খাড়া করে বর্ষামঙ্গলের অনুকরণে ভরসামঙ্গল উৎসব করেন ও সেই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন 'পায়ে পড়ি শোনো ভাই গাইয়ে', 'কাঁটাবন বিহারিণী সুরকানা দেবী', 'ও ভাই কানাই কাকে জানাই দুঃসহ এই দুঃখ' এবং 'না গান গাওয়ার দল রে আমরা না গলা সাধার' এই ৪টি গান।

১৩২৯ সালে কলকাতায় বর্ষামঙ্গল উৎসবের সময় কবির গলা ভেঙে যায় ও তখন তিনি 'আমার কণ্ঠ হতে গান কে নিল ভুলায়ে' গানটি লেখেন।

'সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধদাহ' গানটি রচিত হয় লাহোর জেলে অনশনে যতীন দাসের মৃত্যুবরণ উপলক্ষে।

পৌত্রী নন্দিনীর অতি শৈশবের আধো আধো কথা বলাকে উপলক্ষ করে গান লেখেন 'অনেক কথা যাও যে বলি কোনো কথা না বলি'।

কাথিয়াবাড়ের এক চাষীকন্যার দু'হাতে দুটি মন্দিরা নিয়ে অপূর্ব নৃত্য-দর্শনে লিখলেন 'দুই হাতে কালের মন্দিরা যে সদাই বাজে'।

দিনেন্দ্রনাথের পালিত হরিণের সাঁওতালদের হাতে নিহত হওয়ার ঘটনাকে উপলক্ষ করে গান লিখলেন 'সে কোন বনের হরিণ ছিল আমার মনে'।

১৩৩১ সালের দোলপূর্ণিমার দারুণ ঝড়ে বসন্ত-উৎসব পণ্ড হয়ে গেলে লিখলেন 'রুদ্রবেশে কেমন খেলা কালো মেঘের ভ্রূকুটি'।

১৯৩২ সালে, বাংলা ১৩৩৭ সনে জাপানী যুযুৎসু-পালোয়ান টাকা গাকীর প্রদর্শনীর উদ্বোধন-সংগীত হিসেবে রচনা করলেন, 'সংকোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান' গানটি।

খ্রীস্ট-জন্মোৎসব উপলক্ষে রচনা করলেন 'একদিন যারা মেরেছিল তাঁরে গিয়ে'।

১৯৪০ সালে বেতারে রবীন্দ্রসংগীতের একটি অনুষ্ঠান শুনে রচনা করলেন 'যারা বিহানবেলায় গান এনেছিল'।

পৌত্রী নন্দিনী দেবীর পরিণয় উপলক্ষে ১৯৩৯ সালে নিম্নলিখিত তিনটি গান রচিত হয়:

১ নবজীবনের যাত্রাপথে ;
২ প্রেমের মিলনদিনে ;
৩ সুমঙ্গলী বধূ ।

'এ মণিহার আমায় নাহি সাজে' ও 'আমায় বোলোনা গাহিতে বোলোনা' গানদুটিও বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করেই রচিত হয়েছিল ।

এরূপ আরো অনেক গানের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে যা বিশেষ বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। তবে এটাও লক্ষ্য করবার বিষয় যে, বিশেষ কোনো ঘটনাকে উপলক্ষ করে কোনো কোনো গান রচিত হলেও, সেইসব গান পরবর্তীকালে সাধারণভাবে বিশালতর ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ 'প্রেম এসেছিল নিঃশব্দ চরণে' গানটির কথা উল্লেখ করা যায়। গানটি মানব-প্রেমিক এন্ডরুজ সাহেবের মৃত্যুকে উপলক্ষ করে রচিত হলেও, এটিকে সাধারণ-ভাবে প্রেমের গান হিসেবে গণ্য করে পরে গাওয়া হয়েছে।

আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে গানের কথা সামান্য বদল করে তাকে একটা বিশেষ অনুষ্ঠানের উপযোগী করে তোলা হয়েছে ; যথা—'হে চির নূতন আজি এ দিনের প্রথম গানে/জীবন আমার উঠুক বিকাশি তোমার পানে' গানটির 'জীবন আমার' এই দুটি কথার বদলে 'জীবন দোঁহার' করে নিয়ে তাকে বিবাহের উপযোগী গানে পরিণত করা হয়েছে।

রবীন্দ্রসংগীত-রচনায় পারিপার্শ্বিকের প্রভাব

আমরা সকলেই জানি যে আশ্রমে বাস করার সময়ে নানা প্রয়োজনে ও অনেকের ফরমাইসে রবীন্দ্রনাথকে অনেক গান রচনা করতে হয়েছিল। কিন্তু এছাড়াও কিছু গান আছে যাদের রচনায় পারিপার্শ্বিকের প্রভাব অনেকটা কাজ করেছে। এরূপ অবস্থায় সৃষ্ট কয়েকটি গানের উদাহরণ নীচে দেওয়া হলো।

শোনা যায়, ট্রেনে যেতে ট্রেনের যে চলমান গতি ও ছন্দ তা থেকে সৃষ্টি হলো 'চলি গো চলি যাই গো চলি' গান। আবার কোনো নদীর স্রোততরঙ্গ-ভঙ্গী-দর্শনে নাকি রচিত হয় 'ওগো নদী আপন বেগে পাগলপারা' গানটি।

লোহিত সমুদ্রে জাহাজ চলেছে বিলেতের পথে। সমুদ্রের আর আকাশের নিবিড়তায় কবির মনে অপরূপের ছোঁয়া লাগল। সেই প্রভাবে তিনি রচনা করলেন 'প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে' গানটি। এইসময়কার তাঁর মনের ভাব তিনি এইভাবে এক লেখায় ব্যক্ত করেছেন : "আজ সকালে ছাদের উপর রেলিঙ ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। আকাশের গা-এর নীল ও সমুদ্রের নিবিড় নীলিমার মাঝখান দিয়া পশ্চিম দিগন্ত হইতে মৃদু শীতল বাতাস আসিতেছিল। আমার ললাট

মাধুর্যে অভিষিক্ত হইল। আমার মন বলিতে লাগিল : এইতো তাঁহার প্রসাদ সুরপ্রবাহ···এই অনির্বচনীয় মাধুর্য কি জলে। ইহা কি বাতাসে। এই ধারণার অতীতকে কে ধারণ করিতে পারে। ইহাই আনন্দ, ইহাই প্রসাদ।" (২২ জৈষ্ঠ, ১৩১৯)

কোনো কোনো সময়ে তাঁর গানে পারিপার্শ্বিকের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, আবার কোনো কোনো সময়ে দেখা যায় যে তিনি পারিপার্শ্বিকের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। যেমন পাশ্চাত্য সংগীতের আদর্শে রচিত 'প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হারিয়ে', 'সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি,' 'নয় নয় এ মধুর খেলা' গানগুলি বিদেশগামী জাহাজে বসেই তিনি রচনা করেছেন।

'জানি গো দিন যাবে' বাউলাঙ্গ গানটি, 'মধুর তোমার শেষ যে না পাই', 'চাহিয়া দেখো রসের স্রোতে', 'দিনের বেলায় বাঁশী তোমার'—এইসব পুরোপুরি বাংলা গানের আদর্শে কথা ও সুরের সমন্বয়ে অপূর্ব রাবীন্দ্রিক সৃষ্টি হয়েছে বিদেশে বসেই।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : "কারোয়ার হইতে ফিরিবার সময় (১৮৮৩) জাহাজে প্রকৃতির প্রতিশোধ-এর কয়েকটি গান লিখিয়াছিলাম। বড়ো একটি আনন্দের সঙ্গে প্রথম গানটি জাহাজের ডেকে বসিয়া সুর দিয়া গাহিতে গাহিতে রচনা করিয়াছিলাম—

হ্যাঁদে গো নন্দরাণী
আমাদের শ্যামকে ছেড়ে দাও
আমরা রাখাল বালক গোষ্ঠে যাব
আমাদের শ্যামকে দিয়ে যাও।

সকালের সূর্য উঠিয়াছে, ফুল ফুটিয়াছে, রাখাল বালকেরা মাঠে যাইতেছে, সেই সূর্যোদয়, সেই ফুলফোটা সেই মাঠে বিহার তাহারা শূন্য রাখিতে চায় না। সেইখানেই তাহারা তাহাদের শ্যামের সঙ্গে মিলিত হইতে চাহিতেছে। সেইখানেই অসীমের সাজপরা রূপটি তাহারা দেখিতে চায়। সেইখানেই মাঠে মাঠে বনে পর্বতে অসীমের সঙ্গে আনন্দের খেলায় যোগ দিবে বলিয়াই তাহারা বাহির হইয়া পড়িয়াছে।" —সংগীতচিন্তা, পৃ ১৯০-৯১।

এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে জাহাজে বসে থাকলেও সমুদ্র বা তার পারিপার্শ্বিক তাঁর মনে কিছুমাত্র প্রভাববিস্তার করতে পারেনি। জাহাজে বসে তিনি যে দৃশ্যের প্রভাবে গানটি বেঁধেছেন তা পুরোপুরি বাংলাদেশের।

রবীন্দ্রনাথ প্রায় সারা পৃথিবী পরিভ্রমণ করেছেন ও তাঁর সংগীতরচনার পটভূমি প্রায় সারা বিশ্ব। কিন্তু দেখা যায় যে সমুদ্র বা পর্বত তাঁকে তেমন

আকর্ষণ করতে পারেনি ও এদের বা বিদেশের পরিবেশের প্রভাব তাঁর সংগীত-সৃষ্টিতে বিশেষ পড়েনি। সমুদ্র সম্বন্ধে 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রে' (১৮৮১) তিনি লিখেছিলেন :

"কল্পনায় সমুদ্রকে যা মনে করতেম সমুদ্রে এসে দেখি তার সঙ্গে অনেক বিষয় মেলেনা। তীর থেকে সমুদ্রকে খুব মহান বলে মনে হয়, কিন্তু সমুদ্রের মধ্যে এলে আর ততটা মনে হয় না। তার কারণ আছে। আমি যখন বম্বের উপকূলে দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখতাম তখন দেখতেম দূর দিগন্তে গিয়ে নীল জল নীল আকাশে মিশিয়ে গিয়েছে। কল্পনায় মনে করতেম যে এক্‌বার যদি ওই দিগন্তের আবরণ ভেদ করতে পারি—ওই দিগন্তের যবনিকা উঠাতে পারি—অমনি আমার সুমুখে এক অকূল অনন্ত সমুদ্র একেবারে উথলে উঠবে, ওই দিগন্তের পর যে কী আছে তা আমার কল্পনাতেই থাকত, তখন মনে হতনা ওই দিগন্তের পর আর এক দিগন্ত আসবে। কিন্তু যখন সমুদ্রের মধ্যে এসে পড়ি তখন মনে হয় যে জাহাজ যেন চলছেনা, কেবল একটি দিগন্তের গণ্ডির মধ্যে বসে আছে। আমাদের কল্পনার পক্ষে সে দিগন্তের সীমা এত সংকীর্ণ যে মন কেমন তৃপ্ত হয়না।" —প্রথম পত্র।

পাহাড় সম্বন্ধে তিনি ভানুসিংহের পত্রাবলীতে বলেছেন :

"পাহাড় আমার কেন ভালো লাগেনা বলি—সেখানে গেলে মনে হয় আকাশটাকে যেন আড়কোলা করে ধরে একদল পাহারাওয়ালার হাতে জিম্মা করে দেওয়া হয়েছে, সে একেবারে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। আমরা মর্তবাসী মানুষ—সীমাহীন আকাশে আমরা মুক্তির রূপটি দেখতে পাই—সেই আকাশটাকেই যদি তোমার হিমালয় পাহাড় এক্‌পাল মহিষের মতো শিং গুঁতিয়ে মারতে চায় তাহলে সেটা আমি সইতে পারিনে। আমি খোলা আকাশের ভক্ত, সেইজন্য বাংলাদেশের বড়ো বড়ো দিলদরাজ নদীর ধারে অবারিত আকাশকে ওস্তাদ মেনে তার কাছে আমার গানের গলা সেধে এসেছি—" —আষাঢ়স্য তৃতীয় দিবসে, ১৩২৬।

মংপু থেকে শান্তিনিকেতনের সংগীতভবনের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদারের কাছে লেখা এক চিঠিতেও কবি তাঁর সংগীতসৃষ্টিতে পাহাড়ের গৌণ ভূমিকা সম্বন্ধে অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন : "এখানে আমার শরীরটা হয়তো ভালো আছে—কিন্তু এ পর্যন্ত পাহাড়পর্বতের সঙ্গে আমার ভালো করে মনের মিল হয়নি। মনে হয় যেন এখানে আমার মনের চারদিকে সব পাহারা বসিয়ে দিয়েছে। সমভূমির মানুষ বিষম ভূমিতে বাধা পাই যেন সমস্তক্ষণ। আমি যে বর্ষামঙ্গলের কবি সে-বর্ষা এখানে যথেষ্ট জায়গা পায়না—তার বড়ো রাস্তাটা খোলসা পায় বোলপুরের মাঠে, পুবেন হাওয়ায় একেবারে এসে পৌঁছয় কবির হৃদয়ে, সেখানকার নীড়ে মেঘমল্লারের কাকলী জেগে ওঠে ছুটে আসা বৃষ্টি-

ধারার শব্দ শুনে। এ বৎসর এই পাহাড়ে বর্ষার গানের আশা কোরো না। বর্ষার অভ্যর্থনার ভার তোমাদেরই উপর রইল।"

—গৌরীপুর লজ, ৭ই আষাঢ়, ১৩৪৫।

রবীন্দ্রসংগীতকে ভালোভাবে পর্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে পরিবেশের মধ্যে নদী ও আকাশ তাঁর গানে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে আছে। এই বিষয়ে ভানুসিংহের পত্রাবলীতে কবি বলেছেন :

"নদী আমি ভারি ভালোবাসি, আর ভালোবাসি আকাশ। নদীতে আকাশে চমৎকার মিলন রঙে রঙে আলোয় ছায়ায় ঠিক যেন আকাশের প্রতিধ্বনির মতো। আকাশ পৃথিবীতে আর কোথাও আপনার সাড়া পায়না এই জলের উপর ছাড়া।"

—২ শ্রাবণ, ১৩২৯।

এটা বিশেষ লক্ষ্য করবার বিষয় যে বিদেশে বসে থাকলেও সংগীতরচনার সময় তাঁর মন সব সময়েই পড়ে থাকতো এই নদীমাতৃক শস্যশ্যামলা বাংলা-দেশের দিকেই, বিশেষ করে বীরভূমের বা শান্তিনিকেতনের ও ফেলে আসা পদ্মাতীরের পটভূমিই তাঁকে সংগীতরচনায় বিশেষভাবে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে।

এখানে দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি দুটি বর্ষার গানের উল্লেখ করছি যাতে বীর-ভূমের ও পদ্মাতীরের পরিবেশ ফুটে উঠেছে :

"আজ বারি ঝরে ঝরঝর ভরাবাদরে
আকাশ-ভাঙা আকুল ধারা কোথাও না ধরে।
শালের বনে থেকে থেকে ঝড় দোলা দেয় হেঁকে হেঁকে
জল ছুটে যায় এঁকে বেঁকে মাঠের 'পরে
আজ মেঘের জটা উড়িয়ে দিয়ে নৃত্য কে করে॥
ওরে বৃষ্টিতে মোর ছুটেছে মন, লুটেছে এই ঝড়ে।"

এই গান পরিপূর্ণভাবেই বীরভূমের পরিবেশ ব্যক্ত করছে।

অন্য গানে :

"নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে তিল ঠাঁই আর নাহিরে
ওগো আজ তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে॥
বাদলের ধারা ঝরে ঝরো ঝরো, আউষের ক্ষেত জলে ভরো ভরো
কালিমাখা মেঘে ওপারে আঁধার ঘনিয়েছে দেখ চাহিরে॥
ওই শোনো শোনো পারে যাবে বলে কে ডাকিছে বুঝি মাঝিরে
খেয়া পারাপার বন্ধ হয়েছে আজিরে।"

পদ্মাতীরের পরিবেশ সুস্পষ্টভাবে এখানে আভাসিত। আবার কোনো কোনো গানে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রিয় দুটি প্রাকৃতিক পরিবেশ—পদ্মাতীর এবং

বীরভূমের পরিবেশ—একসঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, 'বাদলধারা হলো সারা' গানটির কথা উল্লেখ করা যায়।

এতে "ছাড়ল খেয়া ওপার হতে ভাদ্রদিনের ভরা স্রোতেরে
দুলছে তরী নদীর পথে তরঙ্গ বন্ধুর"

এই অংশে পদ্মাতীরের পরিবেশ ব্যক্ত হয়েছে ;

ও "কদমকেশর ঢেকেছে আজ বনপথের ধূলি
মৌমাছিরা কেয়াবনের পথ গিয়েছে ভুলি।"

—এই অংশে যেন শান্তিনিকেতনের আশ্রমের ছবিটিই ফুটে উঠেছে।

কাব্যসংগীত

কাব্যসংগীত বলতে আমরা সাধারণত বুঝে থাকি সেইসব সাঙ্গীতিক রচনা যেগুলি প্রধানত রচিত হয়েছিল কবিতারূপে এবং পরে সুর সংযোজিত হয়ে গানের দলে স্থান করে নিয়েছে। এজন্যে এই ধারার অনেক গানকে গানের তালিকায় উল্লেখ না করে (সুর অনেক পরে সংযোজিত হওয়ায়) আলাদা ভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

মূলত কবিতা হিসেবে সৃষ্টি হয়েছিল বলে, এই কাব্যসংগীতগুলি দীর্ঘতর ও দীর্ঘ কবিতায় সুরারোপ করেছেন বলে এতে নানা ছন্দ, লয় ও সুরের আশ্রয় নিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। বড় কবিতায় সুরযোজনা হয়েছে বলে কবিতাটি যেমন হৃদয়াবেগের নানা অনুভূতিকে খেলাতে খেলাতে এগিয়ে নিয়ে গেছে, গানে প্রযুক্ত রাগিণী বা সুরও ভাবের সঙ্গে মিল রেখে আপনাকে বিস্তার করতে করতে কবিতার সঙ্গে বয়ে চলেছে। সেইজন্যে এইসব গানে একই সুরের পুনরাবৃত্তি বড় একটা দেখা যায় না, রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য গানে কলি ও তুক হিসেবে সুরের যে একটা পারম্পর্য থাকে—যথা, স্থায়ীতে যে সুরবিন্যাস সঞ্চারীতেও তাই, আবার অন্তরাতে যা আভোগেও তাই—এইসব গানে অনুপস্থিত।

এইরূপ রচনাপদ্ধতির মধ্যে বিলাতী সুর যোজনার একটা প্রভাব প্রচ্ছন্নভাবে রয়েছে বলে মনে হয়। ভাগনার ও স্পেনসার সুরযোজনার ব্যাপারে যে মতবাদ প্রচার করেছিলেন, এই ধারার গানগুলিতে তার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এইসব মতবাদের প্রভাবে কবির মনে এই ধারণা জন্মেছিল যে, কবিতা যেমন ভাব থেকে ভাবান্তরে, অবস্থা থেকে অবস্থান্তরে যেতে পারে—গানগুলিকে সেই পথে পরিচালিত করে চলমান করা সম্ভব। তিনি লিখলেন "গতিশীল ভাব যে সংগীতের পক্ষে একেবারে অননুসরণীয় তাহা নহে"। এই মতবাদকে

বাস্তবে রূপ দেবার জন্যে তাঁর সংগীতসৃষ্টির প্রথম যুগে চলনশীল গান রচনা করলেন 'আমার প্রাণের 'পরে চলে গেল কে'। নানা রাগের সংমিশ্রণে সৃষ্ট এই গানে সুর ভাবের সঙ্গে মিল ও সামঞ্জস্য রেখে নানা ভাবে আপনাকে বিস্তার করতে করতে বয়ে চলেছে—একই সুরের পুনরাবৃত্তি বড় একটা নজরে পড়ে না।

অবশ্য এটা অনস্বীকার্য যে, যদিও রবীন্দ্রনাথ এই ধারার গান রচনায় গোড়ার দিকে বিলাতী সুরযোজনার আদর্শে কিছুটা প্রভাবান্বিত হয়ে থাকবেন, কিন্তু পরবর্তী কালে তাঁর অন্যান্য ধারার গানের মতো এইজাতীয় গানকেও একটা স্বকীয়তা প্রদান করে তাদের একটা রাবীন্দ্রিক সৃষ্টিতে পরিণত করেছেন।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কাব্যসংগীতের কিছু উল্লেখযোগ্য গানের তালিকা উল্লিখিত হলো :

১ খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে,
২ কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি,
৩ তুমি কি কেবলি ছবি,
৪ নহ মাতা নহ কন্যা,
৫ নীলনবঘনে আষাঢ় গগনে,
৬ ওগো কিশোর আজি,
৭ হে নিরুপমা, হে নিরুপমা,
৮ ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে,
৯ নৃত্যের তালে তালে,
১০ ওগো শেফালিবনের মনের কামনা,
১১ হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে,
১২ আমার গোধূলিলগন,
১৩ এ শুধু অলস মায়া,
১৪ আমরা দুজনা স্বর্গখেলনা,
১৫ প্রাঙ্গণে মোর শিরীষশাখায়,
১৬ যখন পড়বেনা মোর পায়ের চিহ্ন।

অন্যান্য গানের মতো এই ধারার গান রচনাতেও রবীন্দ্রনাথ শেষযুগে অধিকতর দক্ষতা অর্জন করেছিলেন ও তা প্রথমযুগে রচিত 'আমার প্রাণের 'পরে চলে গেল কে' গানটির সঙ্গে শেষযুগে সুরারোপিত গান 'হে নিরুপমা', 'ওগো কিশোর আজি' বা 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি' গানগুলির তুলনা করলেই পরিষ্কার বোঝা যাবে।

এই প্রসঙ্গে আমি দুটি কাব্যগীতির বিশেষভাবে উল্লেখ ও আলোচনা

করতে চাই, যা থেকে বোঝা যাবে যে প্রথমে এই ধারার গান রচনায় বিদেশী সুর যোজনার প্রভাব থাকলেও শেষদিকে তার প্রভাব কাটিয়ে রবীন্দ্রনাথ এই ধারার গান রচনায় পুরোপুরি মৌলিক ও রাবীন্দ্রিক হয়ে উঠেছেন।

প্রথমে আমি 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি' গানটি নিয়ে আলোচনা করতে চাই। গানের বাঁধা ছন্দকে ভেঙে আবৃত্তির ধরনটিকে বজায় রেখে অভিনয়ের ঢঙে এই গানটি গাইতে হয়। এই গানে 'কালো' শব্দটিকে অবিকল কথার সুরে রাখা হয়েছে। 'ধানের খেতে খেলিয়ে গেলো ঢেউ' পঙ্‌ক্তিটিতে সুরে যেন ধানের ক্ষেতে ধানের শীষের দোলার ভাবটি ধরা পড়েছে। ভাবের সংগে সামঞ্জস্য রেখে এক এক কলিতে এক এক রাগিণীর সার্থক প্রয়োগ হয়েছে। বস্তুত কিছুটা কথকতা, অভিনয়, কীর্তনের ঢং ও রাগরাগিণীর মিশ্রণে সৃষ্ট এই গানটিকে সংগীতে এক অভিনব ও দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা বলা যেতে পারে।

এই ধারার আর একটি উল্লেখযোগ্য সংগীতসৃষ্টি হলো 'হে নিরুপমা' গানটি। এই গানটিতে ৪টি কলিতেই ভিন্ন ভিন্ন ৪টি রাগ ব্যবহৃত হয়েছে ; শুধু তাই নয়, প্রত্যেক কলিতেই ছন্দান্তর ঘটানো হয়েছে।

হিন্দুস্থানী সংগীতে রাগমালা পরিবেশন করার রীতি আছে। তাতে ওস্তাদরা না থেমে, পর্দার হেরফের করে পর পর বিভিন্ন রাগ পরিবেশনে তাঁদের মুন্সীয়ানা দেখিয়ে থাকেন। কিন্তু তাঁরা এইসব ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাগ পরিবেশন করলেও তাঁদের গানে ছন্দ বা তাল একই থাকে—রাগ থেকে রাগান্তরে যাবার সময় ছন্দ থেকে ছন্দান্তরে যেতে বড় একটা দেখা যায় না। সেই বিচারে 'হে নিরুপমা' জাতীয় গানে রবীন্দ্রনাথ ওস্তাদদের রাগমালা সৃষ্টির চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে কিছুটা বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন বলাটা বোধ হয় খুব একটা অন্যায় হবে না।

তাঁর অন্যান্য ধারার, বিশেষ করে ছোট গানের সংগে এইসব গানের এই তফাত যে, আকারে ছোট গানের সুর ও ছন্দ প্রয়োগে যে নৈপুণ্যের প্রয়োজন, তার চাইতে দীর্ঘতর কবিতায় সুর-সংযোজনায় অধিকতর দক্ষতার প্রয়োজন। কবি তাঁর শেষজীবনে সেই দক্ষতা অর্জন করেছিলেন ও এই ধারার গান রচনায় সিদ্ধকাম হয়েছিলেন বলেই নৃত্যনাট্যগুলিতে সুরযোজনা করা তাঁর পক্ষে অনেকটা সহজ হয়ে গিয়েছিল। এইসব প্রবন্ধ বা কাব্যগীতিগুলিকে তাঁর নৃত্যনাট্যের অভিনয় ও সংলাপভংগী গানগুলির পূর্বসূরী বলাটা বোধহয় খুব একটা অসংগত হবে না।

পাশ্চাত্য সংগীত ও রবীন্দ্রনাথের গান

আমরা সকলেই জানি যে প্রথমযুগের সংগীতসৃষ্টিতে, বিশেষ করে 'বাল্মীকি-প্রতিভা', 'কালমৃগয়া' ও কিছুটা পরিমাণে 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্য রচনা করার সময় রবীন্দ্রনাথ কিছু বিলাতী গান ভেঙে তাদের উপর ভিত্তি করে কিছু বাংলা গান রচনা করে ঐসব গীতিনাট্যে ব্যবহার করেছিলেন। সেই সময়কার বিলাতী ভাঙা গানের মধ্যে—'কালী কালী বল রে', ফুলে 'ফুলে ঢলে ঢলে', 'সকলি ফুরালো', 'মানা না মানিলি', 'তবে আয় সবে আয়', 'পুরানো সে দিনের কথা', 'কতবার ভেবেছিনু'—এইসব গান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত অনেক গানই ইংরেজী, স্কচ বা আইরিশ গানের সুরে ভাঙা। Thomas Moore এর Irish melodies থেকে কিছু সুরও কবি গ্রহণ করেছিলেন—এর মধ্যে Go where glory waits thee থেকে ভাংগা 'মানা না মানিলি', 'মরি, ও কাহার 'বাছা', ওহে দয়াময়, নিখিল আশ্রয়', 'আহা আজি এ বসন্তে'—গানগুলির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

পরবর্তী যুগে রবীন্দ্রনাথ আর বিলাতী গান ভেঙে তাঁর কোনো গান রচনা করেননি। কিন্তু তাঁর কিছু গানে পাশ্চাত্য সুরের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। দ্বিতীয় যুগের তাঁর গান রচনার যে বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ ভাঙা গানের চেয়ে বিভিন্ন ধারার গানের উপাদানকে অবলম্বন করে স্বাধীন ও মৌলিক সংগীতসৃষ্টি—এই-সব গানেও তা লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, মধ্যযুগে পাশ্চাত্য সংগীতের সুরারোপের আদর্শে রচিত ক'টি গানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়:

১ সুন্দর বটে তব অংগদখানি,
২ প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে,
৩ নয় নয় এ মধুর খেলা,
৪ তোমার হলো শুরু
৫ আমার সকল রসের ধারা,
৬ হারে রে রে রে রে আমায় ছেড়ে দেরে,
৭ প্রাণ চায় চক্ষু না চায়।

—এইসমস্ত গানে ইংরেজী বা পাশ্চাত্য সংগীতের সুর প্রয়োগের প্রভাব সুস্পষ্ট-ভাবে লক্ষ্য করা যায়। এইসমস্ত গানে রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য গানের মীড় প্রয়োগের চেয়ে পাশ্চাত্য সংগীতের আদর্শে খাড়া-খাড়া ও কাটা-কাটা ভাবে স্বর-প্রয়োগ করা হয়েছে।

এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথ যে-সব বড়ো বড়ো কবিতায় সুরারোপ করেছেন ও যে-সমস্ত গানকে আমরা কাব্যগীতি বলি, তাতেও বিদেশী সংগীতরচনাকার ভাগনার

ও স্পেনসারের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এর বিস্তৃত ব্যাখ্যা কাব্যসংগীতের বেলায় করা হয়েছে বলে এখানে আর এই নিয়ে আলোচনা করা হলো না।

সংগীতের রূপায়ণের ব্যাপারে যদিও ভারতীয় সংগীত-রচয়িতারা চিরকাল শিল্পীর স্বাধীনতা ও মুক্ত সুরবিহারের স্বাধীনতা স্বীকার করে এসেছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে শিল্পীদের সেইপ্রকার স্বাধীনতা দেবার বিরোধী ছিলেন। য়ুরোপীয় সংগীতের মতো তাঁর দেওয়া সুর ও ছন্দের নির্দিষ্ট কাঠামোকে কঠোর ভাবে অনুসরণ করে তাঁর গান রূপায়িত হোক এটাই ছিল তাঁর একান্ত ইচ্ছা। কবির এরূপ মনোভাবের কারণ বিদেশী সংগীত-সমালোচক আর্নল্ড বাকে এই-ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন :

"He was the first composer in India to regard his songs as individual entities into which other singers should not introduce their own variations as they habitually do when singing anybody's songs. He is undoubtedly the first Indian composer who felt his compositions were finished pieces of work where ornaments were admissible only where he himself had intended them to be. A change in the melody, a change in rhythm and an extra trill or run here and there only could detract from the original meaning. As he felt strongly that his melody expressed the hidden sense of his words, a change from what he had composed, meant without fail, a falsification of his intentions. This means a change from the general Indian attitude which could probably never have occurred, had Rabindranath, not at one time realized the beauty of the composition of an European song in its finished perfection."

এই যে তাঁর গানকে একটি নির্দিষ্ট কাঠামোতে বেঁধে দেওয়ার রীতি কবি অনুসরণ করেছিলেন, তার প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন পাশ্চাত্য সংগীত থেকেই।

কিন্তু এই যে তিনটি পাশ্চাত্য ধারার গানের প্রভাবের কথা বলা হলো, এ-গুলি তাঁর গানকে পরিবেশন বা গঠনের দিক থেকে প্রভাবান্বিত করলেও, অন্য দিক দিয়ে পাশ্চাত্য সংগীতের আর একটি প্রভাব তাঁর গানে পড়েছিল যা তাঁর গানকে ভাবের ও রসের দিক দিয়ে বৈচিত্র্যশীল করে তুলতে বিশেষ সাহায্য করেছিল।

এই প্রভাবটিকে ভালো করে বুঝতে হলে ইয়োরোপীয় বা পাশ্চাত্য সংগীত

ও তার সঙ্গে আমাদের সংগীতের পার্থক্য কোথায় তা হৃদয়ঙ্গম করা বিশেষ আবশ্যক। অনেক বিষয়ের মতো এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথই হলেন শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার ও তাঁর জবানীতেই এই ব্যাপারটি তুলে ধরবার চেষ্টা করছি।

"...আমার এই কথা মনে হয় যে য়ুরোপের গান এবং আমাদের গানের মহল যেন ভিন্ন; ঠিক এক দরজা দিয়া হৃদয়ের একই মহলে যেন তাহারা প্রবেশ করেনা। য়ুরোপের সংগীত যেন মানুষের বাস্তব জীবনের সঙ্গে বিচিত্রভাবে জড়িত। তাই দেখিতে পাই সকল রকমেরই ঘটনা ও বর্ণনা আশ্রয় করিয়া য়ুরোপে গানের সুর খাটানো চলে; আমাদের দিশি সুরে যদি সেরূপ করিতে যাই, তবে অদ্ভুত হইয়া পড়ে, তাহাতে রস থাকেনা। আমাদের গান যেন জীবনের প্রতিদিনের বেষ্টন অতিক্রম করিয়া যায়, এই জন্যে তাহার মধ্যে এত করুণা এবং বৈরাগ্য; সে যেন বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবহৃদয়ের একটি অন্তরতর ও অনির্বচনীয় রহস্যের রূপটিকে দেখাইয়া দিবার জন্য নিযুক্ত, সেই রহস্যলোক বড়ো নিভৃত নির্জন গভীর—সেখানে ভোগীর আরামকুঞ্জ ও ভক্তের তপোবন রচিত আছে, কিন্তু সেখানে কর্মনিরত সংসারীর জন্য কোনো প্রকার সুব্যবস্থা নাই।"

—জীবনস্মৃতি, পৃ. ১০৫।

অন্য জায়গায় বলেছেন: "য়ুরোপীয় সংগীতের মর্মস্থানে আমি প্রবেশ করিতে পারিয়াছি, এ কথা বলা আমাকে সাজেনা। কিন্তু বাহির হইতে যতটুকু আমার অধিকার হইয়াছিল তাহাতে য়ুরোপের গান আমার হৃদয়কে একদিক দিয়া খুবই আকর্ষণ করিত। আমার মনে হইত এ সংগীত রোমান্টিক—রোমান্টিকের দিকটা বিচিত্রতার দিক, প্রাচুর্যের দিক, তাহা জীবনসমুদ্রের তরঙ্গলীলার দিক, তাহা অবিরাম গতি চাঞ্চল্যের উপর আলোকছায়ার দ্বন্দ্ব সম্পাতের দিক······আমি যখনই য়ুরোপীয় সংগীতের রস ভোগ করিয়াছি তখনই বারম্বার মনের মধ্যে বলিয়াছি ইহা রোমান্টিক। ইহা মানবজীবনের বিচিত্রতাকে গানের সুরে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিতেছে। আমাদের সংগীতে কোথাও কোথাও সে চেষ্টা নাই যে তাহা নহে, কিন্তু সে চেষ্টা প্রবল ও সফল হইতে পারে নাই। আমাদের গান ভারতবর্ষের নক্ষত্রখচিত নিশীথিনীকে ও নবোন্মেষিত অরুণরাগকে ভাষা দিতেছে। আমাদের গান ঘন বর্ষার বিশ্বব্যাপী বিরহবেদনা ও নববসন্তের বনান্তপ্রসারিত গভীর উন্মাদনার বাক্যবিস্মৃত বিহ্বলতা।"

—জীবনস্মৃতি, পৃ. ১০৬।

"আমাদের মতে রাগরাগিণী বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে নিত্য আছে। সেইজন্য আমাদের কালোয়াতি গানটা ঠিক যেন মানুষের গান নয়, তাহা যেন সমস্ত

জগতের। ভৈরোঁ যেন ভোরবেলার আকাশেরই প্রথম জাগরণ, পরজ যেন অবসন্ন রাত্রিশেষের নিদ্রাবিহ্বলতা…।

"ভারতবর্ষের সংগীত মানুষের মনে বিশেষ ভাবে এই বিশ্বরসটিকে রসাইয়া তুলিবার ভার লইয়াছে। মানুষের বিশেষ বেদনাগুলিকে বিশেষ করিয়া প্রকাশ করা তার অভিপ্রায় নয়।"

—সংগীতের মুক্তি।

উপরোক্ত ব্যাখ্যা থেকে এটা বোঝা যায় যে য়ুরোপীয় সংগীত মানুষের বাস্তব জীবন, তার সুখ দুঃখ ইত্যাদি অনুভূতির সংগে বিচিত্র ভাবে জড়িত। এই সংগীত মানবজীবনের নানা বিচিত্র ভাব ও অনুভূতিকে গানের মাধ্যমে প্রকাশ করছে ও এমন কোনো বিষয় নেই যাকে অবলম্বন করে য়ুরোপীয় বা পাশ্চাত্য সংগীত রচিত হয়নি। সেই বিচারে য়ুরোপীয় সংগীতকে বিষয়বৈচিত্র্যে অনেক বেশী সমৃদ্ধ ও অগ্রসর বলা যেতে পারে। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও তার সংগীতের সঙ্গে সংস্পর্শের ফলে, আমাদের সংগীতে যে একটা স্থায়ী অনড় ভাব আছে তা থেকে মুক্ত হয়ে পাশ্চাত্য সংগীতের অনুসারী মানবমনের সুখ দুঃখ বেদনা ইত্যাদি অনুভূতিকে ফোটাবার ও প্রতিফলন করাবার চেষ্টা সুরু হলো—রবীন্দ্রনাথের হাতে এই প্রচেষ্টা পরিপূর্ণতা ও সার্থকতা লাভ করলো। নানা আনুষ্ঠানিক ও মানবমনের নানা অনুভূতি ও অভিব্যক্তির প্রকাশক অজস্র গান তাঁর হাত থেকে আমরা পেলাম। এর ফলে আমাদের দৈনন্দিন ও সামাজিক জীবন বিশেষভাবে সংগীতের রসে সমৃদ্ধ ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। বিষয়বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ এই যে রবীন্দ্রনাথের অনুপম সংগীতসৃষ্টি, তাকে আমরা পাশ্চাত্য সংগীতের প্রভাবেরই ফসল বলে ধরে নিতে পারি।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব হলো এই যে, তাঁর গানে য়ুরোপীয় গানের সুরকে অবলম্বন করার চাইতে তিনি তাঁর গানে বেশী প্রয়োগ করেছেন য়ুরোপীয় সংগীতের এই বিচিত্রতাকে। তিনি য়ুরোপীয় সংগীতের বিচিত্রতাকে তাঁর গানে সঞ্চারিত করেছেন ঠিকই, কিন্তু তা করেছেন ভারতীয় সংগীতের মূলটিকে উৎপাটিত না করে এবং আমাদের যে নৈর্ব্যক্তিক বা abstract রাগ-রাগিণী ছিল, তাকে মানব মনের নানা অনুভূতি প্রকাশের কাজে ব্যবহার করেছেন। এ একপ্রকার অসাধ্যসাধন।

রবীন্দ্রসংগীতে ছন্দ ও তাল

আমরা সকলেই জানি যে, রবীন্দ্রনাথের প্রথমযুগের সংগীত-সৃষ্টি অনেকটা সুরধর্মী ছিল ও তিনি সেইসময়ে সংগীত-রচনায় অধিকাংশ শাস্ত্রীয় সংগীতের

অনুশাসনের গণ্ডী অতিক্রম করতে পারেননি। তাঁর সেইসময়কার রচিত গানে হিন্দুস্থানী সংগীতের প্রায় সবরকম ভারী তালই, যথা—চৌতাল, ধামার, সুরফাক্তা, তেওড়া, আড়খেমটা, আড়া চৌতাল, এমনকি পঞ্চম সোয়ারী (গান : আজি মোর দ্বারে) ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায় এবং সেগুলি শাস্ত্রীয় সংগীতের অনুশাসন অর্থাৎ সম-ফাঁক এইসব নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলেছে। কিন্তু সংগীত-সৃষ্টিতে যতই এগিয়েছেন ততই তাঁর গান সুরধর্মী থেকে কাব্যধর্মী হয়ে উঠেছে ও তালপ্রয়োগেরও রূপান্তর ঘটেছে।

তাঁর গান যতই কাব্যধর্মী হয়ে উঠেছে ততই কবিকে গানের বাণীর অখণ্ডতা রক্ষা করার জন্য নানাপ্রকার ছন্দ ও তাল উদ্‌ভাবনের কথা ভাবতে হয়েছে ও সেই করতে গিয়ে তাঁর মধ্যযুগের সংগীত-সৃষ্টির সময় কতকগুলি নূতন মাত্রা ও ছন্দ-বিন্যাস-যুক্ত তাল সৃষ্টি বা পুনঃপ্রবর্তন করতে হয়েছে। এর বিস্তৃত বিবরণ রবীন্দ্রনাথের মধ্যযুগের সংগীত-সৃষ্টির সময়ে তালের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করার সময় বলা হয়েছে।

বস্তুত রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর গানে কথা ও সুরের সমন্বয়ই চিরকাল প্রাধান্য পেয়ে এসেছে। গানে এই সমন্বয়ের যথার্থ রূপায়ণের পথে যদি রাগ-রাগিণীর শাস্ত্রীয় স্বরূপ বা তালের বিভাগ বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তবে তিনি সেই বাধাকে অগ্রাহ্য করে রাগের শাস্ত্রীয় রূপকে এদিক ওদিক করে তাল ও ছন্দকে নূতন ভাবে সাজাতে দ্বিধা বোধ করেননি।

বাংলা গানে তাল ও ছন্দ প্রয়োগ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতামত অত্যন্ত সুস্পষ্ট ছিল ও তিনি এই বিষয়ে তাঁর মতামত এইভাবে ব্যক্ত করে গেছেন :

"তাল জিনিসটা সংগীতের হিসাব বিভাগ। এর দরকার খুবই বেশী সেকথা বলাই বাহুল্য কিন্তু দরকারের চেয়েও কড়াক্কড়িটা যখন বড়ো হয় তখন দরকারটাই মাটি হইতে থাকে। তবু আমাদের দেশে এই বাধাটাকে অত্যন্ত বড়ো করিতে হইয়াছে, কেননা মাঝারির হাতে কর্তৃত্ব।

" · সংগীতের একটা প্রধান অংগ তাল। আমাদের আসরের সবচেয়ে বড়ো দাংগা এই তাল লইয়া। গানবাজনার ঘোড়দৌড়ে গান জেতে কি তাল জেতে এই লইয়া বিষম মাতামাতি। দেবতা যখন সজাগ না থাকেন তখন অপদেবতার উৎপাত এমনি করিয়াই বাড়িয়া ওঠে।"

—সংগীতের মুক্তি।

"তালও ভাবপ্রকাশের একটা অংগ। যেমন সুর তেমনি তালও আবশ্যকীয়। ···অতএব ভাবের পরিবর্তনের সংগে সংগে তালও দ্রুত এবং বিলম্বিত করা আবশ্যক। সর্ব্বত্রই যে তাল সমান রাখিতেই হইবে তাহা নয়। ভাবপ্রকাশকে মুখ্য

উদ্দেশ্য করিয়া সুর ও তালকে গৌণ উদ্দেশ্য করিলেই ভালো হয়। ভাবকে স্বাধীন করিয়া দেওয়া আবশ্যক, নহিলে তাহারা ভাবকে চারদিক হইতে বাঁধিয়া রাখে। এই সকল ভাবিয়া আমার বোধ হয় আমাদের সংগীতে যে নিয়ম আছে যে যেমন তেমন করিয়া ঠিক একই স্থানে সমে আসিয়া পড়িতেই হয়, সেটা উঠাইয়া দিলে ভালো হয়।"

—সংগীত ও ভাব।

"কলার বিকাশ সামঞ্জস্যে, কৌশলের বিকাশ স্বচ্ছন্দে। ছন্দের একটা দিক আছে সেটাকে বলা যেতে পারে কৌশল। কিন্তু তার চেয়ে আছে বড় জিনিস, সেটাকে বলি সৌষ্ঠব। বাহাদুরী তার মধ্যে নেই। সমগ্র কাব্যসৃষ্টির কাছে ছন্দের আত্মনিবেদনে তার উদ্ভব। কাব্য পড়তে গিয়ে যদি অনুভব করি যে ছন্দ পড়ছি, তা হলে সেই প্রগল্ভ ছন্দকে ধিক্কার দেবো।"

উপরে কবিতায় ছন্দ ও তার বাড়াবাড়ি সম্বন্ধে কবির যে মন্তব্য, তা গানে তালের প্রয়োগ ও তাতে আড়িকুয়াড়ী প্রয়োগ করে গানকে তাল বা ছন্দপ্রধান করে ভাবকে ক্ষুণ্ণ করা সম্বন্ধেও সমভাবে প্রযোজ্য।

তবে এটা লক্ষ্য করবার বিষয় যে, গানে তালের প্রয়োগ সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা যদিও গোড়া থেকেই কবির মনে ছিল কিন্তু তাকে বাস্তবে রূপ দেবার চেষ্টা আরম্ভ করেছিলেন তাঁর সৃষ্টির মধ্যযুগ থেকে। আমরা 'গীতাঞ্জলি', 'গীতালি' ও 'গীতিমাল্য'র গানে দেখতে পাই যে, তাঁর আগের যুগের ব্যবহৃত ভারী তালের ব্যবহার কমে আসছে ও মধ্যযুগে কিছু নতুন তাল উদ্ভাবন বা প্রবর্তন ছাড়া তিনি সহজ সরল ছন্দযুক্ত তাল, যথা—দাদরা, কাহারবা, ষষ্ঠী এইসব তালেতেই বেশীর ভাগ গান রচনা করেছেন। মধ্যযুগে প্রবর্তিত একমাত্র ষষ্ঠীতাল ছাড়া অন্যসব প্রবর্তিত তাল, যথা—একাদশী, নবতাল, নবপঞ্চ ইত্যাদিকে তিনি পরবর্তীকালে আর ব্যবহার করেননি। পরবর্তীকালে ভারী ভারী তালের ব্যবহার বা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ-মাত্রা-সংবলিত নতুন নতুন তাল উদ্ভাবন বা প্রবর্তনের চাইতে কম মাত্রাবিশিষ্ট সহজ সরল তালের প্রয়োগ ও ঐসব তালে বিবিধ প্রস্বন বা accent প্রয়োগ করে গানের ছন্দবৈচিত্র্য আনার দিকে মন দিয়েছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নোক্ত গানগুলির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে :

১ এবেলা ডাক পড়েছে—সমের ১ মাত্রা পূর্বে বাণী,

২ খেলাঘর বাঁধতে লেগেছি—

৩ ঘরেতে ভ্রমর এলো—সমের দু'মাত্রা ছেড়ে বাণী,

৪ প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে—সমের দু'মাত্রা পূর্বে বাণী,

৫ উতল ধারা বাদল ঝরে—২/৩ ছন্দ,

৬ আজি ঝরঝর মুখর বাদল দিনে—২।৪।২।৪ ছন্দ,

৭ হিমগিরি ফেলে নিচে নেমে এলে—অখণ্ড ৬ মাত্রার তাল,

৮ তোমার গীতি জাগালো স্মৃতি—৩।৪ ছন্দ,

৯ দীপ নিভে গেছে মম—২।৩ ছন্দ,

১০ নির্জন রাতে নিঃশব্দ চরণপাতে—অখণ্ড ৪ মাত্রার তাল,

১১ যেতে যেতে একলা পথে—৩।২ ছন্দ,

১২ নিবিড় মেঘের ছায়ায়—২।৪ ছন্দ,

১৩ শ্রাবণের পবনে আকুল—স্থায়ী, ও অন্তরা ২।৩ ছন্দ, সঞ্চারী ও আভোগ ৩+২ ছন্দ,

১৪ তুমি তো সেই যাবেই চলে—
১৫ দখিনহাওয়া জাগো জাগো,—
১৬ পূর্ণচাঁদের মায়ায়—
} এই ৩টি গানের প্রথম থেকে শেষ অবধি গীতিকবিতার দ্বিতীয় অক্ষরে তালের ঝোঁক পড়ে।

আরো একটি বৈশিষ্ট্যও রবীন্দ্রসংগীতের তালপ্রয়োগে প্রকাশ পায়। আমরা জানি যে, শাস্ত্রীয় সংগীতের ক্ষেত্রে দাদরা, কাহারবা ইত্যাদি তাল অপেক্ষাকৃত হাল্কা তাল হিসেবে গণ্য হয় ও এগুলি ভারী শাস্ত্রীয় গান, যথা ধ্রুপদ বা খেয়ালে ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কোনো কোনো গানে এরূপ নিপুণতার সঙ্গে এইসব হাল্কা তাল প্রয়োগ করেছেন যাতে ঐ তাল-প্রযুক্ত গানের চলনে ধ্রুপদের মেজাজ ফুটে উঠেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কাহারবা তালে নিবন্ধ 'রজনীর শেষ তারা' গানটির কথা উল্লেখ করা যায়।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন: "সংগীতে যে নিয়ম আছে যেমন তেমন করিয়া ঠিক একই স্থানে সমে পাঁড়তেই হয়, সেটা উঠাইয়া দিলে ভালো হয়।"

তাঁর কোনো কোনো গানে তালবিভাগকে কাব্যের খাতিরে লঙ্ঘন করে একে বাস্তব রূপ দিয়েছেন: যেমন, 'আসা-যাওয়ার পথের' গানটির সঞ্চারীতে 'মিলনমালায়' এবং 'কিছু বা সেই'—এই দুটি কথার অংশে দ্বিতীয়বারে তালের সম্পূর্ণ এক অধ্যায় করে বাড়িয়েছেন অর্থাৎ ৮ মাত্রা করে দু'বার বাড়িয়েছেন। আর একটি গানে—'আমার দিন ফুরালো' গানটিতে আভোগ অংশে 'মনে হয়' এই কথাটি দীর্ঘস্থায়ী করা হয়েছে; উদ্দেশ্য এই, আনমনে ভাবার প্রলম্বিত অবকাশটি সৃষ্টি করা।

যেমন কোথাও কোথাও মাত্রার পূর্ণসংখ্যা (সম) প্রয়োজনমতো পার হয়ে গিয়েছেন, তেমনি কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেই পূর্ণসংখ্যা অর্থাৎ সমে পৌঁছানোর আগে শেষ করেছেন। 'পরবাসী চলে এসো ঘরে' গানটির স্বরলিপি আটমাত্রার লিপিবন্ধ, কিন্তু গাওয়ার সময় চারমাত্রার তালে গাওয়া হয় শান্তিনিকেতনে:

'নৃত্যের তালে তালে' দাদরা তালের গানটির আস্থায়ীর শেষে 'গন্ধ হে'-তে ছয়মাত্রা পূর্ণ না করে তিনমাত্রা টেনেই শেষ করা হয় গাইবার কালে। ফলে, গানের আরম্ভে ফিরে আসার কালে চতুর্থ মাত্রায় বা ফাঁকে শুরু করতে হয়। সম্ভবত এর কারণ ছন্দের গতি তিনমাত্রার যার চলন কবি বলেছেন চঞ্চল। তার উপর তিনমাত্রা চাপালে সেই গতি ব্যাহত হয়, তাছাড়া সুরের ঢেউতোলা গতির দোলাও এর অনুকূলে রয়েছে।"

—'রবীন্দ্রসংগীত প্রসঙ্গ,' শৈলজারঞ্জন মজুমদার, পৃ. ৪৩-৪৪।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—কাব্যে ছন্দের যে কাজ, গানে তালের সেই কাজ এবং সেই অনুসারে গান বাঁধতে বসে কী উৎপাত ঘটলো তা তিনি তাঁর প্রবন্ধ 'সংগীতের মুক্তি'তে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁর গীতিকবিতা ও তাতে সুরারোপিত গান পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, কবিতা যে-ছন্দে চলেছে গানের বেলায় কোনো কোনো সময় তার পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে।

" 'আমার মাথা নত করে দাও' গানটির কবিতায় পড়ার সময় ৩।৩ মাত্রার ছন্দে পড়া হয়, কিন্তু এই কবিতাতে যখন সুরারোপ করে গান রচনা করা হোল তখন দেখা গেল যে তার ছন্দ ৭ মাত্রা তেওড়া তালে পরিবর্তিত হয়েছে। এর কারণ কী ভাবতে গিয়ে মনে হয় যে গানের ভিতর সুরের ব্যাপ্তি ঘটানোর জন্য অতিরিক্ত ১ মাত্রার প্রয়োজন দেখা দিল।

২	৩	১ [পা]	২	৩	১´
সা -া	সা -া II	সা র্সা না	ধা -া	পা পা	পক্ষা—ধা পা
আ ০	মা র	মা থা ন	ত ০	ক রে	দা০ ও হে

" 'কল্পনা' কাব্যের বিখ্যাত বর্ষামঙ্গল কবিতাটির ছন্দরূপ এই :

ঐ আসে ঐ। অতি ভৈরব। হরষে
জল সিঞ্চিত। ক্ষিতি সৌরভ। রভসে
ঘন গৌরবে। নব যৌবনা। বরষা
শ্যাম গম্ভীর। সরসা।

কবিতা হিসেবে এটিকে যখন পড়া বা আবৃত্তি করা যায় তখন এর ছন্দ কেমন কথার তালে চলে তা সহজেই বোঝা যায়। এই ছন্দের প্রতিপর্বে আছে ছয়কলা মাত্রা। কিন্তু এটিকে যখন সুরে গাওয়া হয় তখন তার ছন্দ বদলে যায়। তখন তার রূপ হয় এইরকম :

ঐ আসে। ঐ অতি। ভৈরব। হরষে
জলসিঞ্চ। চিতক্ষিতি। সৌরভ। রভসে

ঘন গো | রবে নব | যৌবনা | বরষা
শ্যাম গম্ | ভীর সর | সা

এ ছন্দের প্রতি পর্বে আছে চারকলা মাত্রা। বলা বাহুল্য, এ ছন্দে কথার তাল রক্ষিত হয়নি, অনেক স্থলেই কথার তাল কেটে গেছে। অর্থাৎ কথার স্বাভাবিক বিভাগ স্বীকৃত হয়নি, অনেকগুলি শব্দও অস্বাভাবিক ভাবে খণ্ডিত হয়েছে। এ ভাবে যখন বাক্‌ছন্দ ও কবিতা বা গানের ছন্দে বিরোধ ঘটে তখনই রচনার ভাব-গ্রহণে তথা রসোপলব্ধিতে ব্যাঘাত ঘটে। এই বিশেষ রচনাটিতে সে-ব্যাঘাত গুরুতর হয়নি, তার কারণ, এটিতে সুরবিস্তারের অবকাশ কম বলে শব্দচ্ছেদ বা ভাবচ্ছেদের অস্বাভাবিকতা উৎকট ভাব ধারণ করতে পারেনি।

রবীন্দ্রসংগীতে বাক্‌স্পন্দন ও গীতস্পন্দনের এরকম বিরোধের দৃষ্টান্ত বিরল। রবীন্দ্রসংগীতের মর্মস্পর্শিতার এটাই অন্যতম মুখ্য কারণ।"

—'বাণী ও বীণা', প্রবোধচন্দ্র সেন, গীতবিতান, রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী জয়ন্তী সংখ্যা, পৃ. ১৭১-১৭২।

তাঁর গানে কবিতা ও গানের ছন্দের এইরূপ বিরোধ এড়াবার জন্যেই নতুন নতুন তাল উদ্‌ভাবন বা প্রবর্তন ও নতুন নতুন ছন্দবিন্যাসের কথা কবিকে ভাবতে হয়েছে ও একই কারণে তিনি তাঁর ধ্রুপদাঙ্গ গানকে দ্বিগুণ ত্রিগুণ করে পরিবেশন করে গানের বাণীকে খণ্ডিত করার বিরোধী ছিলেন।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার দেখা যায় যে, সুরের ঝোঁক কবিতার ছন্দের ঝোঁকের বিপরীত। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'দিনের বেলায় বাঁশি তোমার' ও 'গোপন কথাটি রবেনা গোপনে' গান দুটিকে উপস্থাপনা করা চলে।

কবিতারূপে আবৃত্তি করলে 'দিনের বেলায় বাঁশি তোমার' গীতিকবিতায় ছন্দের ঝোঁক পড়ে প্রথম অক্ষরে :

। । । ।
দিনের বেলায় | বাঁশি তোমার | বাজিয়েছিলে | অনেক সুরে
। । । ।
গানের পরশ | প্রাণে এল | আপনি তুমি | রইলে দূরে

কিন্তু গানটি গাইবার সময় সুরের ঝোঁক পড়ে দ্বিতীয় অক্ষরে :

। । । ।
দিনের বেলায় | বাঁশি তোমার | বাজিয়েছিলে | অনেক সুরে

তেমনি 'গোপন কথাটি রবেনা গোপনে' গানটির গীতছন্দ :

। । । ।
গোপন | কথাটি | রবেনা | গোপনে
। । । ।
উঠিল | ফুটিয়া | নীরব | নয়নে

—এতেও দ্বিতীয় অক্ষরে ঝোঁক পড়েছে। কিন্তু কবিতার ছন্দ :

। ।
গোপন কথাটি । রবেনা গোপনে
। ।
উঠিল ফুটিয়া । নীরব নয়নে

—এতে ঝোঁক পড়ছে প্রথম অক্ষরে। কোনো কোনো সময়ে গীতিকবিতার বাক্য-বিন্যাসকে হ্রাস করা হয়েছে তাকে ছন্দোবদ্ধ সংগীতের উপযোগী একটা সুঠাম রূপ দেবার জন্যে ; দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'অধরা মাধুরী' গানটির কথা উল্লেখ করা যায়।

কবিতায় আছে 'অধরা মাধুরী ধরা পড়িয়াছে এ মোর ছন্দ বন্ধনে' কিন্তু গানে তা হ্রাস করে পরিবর্তিত হয়েছে 'অধরা মাধুরী ধরেছি ছন্দ বন্ধনে'।

এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় যে, গানের ভাব বা দরদ অনেকাংশে নির্ভর করে গানের বাণী বা ভাষার উপর। আর গীতিকবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্যই হলো এই যে, এতে বাক্ বা বাণীর সংযমের প্রয়োজন হয় এবং যোগ্য ও উপযুক্ত শব্দ চয়ন দ্বারা এতে স্বল্প পরিসরের মধ্যে গভীর ভাব সন্নিবিষ্ট করতে হয়। সেজন্যে দীর্ঘ কবিতা রচনার চেয়ে গীতিকবিতা বা lyrics, যা আকারে ছোট হয়, তা রচনা করা শক্ত ও তাতে বিশেষ ক্ষমতা বা দক্ষতার প্রয়োজন হয়। সেজন্যে আমরা অনেক সময়েই দেখি যে, বড়ো কবিতাকে গানের উপযোগী গীতিকবিতায় রবীন্দ্রনাথ যখন রূপান্তরিত করেছেন তখন তাকে আকারে ও ছন্দে একটা সুঠাম রূপ দেবার জন্যে তার আকার ছোট করে নিয়েছেন।

উদাহরণ :

কাব্যরূপ	গীতিরূপ
তবু মনে রেখো যদি দূরে যাই চলে	তবু মনে রেখো যদি দূরে যাই চলে
সেই পুরাতন প্রেম যদি এককালে	যদি পুরাতন প্রেম ঢাকা পড়ে
হয়ে আসে দূরস্মৃত কাহিনী কেবলি	যায় নব প্রেম জালে
ঢাকা পড়ে নব নব জীবনের জালে	
তবু মনে রেখো যদি বড় কাছে থাকি	যদি থাকি কাছাকাছি
নূতন এ প্রেম যদি হয় পুরাতন	দেখিতে না পাও
দেখে না দেখিতে পায় যদি শ্রান্ত আঁখি	ছায়ার মতন আছি না আছি
পিছনে পড়িয়া থাকি ছায়ার মতন	তবু মনে রেখো ॥

কাব্যরূপ	গীতিরূপ
তবু মনে রেখো যদি তাহে মাঝে মাঝে উদাস বিষাদ ভরে কাটে সন্ধ্যাবেলা অথবা শারদপ্রাতে বাধা পড়ে কাজে	যদি জল আসে আঁখিপাতে একদিন যদি খেলা থেমে যায় মধুরাতে একদিন যদি বাধা পড়ে কাজে শারদপ্রাতে তবু মনে রেখো।
অথবা বসন্তরাতে থেমে যায় খেলা তবু মনে রেখো যদি মনে পড়ে আর আঁখিপ্রান্তে দেখা নাহি দেয় অশ্রুধার	যদি পড়িয়া মনে ছলো ছলো জল নাই দেখা দেয় নয়নকোণে তবু মনে রেখো।

গীতিকবিতায় যতরকম ছন্দ ব্যবহার করা সম্ভব, আবৃত্তিযোগ্য কবিতায় ততরকম ছন্দ প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। এটা স্বচ্ছন্দে বলা চলে যে রবীন্দ্র-সংগীতে ব্যবহৃত বহু বিচিত্র ছন্দের মধ্যে যে-সব ছন্দ বাংলাভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণ ও কথাবলার ভঙ্গীর যত কাছাকাছি সে-সব ছন্দে রচিত গানগুলিই আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে বেশী। এজন্যে তাঁর শেষযুগের সহজ কথায় ও সহজ ছন্দে রচিত গান : 'আমি কি গান গাব যে ভেবে না পাই', 'বাদল দিনের প্রথম কদমফুল', 'কিছু বলব বলে এসেছিলাম' সদৃশ গানগুলি সহজেই আমাদের মনকে টেনে নেয়।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা যেমন পদ্য ও গদ্য উভয় রীতিকে আশ্রয় করে বিকশিত হয়, তাঁর গানও গদ্য ও পদ্য উভয় রীতিতেই আমাদের হৃদয় জয় করে; নৃত্যনাট্যে, বিশেষ করে চণ্ডালিকায় অপূর্ব গদ্যধর্মী গানের কথা আগেই বলা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথও মনে করতেন যে, সংগীত হয়তো শেষকালে বন্ধনহীন গদ্যকেই আশ্রয় গ্রহণ করবে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : "গদ্যরচনায় আত্মশক্তির, সুতরাং আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্র খুবই প্রশস্ত। হয়তো ভাবীকালে সংগীতটাও বন্ধনহীন গদ্যের গূঢ়তর বন্ধনকে আশ্রয় করবে। কখনো কখনো গদ্যরচনায় সুর সংযোগ করবার ইচ্ছে হয়। লিপিকা কি গানে গাওয়া যায়না ভেবেছ ?"

—শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত পত্র।

অন্য জায়গায় তিনি বলেছেন : "মনে রাখা দরকার ভাষাটা এখন সাবালক হয়েছে—ছন্দের কোলে চড়ে বেড়াবার তার লজ্জা হবার কথা। ছন্দ বলতে বোঝায় বাঁধাছন্দ, গদ্য তার বয়সের গৌরবে দাবি করবে তার মুক্তছন্দ—ধাত্রীর

বদলে প্রেয়সীর প্রতি যদি তার ঝোঁক যায় সেটাকে নিন্দে করতে পারবনা।"

এটা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় যে, তাঁর শেষযুগের মুক্তক ছন্দের কাব্যানুসারী মুক্তভঙ্গীর গানগুলি, যথা—'শ্রাবণের পবনের আকুল বিষণ্ণ সন্ধ্যায়', 'মম দুঃখের সাধন যবে করিনু নিবেদন', 'বাণী মোর নাহি', 'যদি হায় জীবন পূরণ নাই হলো' ইত্যাদি গানগুলি সংগীতের উৎকর্ষতা ও বৈচিত্র্যের বিচারে বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যর দাবী করতে পারে। এইরূপ ধারার তাঁর গদ্যগানের বৈশিষ্ট্যই হলো—এগুলি ভাষার দিক থেকে যেমন অনাড়ম্বর, তেমনি সুরের দিক থেকেও ছন্দের অনাবশ্যক আভরণ ঘুচিয়ে আমাদের হৃদয়ের সঙ্গে সহজেই ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

যা হোক, সংক্ষেপে এইটুকু স্বচ্ছন্দে বলা চলে যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর সংগীত-সৃষ্টিতে যতই এগিয়েছেন ততই কাব্যছন্দ ও গীতছন্দের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আনবার চেষ্টা করেছেন এবং লক্ষ্য রেখেছেন গীতরূপ ও ভাবরূপের মধ্যে যেন কোনো বিরোধ না ঘটে।

ছন্দ জিনিসটি বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের শেষযুগের গানে অন্তঃসলিলা গতির মতো প্রবাহিত হয়েছে, কোথাও মাথা-চাড়া দিয়ে উঠে গানের কাব্যময় রূপকে ব্যাহত করেনি। তাঁর গান কথা, সুর ও ছন্দের সার্থক সমন্বয়ে একটি অখন্ড সংগীতের রূপ নিয়েছে ও রবীন্দ্রসংগীতের সার্থকতাও এত হৃদয়গ্রাহী হওয়ার মূলে রয়েছে এই কারণই।

রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে এই কারণে তালযন্ত্রের অনাবশ্যক দাপাদাপি, যা আজকাল অনেক সংগীতের আসরেই দেখা যায়, তা বিশেষভাবে দোষণীয় ও আপত্তিকর।

শাস্ত্রীয় সংগীত ও রবীন্দ্রনাথের গান

'বাউলের গাথা' (প্রথম খণ্ড) গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: "এমন কোনো কবির কথা শুনা গিয়াছে যাঁহার জীবনের প্রারম্ভ ভাবে পরের অনুকরণ করিয়া লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন—অনেক কবিতা লিখিয়াছেন, অনেক ভালো ভালো কবিতা লিখিয়াছেন কিন্তু সেগুলি শুনিলে মনে হয় যেন তাহা কোনো একটা বাঁধা রাগিণীর গান, মিষ্ট লাগিতেছে কিন্তু নূতন ঠেকিতেছে না। অবশেষে এই কথা লিখিতে লিখিতে চারিদিকে হাতড়াইতে হাতড়াইতে নিজের যেখানে মর্মস্থান সেই স্থানটি আবিষ্কার করিয়া ফেলেন। আর তাহার বিনাশ নাই। এবার তিনি যে গান গাহিলেন তাহা শুনিয়াই আমরা কহিলাম—বাঃ, এ কী শুনিলাম, এ কে গাহিল, এ কী রাগিণী!"

পূর্বোক্ত লেখাখানি পড়লে মনে হবে যেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের সংগীত-সৃষ্টি ও তার ক্রমবিকাশের কথাই বলছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথমজীবনে যখন সংগীত-রচনায় হাত দিয়েছিলেন তখন স্বভাবতঃই তাঁকে সেই সময় অন্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সংগীত রচনা করতে হয়েছে। কিন্তু গোড়ার দিককার সংগীত-রচনায় তিনি অন্যদের পথ অনুসরণ করলেও ধীরে ধীরে নিজস্ব রাস্তা বা পথ খুঁজে পেয়েছেন। অন্যদের প্রভাব-মুক্ত হয়ে শেষভাগে তিনি এমন সব গান রচনা করেছেন যা একান্তভাবে তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি ও যা শুনে আমাদের মনে হয়েছে যেন নতুন কোনো একটা জিনিসের আস্বাদন পাচ্ছি। সেই সময় তিনি বাংলা গানের যে ধারা বা পর্যায়ের ওপরেই গান রচনা করে থাকুন না কেন, তা তাঁর প্রতিভার যাদুস্পর্শে এক মৌলিক ও রাবীন্দ্রিক সৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে।

এর আগে আমি আলাদা আলাদা ভাবে কবির বিভিন্ন ধারার সংগীতের ওপর ভিত্তি করে রচিত তাঁর সংগীত-সৃষ্টির ক্রমবিকাশের ধারা ও গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করেছি। মনে হয়, এই বিষয়ের, বিশেষ করে তাঁর শাস্ত্রীয় সংগীতের ওপর ভিত্তি করে রচিত গানের আরো বিস্তৃত আলোচনা ও বিশ্লেষণের অবকাশ রয়েছে। এর বিশেষ প্রয়োজন এইজন্য যে রবীন্দ্রনাথ যদিও শাস্ত্রীয় সংগীত ছাড়াও বাংলার প্রচলিত লৌকিক ও অন্যান্য ধারার গানের ওপর ভিত্তি করে তাঁর সংগীত সৃষ্টি করেছেন; কিন্তু তুলনা করলে দেখা যাবে যে উচ্চাঙ্গ সংগীত ও রাগ-রাগিণীকে অবলম্বন করে রচিত গানের সংখ্যাই সবাধিক। বস্তুত তাঁর গানের এক বিরাট অংশই শাস্ত্রীয় সংগীত ও তার বিভিন্ন গীতিশৈলীর ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। কীর্তনাঙ্গ ও লোকসংগীতের স্বরের আদর্শে গঠিত গানে রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বকীয়তা ও প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন ঠিকই, কিন্তু শাস্ত্রীয় সংগীতের বিভিন্ন উপাদানকে বিচিত্র ভাবে বাংলা গানে প্রয়োগ করে তাদের সমন্বয় করার ব্যাপারে তিনি যে অসাধারণ নৈপুণ্য ও মৌলিক চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন তার বোধ হয় কোনো নজীর মেলে না এবং এই ব্যাপারে তিনি অনন্য ও এর ওপরেই এক বিস্তৃত গবেষণা করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

তবে এই বিষয়ে আরো বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার আগে এই ধারার গানে কবির সংগীত-সৃষ্টির বিভিন্ন যুগে যে বৈশিষ্ট্য উল্লিখিত হয়েছে তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে উপস্থাপনা করে নিলে বোধ হয় এই আলোচনার ধারাবাহিকতাটি অনেকটা বজায় থাকবে।

রবীন্দ্রসংগীত-সৃষ্টির প্রথম যুগকে (১৮৭৭—১৯০০) আমরা অনেকটা রবীন্দ্রনাথের শিক্ষানবীশ যুগ বলতে পারি ও এই যুগের সংগীত-সৃষ্টিতে

শাস্ত্রীয় ও দরবারী সংগীতের প্রাধান্য ও প্রভাবই বেশী।

এই সময়ে তিনি প্রধানতঃ হিন্দুস্থানী গান ভেঙে তাদের সুরের ও তালের ওপর ভিত্তি করে সংগীত-রচনায় প্রবৃত্ত হন। যদিও তিনি সাহিত্যের দিক দিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর ভাঙা গানে মূল গানের রূপান্তর ঘটিয়েছেন, কিন্তু সুর ও তালের দিক দিয়ে তাঁকে মূল গানের ওপরেই নির্ভর করতে হয়েছে বেশী। এইজন্য এইসব ভাঙা গানকে ইন্দিরাদেবী পুরোপুরি রবীন্দ্রসংগীত না বলে অর্ধ রবীন্দ্রসংগীত বলে অভিহিত করেছেন।

তবে গোড়ার দিক থেকেই রবীন্দ্রনাথের রাগভিত্তিক গানগুলিতে হিন্দুস্থানী গানের অনেক অলংকরণকে, যথা তান, বাট, বিস্তার এইসবকে বর্জন করতে দেখা গিয়েছিল এবং গানে কথা ও সুরের সামঞ্জস্য সাধনের একটা প্রচেষ্টা তাঁর গোড়া থেকেই ছিল। তবুও একটা কথা বলা বোধ হয় খুব একটা অসংগত হবে না যে, এই যুগে প্রকৃত রবীন্দ্রসংগীত সৃষ্টি হয়নি, শুধু তার ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছিল মাত্র।

রবীন্দ্রসংগীত-সৃষ্টির দ্বিতীয় যুগকে (১৯০১—১৯২০), বিশেষ করে তাঁর রাগভিত্তিক সংগীত সৃষ্টির নিরিখে পরীক্ষা-নিরীক্ষার যুগ বলা যেতে পারে, সেখানে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষানবিশ ভাবটা কাটিয়ে অনেকটা স্বকীয় ভঙ্গীতে আত্মপ্রকাশে প্রয়াসী।

এই যুগের প্রথমভাগেও আমরা তাঁর অনেক রাগাশ্রয়ী ভাঙা গান পাই ; কিন্তু ধীরে ধীরে, বিশেষ করে গীতাঞ্জলির গান রচনা করার সময় থেকেই তাঁর গান রচনার ধারার একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। দেখা যায় যে তিনি আগের যুগের হিন্দুস্থানী গান ভেঙে গান রচনা করার চেয়ে স্বাধীন রাগাশ্রয়ী ও রাগ-রাগিণীর মিশ্রণে গানসৃষ্টিতে অধিকতর আগ্রহী। দেখা যায় যে আগের যুগের গানে রাগরাগিণীর শাস্ত্রীয় রূপের যে একটা বিশেষ প্রভাব ছিল তা অনেকটা কমে গিয়ে কথা ও সুরের মিতালিতে গানগুলি বিশেষ এক কাব্যমণ্ডিত রূপ নিচ্ছে। আগের যুগের ভারী ভারী তাল, যথা ধামার, চৌতাল, আড়া চৌতাল এসবের ব্যবহারও কমে আসতে দেখা যায়। এই যুগেই গীতাংশের ভাব অনুসারে রাগের প্রয়োগ ও রাগ-মিশ্রণের একটা প্রচেষ্টা ও দক্ষতা দেখা যায় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে একক রাগের ওপরে মৌলিক সৃষ্টিতেও তাঁর বিশেষ দক্ষতা পরিস্ফুট হয়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সংগীত-সৃষ্টির শেষযুগে (১৯২১—১৯৪১) অন্যান্য ধারার গানের মতো তাঁর রাগাশ্রয়ী গানগুলিকেও এক স্বতন্ত্র ও মৌলিক রূপ দান করেছেন ও এখানে তিনি কাব্যের খাতিরে রাগরাগিণীর প্রয়োগের ব্যাপারে

শাস্ত্রীয় অনুশাসনকে অনেকসময়ই লঙ্ঘন করেছেন। অবশ্য তার সূচনা তাঁর মধ্যযুগের সংগীত-সৃষ্টি থেকেই শুরু হয়েছিল। এই যুগে রবীন্দ্রনাথের সুর ও বাণীর সমন্বয়ের ওপর পুরো দখল এসে গেছে। এই সময়ে তিনি গানে রাগ-রাগিণীর প্রয়োগের ব্যাপারে রাগের শাস্ত্রীয় রূপের চাইতে রাগের রসলোকের ওপরেই তাঁর সৃষ্টিকে দাঁড় করিয়েছেন বেশী।

রাগাভিত্তিক গানে শেষযুগে তাঁর এই অনবদ্য স্বকীয়তা পরিস্ফুট হয়ে উঠবে যদি আমরা তাঁর আগেকার যুগের রচিত কোনো রাগের ওপর ভিত্তি করে রচিত গানের সঙ্গে তাঁর শেষযুগে সেই একই রাগেরই ওপর ভিত্তি করে রচিত কোনো গানের তুলনা করি। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি এখানে ১৯০৯ সালে বেহাগ রাগে রচিত 'মহারাজ একি সাজে' গানটির সঙ্গে ১৯৩৯ সালে রচিত এই বেহাগের ওপর 'আজি তোমায় আবাব চাই শুনাবারে' গানটির তুলনা করছি।

প্রথমোক্ত গানটি একটি হিন্দী গান ভেঙে রচনা করা হয়েছে ও গানটি ঝাপতালে নিবন্ধ।

নিছক রাগভিত্তিক গানের নিরিখে এই গানটিকে ('মহারাজ একি সাজে') একটি উৎকৃষ্ট রচনা বলে গণ্য করা যেতে পারে। এর ভাব ভাষা চলন সব দিক দিয়েই যেন ধ্রুপদের রাজকীয় চাল ফুটে উঠেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও মনে হয়, এখানে রাগরাগিণী ও শাস্ত্রের বড় প্রাধান্য। রবীন্দ্রনাথ যেন কিছুটা নেপথ্যে পড়ে গেছেন ও এই গান সৃষ্টির কৃতিত্ব পুরোপুরি সবটাই যেন তাঁর নয়, কারণ সুর ও ছন্দের দিক দিয়ে তিনি মূল গানটি দ্বারা প্রভাবিত।

অন্যদিকে দ্বিতীয় ও তাঁর শেষযুগে রচিত 'আজি তোমায় আবার চাই শুনাবারে' গানখানি শুনলেই বোঝা যায় যে এখানে শাস্ত্র ও রাগরাগিণীর ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে আছে গানের কাব্যমণ্ডিত রূপ ও সর্বোপরি এতে প্রাধান্য বিস্তার কবে আছেন স্রষ্টা স্বয়ং (রবীন্দ্রনাথ)। গানখানি শুনলেই প্রথমেই মনকে সমাচ্ছন্ন করে রাখে এর অপূর্ব কাব্যসুষমা ও সুরমূর্ছনা এবং এতে কী রাগরাগিণী প্রয়োগ হলো তার কথা মনেই পড়ে না, অথচ গানখানি বেহাগ রাগের ওপর রচিত।

প্রথম গানের চেয়ে দ্বিতীয় গানের কথা অনেক সহজ সরল ও অনাড়ম্বর। তালের দিক দিয়ে ২/২ ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে ও এই ছন্দ গানের ভেতর দিয়ে অন্তঃসলিলা গতির মতো প্রবাহিত হয়েছে,—কখনো মাথা চাড়া দিয়ে ওপরে ওঠেনি। এর কারণ হলো রবীন্দ্রনাথ সংগীতকে মনের সহজ ভাবসম্মত প্রকাশ বলেই মনে করতেন, আর সেজন্যে কি ছন্দ কি সুর কি উচ্চারণ কি গায়নভঙ্গিতে সব-

সময়েই স্বাভাবিকতার ওপর জোর দিয়েছেন বেশী এবং এর সার্থক ও পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে তাঁর শেষযুগের সংগীত-সৃষ্টিতেই।

তাঁর শেষযুগের গানের বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এদের কোনো একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ভুক্ত করা কঠিন। 'আজি তোমায় আবার চাই শুনাবারে' গানটির কথাই ধরা যাক। এটি বেহাগ রাগে রচিত, সুতরাং একে রাগভিত্তিক গানের পর্যায়ে ফেলা যায়। আবার 'আজি তোমায় আবার চাই শুনাবারে যে কথা শুনায়েছি বারে বারে' বা 'কানে কানে গুঞ্জরিব তাই' সদৃশ কথার জন্যে একে প্রেমসংগীত পর্যায়ভুক্ত করা চলে। আবার, 'অবিরাম বর্ষণধারে' বা 'বাদলের অন্ধকারে' সদৃশ কথা থাকায় একে বর্ষাসংগীতও বলা চলে। তবে এই গানটিকে যে-কোনো পর্যায়ভুক্তই করা হোকনা কেন, সব কিছু ছাপিয়ে এর একটাই পরিচয় ফুটে ওঠে এবং তা হলো এই যে, এটি একটি পুরোপুরি মৌলিক রবীন্দ্র-সৃষ্ট সংগীত।

শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রতি রবীন্দ্রনাথের কী মনোভাব ছিল তা তিনি তাঁর নানা লেখায় ও মতামতের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে গিয়েছেন। তাঁকে অনেক সময়েই এই অভিযোগ শুনতে হয়েছে যে, তিনি শাস্ত্রীয় সংগীতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন এবং তার নিয়মকানুন ও দীর্ঘদিনের অনুসৃত শৃঙ্খলা ভেঙে দিতে উদ্যোগী হয়েছেন। কিন্তু এ অভিযোগ নিতান্ত অমূলক। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য তাঁকে অনেকসময়ই এই অভিযোগ খণ্ডন করতে হয়েছে। এই প্রসঙ্গে তিনি বিভিন্ন সময়ে যা বলেছেন তা কালানুক্রমিক ভাবে তুলে ধরলে এই ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব ও মতামত সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। তাছাড়া এটা ভুললে চলবেনা যে, রবীন্দ্রসংগীতের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথই হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার।

এই বিষয়ে তাঁর মতামত কালানুক্রমিক ভাবে উদ্ধৃত করা হচ্ছে :

"আজ গান শুনিলেই সকলে দেখিতে চান জয়জয়ন্তী, বেহাগ বা কানেড়া বজায় আছে কিনা। অচ্ছা মহাশয় জয়জয়ন্তীর কাছে আমরা এমন কি ঋণে বদ্ধ যে তাহার নিকটে অনন্তর অন্ধ দাস্যবৃত্তি করিতে হইবে? যদি মধ্যমের স্থানে পঞ্চম দিলে ভালো শুনায় আর তাহাতে বর্ণনীয় ভাবের সহায়তা করে তবে জয়জয়ন্তী মরুন বা বাঁচুন আমি পঞ্চমকেই বাহাল রাখিবনা কেন—আমি জয়জয়ন্তীর কাছে এমন কী ঘুষ খাইয়াছি যে তাহার জন্য অত প্রাণপণ করিব?"

—সংগীত ও ভাব, জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৮ (১৮৮১)।

"আমাদের দেশে সংগীত এমনি শাস্ত্রগত, ব্যাকরণগত, অনুষ্ঠানগত হইয়া পড়িয়াছে, স্বাভাবিকতা হইতে এত দূরে চলিয়া গিয়াছে যে অনুভাবের সহিত সংগীতের বিচ্ছেদ হইয়াছে, কেবল কতকগুলা সুরসমষ্টির কর্দম এবং রাগ

রাগিণীর ছাঁচ ও কাঠাম অবশিষ্ট রহিয়াছে, সংগীত একটি মৃত্তিকাময়ী প্রতিমা হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে হৃদয় নাই, প্রাণ নাই"।

—সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা, আষাঢ়, ১২৮৮।

"তবু যত দৌরাত্ম্যই করিনা কেন, রাগরাগিণীর এলাকা একেবারে পার হইতে পারি নাই ; দেখিলাম তাদের খাঁচাটা এড়ানো চলে কিন্তু বাসাটা তাদেরই বজায় থাকে। আমার বিশ্বাস এইরকমটাই চলিবে। কেননা আর্টের পায়ের বেড়িটাই দোষের কিন্তু তার চলার বাঁধা পথটায় তাকে বাঁধেনা।"

—সংগীতের মুক্তি, ভাদ্র, ১৩২৪।

"হিন্দুস্থানী সংগীত ভালো করে শিখলে তা থেকে আমরা লাভ না করেই পারবনা। তবে এ লাভটা হবে তখনই যখন আমরা তাদের দানটা যথার্থ আত্মসাৎ করে তাকে আপন রূপ দিতে পারব। তর্জমা করে বা ধার করে সত্যিকার রস-সৃষ্টি হয়না ; সাহিত্যেও না, সংগীতেও না।"

—আলাপ আলোচনা, মার্চ, ১৯২৫।

'আমি যে গান তৈরী করেছি তার ধারার সঙ্গে হিন্দুস্থানী সংগীতের ধারার একটা মূলগত প্রভেদ আছে এ কথাটা কেন তুমি স্বীকার করতে চাওনা ? তুমি কেন স্বীকার করবেনা যে হিন্দুস্থানী সংগীতে সুর মুক্তপুরুষভাবে আপনার মহিমা প্রকাশ করে ? কথাকে সরিক বলে মানতে সে যে নারাজ। বাংলার সুর কথাকে খোঁজে, চিরকুমার ব্রত তার নয়, সে যুগলমিলনের পক্ষপাতী।"

—আলাপ আলোচনা, মার্চ, ১৯২৫।

"তুমি বলবে আমাদের দেশের গানের বৈশিষ্ট্যই তাই গায়কের রুচি ও শক্তিকে সে নারাজ জায়গা ছেড়ে দেয়। কিন্তু সর্বত্র এ কথা খাটেনা। খাটে কোথায় ? যেখানে গানের চেয়ে রাগিণীই প্রধান। রাগিণী জিনিসটা জলের ধারা, বস্তুত সেই রকম আকৃতি পরিবর্তনের দ্বারাই তার প্রকৃতির পরিচয়। কিন্তু আমি যাকে গান বলি সে হচ্ছে সজীব মূর্তি, যে যেমন খুসি তার হাত পা নাক চোখের বদল করতে থাকলে জীবনের ধর্ম ও মূর্তির মূল প্রকৃতিকেই নষ্ট করা হয়।"

—আলাপ আলোচনা, ডিসেম্বর, ১৯২৫।

"বাংলাদেশে সংগীতের প্রকৃতিগত বিশেষত্ব হচ্ছে গান, অর্থাৎ বাণী ও সুরের অর্ধনারীশ্বর রূপ। কিন্তু এই রূপকে সর্বদা প্রাণবান করে রাখতে হলে হিন্দুস্থানী উৎসধারার সঙ্গে তার যোগ রাখা চাই। আমাদের দেশে কীর্তন ও বাউল গানের বিশেষ একটা স্বাতন্ত্র্য ছিল, তবুও সে স্বাতন্ত্র্য দেহের দিকে, প্রাণের দিকে ভিতরে ভিতরে রাগরাগিণীর সঙ্গে তার যোগ বিচ্ছিন্ন হয়নি।

—সুর ও সংগতি, অগস্ট, ১৯৩২।

"এই ভাষা বহু শতাব্দীর বহু নরনারীর বিচিত্র ভাবনা কামনা ও বেদনার নিরন্তর অভিঘাতে বিশেষ ভাবে প্রাণময় চিন্ময় দীপ্তিময় হয়ে উঠেছে, বিশেষ ভাবে বাঙালীর চিন্তা ও ইচ্ছাকে রূপ দেবার জন্যেই তার সৃষ্টি। এই জন্যে কোনো বাঙালীর যতই প্রতিভার জোর থাক বিদেশী ভাষার ভূমিতে সাহিত্যের কীর্তিস্তম্ভ সে স্থায়িভাবে গড়ে তুলতে পারে না। আমাদের ব্যাংলা ভাষার রূপ বদল হচ্ছে নিয়তই, বদল হতে যে পারে এই তার মহৎ গুণ—কিন্তু সমস্ত বদল হবে তার আদি প্রকৃতির উপর ভর দিয়ে।

গান সম্বন্ধেও এই কথাই খাটে। ভারতবর্ষের বহু যুগের সৃষ্টি করা যে সংগীতের মহাদেশ তাকে অস্বীকার করলে দাঁড়াব কোথায়? পশ্চিম মহাদেশেও বাসযোগ্য স্থান নিশ্চিত আছে; কিন্তু সেখানে ভাড়াটে বাড়ির ভাড়া যোগাব কোথা থেকে?"

—সুর ও সংগতি, ৭ই জানুয়ারি, ১৯৩৫।

"আর্টে যা শ্রেষ্ঠ তা অনুকরণজাত নয়। সেই সৃষ্টি আর্টিস্টের সংস্কৃতিবান মনের স্বকীয় প্রেরণা হতে উদ্ভূত। যে মনোভাব থেকে তানসেন প্রভৃতি বড়ো বড়ো সৃষ্টিকর্তা দরবারী-তোড়ী, দরবারী-কানাড়াকে তাঁদের গানে রূপ দিয়েছেন সেই মনোভাবটিই সাধনার সামগ্রী, গানগুলির আবৃত্তি মাত্র নয়। নূতন যুগে এই মনোভাব যা সৃষ্টি করবে সেই সৃষ্টি তাঁদের রচনার অনুরূপ হবেনা, অনুরূপ না হতে দেওয়াই তাঁদের যথার্থ শিক্ষা; কেননা তাঁরা ছিলেন নিজের উপমা নিজেই। বহু যুগ থেকে তাঁদের সৃষ্টির'পরে আমরা দাগা বুলিয়ে এসেছি, সেটাই যথার্থত তাঁদের কাছ থেকে দূরে চলে যাওয়া। এখনকার রচয়িতার গীত-শিল্প তাঁদের চেয়ে নিকৃষ্ট হতে পারে, কিন্তু সেটা যদি এখনকার স্বকীয় আত্ম-প্রকাশ হয় তা হলে তাতে করেই সেই সকল গুণীর প্রতি সম্মান প্রকাশ করা হবে।"

—সুর ও সংগতি, ১৩ই জুলাই, ১৯৩৫।

"উৎকৃষ্ট হিন্দুস্থানী সংগীত আমি ভালোবাসি বলেছি বহুবারই। কেবল আমি বলি যে ভালো জিনিসকেও ভালোবাসতে হবে কিন্তু মোহমুক্ত হয়ে। সবরকমের মোহই সর্বনেশে। তাজমহল আমার ভালো লাগে বলেই যে তাজমহলের স্থাপত্য-শিল্পের অনুকরণে প্রতি বসতবাটীতে গম্বুজ ওঠাতে হবে এ কখনোই হতে পারে না। হিন্দুস্থানী সংগীত ভালো লাগে বলেই যে তার ক্রমাগত পুনরাবৃত্তি করতে হবে, এ একটা কথাই নয়। অজন্তার ছবি খুবই ভালো কে না মানবে? কিন্তু তাই বলে তার উপর দাগা বুলিয়ে আমাদের চিত্রলোকে মুক্তি খুঁজতে হবে বললে সেটা একটা হাসির কথা হয়। তবে প্রশ্ন ওঠে, অজন্তা থেকে তাজমহল থেকে, হিন্দুস্থানী সংগীত থেকে আমরা কী পাব? না, প্রেরণা—ইনস্পিরেশন।

সুন্দরের একটা মস্ত কাজ এই প্রেরণা দেওয়া। কিসের ? না, নবসৃষ্টির।"

—আলাপ আলোচনা, ২৬শে মার্চ, ১৯৩৮।

তাঁর বিদ্রোহটা হিন্দুস্থানী গানের কোন্‌ বিষয়ের বিরুদ্ধে, তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন : "বাংলা গানে দেখো হিন্দুস্থানী সুরই তো পনেরো আনা। কাজেই কেমন করে মানবো যে বাংলা গানের সঙ্গে হিন্দুস্থানী সংগীতের দা-কুমড়ো সম্পর্ক ? বাংলা গানে হিন্দুস্থানী সুরের শাশ্বত দীপ্তিই যে নবজন্ম পেয়েছে এ কথা ভুললে তো চলবেনা। আমরা যে বিদ্রোহ করেছি সে হিন্দুস্থানী সংগীতের আত্মপ্রসাদের বিরুদ্ধে, গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে, তার আনন্দদানের বিরুদ্ধে না—কেননা আমাদের গানেও তো আমরা হিন্দুস্থানী গানের রাগরাগিণীর প্রেরণাকেই মেনে নিয়েছি। হিন্দুস্থানী সংগীতকে আমরা চেয়েছি, কিন্তু আপনার করে পেলে তবেই না পাওয়া যায় ?"

—আলাপ আলোচনা, ২৬শে মার্চ, ১৯৩৮।

উল্লিখিত মন্তব্যগুলি থেকে এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে রবীন্দ্রনাথ হিন্দুস্থানী সংগীতের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। কিন্তু সেইসঙ্গে তিনি চেয়েছিলেন বাংলা গানকে হুবহু হিন্দুস্থানী ঢং ও রচনা না করে তা থেকে উপাদান ও মালমশলা গ্রহণ করে বাংলা গানকে তার নিজস্ব ধারায় সমৃদ্ধ করতে। তিনি তাঁর গান রচনা করার ব্যাপারে কীর্তনের কথা ও সুরের সামঞ্জস্যের আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন ও বাংলা গানেও এই ধারাই চিরকাল অনুসৃত হয়ে এসেছে। এইখানেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর গান রচনায় সুরধর্মী হিন্দুস্থানী গান, বিশেষ করে খেয়াল গান থেকে সরে এসেছিলেন। গানে রাগরাগিণী ব্যবহার করা হলেও, তার প্রধান লক্ষ্য হবে কথা ও সুরের সামঞ্জস্য এবং তা করতে গিয়ে যদি কোথাও ব্যবহৃত রাগের শাস্ত্রীয় রূপকে কিছু অদলবদল করতে হয়, তবে তা করতে হবে—এটাই ছিল রবীন্দ্রনাথের অভিমত। কথা-সুরের সামঞ্জস্যকে ক্ষুণ্ণ করে রাগের স্বররূপকে প্রাধান্য দিয়ে রাগের শাস্ত্রীয় রূপকে বাঁচানোর তিনি বিরোধী ছিলেন।

উচ্চাঙ্গ সংগীতজ্ঞরাও তো অনেকসময় রাগরাগিণীর মূল রূপটিকে বজায় রেখে মাঝে মাঝে তাতে রাগে অব্যবহার্য স্বর প্রয়োগ করে পরিবেশিত গানে বৈচিত্র্য এনে থাকেন ও তাকে আমরা 'বিবাদী প্রয়োগ' বলে শুধু সমর্থনই করিনা, অনেকসময় সাধুবাদও জানাই। তাই যদি হয় তো গানের বাণী ও ভাবকে পরিস্ফুট করার জন্য রবীন্দ্রনাথের গানে ব্যবহার্য রাগের শাস্ত্রীয় রূপের কিছু বদল বা বর্জনীয় স্বরের প্রয়োগকে সেই সুবাদে সমর্থন করা যাবেনা কেন ?

যদিও রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচিত গানে হিন্দুস্থানী গানের বহু অলংকার বর্জন করেছিলেন ও সবসময় ব্যবহৃত রাগের শাস্ত্রীয় রূপ অক্ষুণ্ণ রাখেননি, তবুও তিনি

হিন্দুস্থানী সংগীতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন, এ কথা কখনই বলা চলে না। তিনি তো স্পষ্টই বলেছেন যে, তাঁর বিদ্রোহ হিন্দুস্থানী সংগীতের আত্মপ্রসাদের বিরুদ্ধে, গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে, তার আনন্দদানের বিরুদ্ধে না ; কেননা তাঁর গানেও তিনি হিন্দুস্থানী গানের রাগরাগিণীর প্রেরণাকেই মেনে নিয়েছেন। একজন কৃতী সমালোচক কবির শাস্ত্রীয় সংগীতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহটা অনেকটা এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন : "Yes, he had an opposition, but that was within the constitution."

তাঁর বিদ্রোহটা ছিল মুখ্যতঃ হিন্দুস্থানী গানের, বিশেষ করে খেয়াল গানের ভাবরূপকে ক্ষুণ্ণ করে অলংকরণের আতিশয্য ও ক্লান্তিকর পৌনঃপুনিকতার বিরুদ্ধে। এই যে, খেয়াল গানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ক্লান্তিকর সুর-বিহার ও তান-বিস্তারে পৌনঃপুনিকতা ও একঘেয়েমি, তা তাঁকে বিশেষভাবে পীড়িত করত। এই বিষয়ে তাঁর মতামত ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাছে তিনি এইভাবে ব্যক্ত করেছিলেন : "গান (শ্রীকৃষ্ণরতনজনকরের গান) আমার খুবই ভালো লাগল। কিন্তু সেই ভালো লাগার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে গোটা কয়েক প্রশ্ন উঠেছে— তোমাকে তার উত্তর দিতেই হবে। গায়কের মুখের গান থামবে কখন ? প্রত্যেক রসসৃষ্টিতেই একটি থামবার ইঙ্গিত থাকে, ধ্রুপদে আছে, বাংলা গানে আছে। যদুভট্টের—গোঁসাইয়ের গলায় ছিল। কিন্তু খেয়ালে থাকবেনা কেন ?"

—সংগীতচিন্তা, পৃ ৩১৪।

উপরোক্ত উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে যদি আমরা রবীন্দ্রনাথের একই রাগের ওপর রচিত বিভিন্ন ভাবের ও রসের গানের পর্যালোচনা করি তবে রবীন্দ্রনাথ কী বলতে চেয়েছিলেন তা পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। রবীন্দ্রনাথ বেহাগ ও ভৈরবী রাগিণীতে অসংখ্য গান রচনা করেছিলেন ও এই দুই রাগকে কত বিচিত্র ও বিভিন্ন ভাবে তার গানে ব্যবহার করেছিলেন তা এক উপভোগ্য গবেষণার বিষয়বস্তু হতে পারে। এই প্রসঙ্গে আমি ভৈরবী রাগিণীর ওপর রচিত ৪টি রবীন্দ্রসংগীতের (আংশিক স্বরলিপিসহ) উল্লেখ করছি, যা থেকে বোঝা যাবে যে একই রাগকে তিনি কীভাবে বিভিন্ন ভাব ও রস প্রকাশের কাজে ব্যবহার করেছেন।

১ তুমি একটু কেবল বসতে দিয়ো কাছে
আমায় শুধু ক্ষণেক তরে।
আজি হাতে আমার যা কিছু কাজ আছে
আমি সাঙ্গ করব পরে॥
না চাহিলে তোমার মুখপানে
হৃদয় আমার বিরাম নাহি জানে

কাজের মাঝে ঘুরে বেড়াই যত
ফিরি কূলহারা সাগরে ॥ —'গীতিমাল্য' ও 'গীতাঞ্জলি'

সা সা -া II সা -া দা | দা পা -া I জ্ঞপা -া পা পমা পা -া I
তু মি ০ এ ক্ টু | কে ব ল্ ব স্ তে দি০ য়ো ০

'দা -া -া | -া -া পা I মা -া -া | সা সা -রা I
কা ০ ০ | ০ ০ ০ ছে ০ ০ | আ ম য়্

I .ৠজ্ঞা জ্ঞা -া | জ্ঞরা জ্ঞা -া I রা জ্ঞা -া ঋ সা -া I
শু ধু ০ | ক্ষ ণে ক্ ত রে ০ | আ জি ০

I ণ্া দ্া -া | ণ্া সা -া I সঋ -া ঋ | ঋ ঋ -সা I
হা তে ০ | আ মা র্ যা ০ কি | ছু কা জ্

I ণ্া সা -া | সা সা -া I সা -া ঋ জ্ঞা -া জ্ঞা I
আ ছে ০ | আ মি ০ সা ঙ্ গ ক র্ ব

I মা মা -া | পা পা -া II
প রে ০ | "তু মি ০"

ভৈরবীতে রচিত এই গানটিতে স্নিগ্ধ প্রেমের রস প্রকাশ পাচ্ছে।

২ জীবনে পরম লগন কোরোনা হেলা কোরোনা হেলা
হে গরবিনী।

বৃথাই কাটিবে বেলা সাঙ্গ হবে যে খেলা—
সুধার হাটে ফুরাবে বিকিকিনি,
হে গরবিনী।

—শ্যামা নৃত্যনাট্যের দ্বিতীয় দৃশ্যে,
সখীর মুখে গাওয়া গান।

[মা -া -ণা | ণা]
II সা -া -দা | দা -পা -ণদা I পা -া পা | পা পা -জ্ঞা I
জী ০ ০ | ব ০ ০০ নে ০ প | র ম ০

I পা -া -দা | দপা -া -ণদপা I মজ্ঞা -া -া | -া -া -া I
ল ০ ০ | গ ০ ০ ০০০ ন ০ ০ ০ | ০ ০ ০

I জ্ঞমা মা মা | মা মা -পা I জ্ঞমা মজ্ঞা জ্ঞা | জ্ঞরা জ্ঞা -া I
কো রো না | হে লা ০ কো রো০ না | হে লা ০

II
I জ্ঞা জ্ঞমা মজ্ঞা | ঋা সা -া
হে গ ০ র | বি নী ০

উপরোক্ত গানটিতে ভৈরবী রাগিণীকে সতর্কীকরণের কাজে ব্যবহৃত হয়েছে।

৩ বোলোনা, বোলোনা, বোলোনা আমি দয়াময়ী।
মিথ্যা মিথ্যা মিথ্যা বোলোনা।

—শ্যামা নৃত্যনাট্যের তৃতীয় দৃশ্যে, শ্যামার মুখে গাওয়া গান।

II র্সজ্জা জ্ঞা জ্ঞা -া | জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা -া I জ্ঞা জ্ঞর্রা র্সজ্জা -া | -া -া -দা -ণা
বো লো না ০ | বো লো না ০ বো লো০ না ০ | ০ ০ ০ ০

I র্সা র্সজ্জা জ্ঞা জ্ঞর্ঋ | জ্ঞ র্ঋা -া র্সা -া I র্ঋা -া র্সা -া | র্ঋ -া র্সা -া I
আ মি দ য়া০ | ম ০ য়ী ০ মি ৎ থা ০ | মি ৎ থা ০

I র্ঋা -া দা -া | -া -া -ণা -র্সা I র্সজ্জা র্ঋা র্সা -া | -া -া -া -া I
মি ৎ থা ০ | ০ ০ ০ ০ বো০ লো ০ ০ | ০ ০ ০ ০

উপরোক্ত গানটিতে ভৈরবী রাগিণী গভীর মর্মবেদনা প্রকাশের ভার নিয়েছে।

৪ কেন এলি, কেন এলি, কেন এলি ফিরে
যাও যাও যাও যাও চলে যাও।
—শ্যামা নৃত্যনাট্যের চতুর্থ দৃশ্যে, বজ্রসেনের মুখে গাওয়া গান।

II র্সজ্ঞা জ্ঞা -র্ঋা | র্ঋর্মা -া -া -জ্ঞা I জ্ঞর্মা র্মজ্ঞা জ্ঞর্ঋা -া | র্সা -া -া -া I
কে ন এ | লি ০ ০ ০ কে০ ন০ এ০০ | লি০০০

I র্সজ্ঞা জ্ঞা র্ঋা র্সা | ণর্সা -া ণদা -ণা I র্সজ্ঞা -া -া -র্ঋা | র্ঋা -া -া -র্সণা I
কে০ ন এ লি | ফি০ ০ রে০ ০ যা০ ০ ০ ও | যা ০ ০ ০ ও

I র্সা -া -া -া | -া -া -ণদা -পা I পা -ণা -া -া | দা -পা মা -জ্ঞা I
যা ০ ০ ০ | ০ ০ ০০ ও যা ০ ০ ও | চ ০ লে ০

I ঋঋা -া -সা -া | -া -া -া -া II
যা ০ ও ০ | ০ ০ ০ ০

এই গানটিতে ভৈরবী রাগিণীর মাধ্যমে কঠোর তিরস্কার ধ্বনিত হচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "আমাদের রাগরাগিণী সেই স্বর্গোদ্যান। ইহা চির-সম্পূর্ণ। এই জন্যই আমাদের রাগরাগিণীর রসটি সাধারণ বিশ্বরস। মেঘমল্লার বিশ্বের বর্ষা, বসন্তবাহার বিশ্বের বসন্ত। মর্তলোকের দুঃখসুখের অন্তহীন বৈচিত্র্যকে সে আমল দেয় না।"

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই রাগরাগিণীকে মানবমনের বিভিন্ন ভাব ব্যক্ত করার কাজে ব্যবহার করেছেন। তাছাড়া স্বরগত ভাবেও ভৈরবী রাগিণীকে বিচিত্র ভাবে তাঁর গানে প্রয়োগ করেছেন এবং ভৈরবীতে রচিত 'হে ক্ষণিকের অতিথি' গানটি বিশ্লেষণ করলেই ধরা পড়বে যে তাতে কড়ি মধ্যম পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়েছে:

ক্ষপা ক্ষপা | পজ্ঞা রা | জ্ঞা -া -া -া
এ০ লে০ | প্র ভা | তে ০ ০ ০

ভৈরবী রাগিণী তাঁর কত প্রিয় ছিল ও তিনি এই রাগিণীর রূপ ও রসকে কত

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছিলেন তা নিম্নে উল্লিখিত ভৈরবীর ওপর তাঁর বিভিন্ন লেখা বা ব্যাখ্যা থেকেই পরিস্ফুট হবে :

"সানাইয়েতে ভৈরবী বাজাচ্ছিল, এমনি অতিবিক্ত মিষ্টি লাগছিল সে আর কি বলব—আমার চোখের সামনেকার শূন্য আকাশ এবং বাতাস পর্যন্ত একটা অন্তর্নিরুদ্ধ ক্রন্দনের আবেগে যেন স্ফীত হয়ে উঠছিল, বড়ো কাতর কিন্তু বড়ো সুন্দর…"

"ভৈরবী সুরের মোচড়গুলো কানে এলে…মনে হয়…ঘর্ষণ বেদনায় সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মর্মস্থল হতে একটা গভীর কাতর করুণ রাগিণী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে।"

"ভৈরবী যেন সমস্ত সৃষ্টির অন্তরতম বিরহ-ব্যাকুলতা"

"ভৈরবী যেন সঙ্গবিহীন অসীমের চিরবিরহ বেদনা"

আর, এটাও লক্ষ্য করবার বিষয় যে তিনি তাঁর সংগীত-সৃষ্টি সম্পূর্ণ করেছেন ভৈরবী রাগিণীতে রচিত 'ওই মহামানব আসে' ও 'হে নূতন দেখা দিক আরবার' এই দুটি গান দিয়েই।

তিনি হিন্দুস্থানী গানের কতকগুলি অনুশাসনকে বিশেষভাবে মেনে চলতেন; যথা—রাগরাগিণীর সঙ্গে তার পরিবেশনের সময়ের সম্পর্ক। যে-সব গানের বাণীতে সকালবেলাকার কথার উল্লেখ আছে তাতে সবসময়েই সকালবেলাকার গেয় রাগ-রাগিণী, যথা ভৈরব কালাংড়া রামকেলী ভৈরবী আশবরী ইত্যাদি রাগ ব্যবহৃত হয়েছে। সন্ধ্যা বা রাত্রির কথার যেখানে উল্লেখ আছে সেখানে সন্ধ্যা বা রাত্রিতে গেয় পূরবী ইমন বেহাগ কানাড়া—এইসব রাগের প্রয়োগ হয়েছে। এটা কখনই দেখা যায় না যে, 'আমার গোধূলি লগন এল বুঝি কাছে' বা 'সন্ধ্যা হলো গো' সদৃশ গানে সকালে গেয় কোনো রাগরাগিণীর প্রয়োগ করা হয়েছে বা 'ওরে নূতন যুগের ভোরে' সদৃশ গানে সন্ধ্যায় বা রাত্রিতে গেয় কোনো রাগ ব্যবহার করা হয়েছে।

সময়ের সঙ্গে রাগরাগিণীর যে একটা বিশেষ সম্পর্ক আছে ও সে-বিষয়ে শাস্ত্রকারদের অনুশাসনের বিরুদ্ধে যাওয়া বা তার নিয়ম না মেনে রাগরাগিণীর যথেচ্ছ ব্যবহারকে যে তিনি বিশেষ পছন্দ করতেন না, তা তাঁর নিজের লেখা পড়লেই বোঝা যাবে :

"একটি সংগীতকুশল লোক অর্ধেক রাত্রে ভৈরোঁ আলাপ করতে লাগল, বিবিধ কারণে সেটা নিতান্ত অসাময়িক বলে বোধ হতে লাগল।"

শাস্ত্রকারগণ ঋতুর সঙ্গে রাগরাগিণীর যে সম্পর্ক বেঁধে দিয়েছেন, অর্থাৎ বর্ষায় দেশ বা মল্লার, বসন্তঋতুর গানে বাহার, বসন্ত ইত্যাদি গাওয়ার ব্যবস্থা

হয়েছে, তা তিনি তার সংগীত-সৃষ্টির মধ্যযুগ পর্যন্ত সাধারণভাবে মেনেই চলেছেন, যদিও তাঁর শেষযুগের সংগীত-সৃষ্টিতে তার ব্যতিক্রম দেখা যায়, কারণ সেখানে প্রকৃতি ও মানুষ অভিন্ন হয়ে তার ঋতুসংগীতগুলি শুধু প্রকৃতির বর্ণনাতেই আবদ্ধ থাকেনি। ঋতু বা প্রকৃতির প্রভাবে মানবমনের বিভিন্ন অভিব্যক্তি তাতে ব্যক্ত হয়ে, সেগুলি প্রেম বা মানবসংগীতে রূপান্তরিত হয়েছে। সুতরাং সেখানে সেইসব গানকে ঋতুর অনুযায়ী রাগরাগিণীতে আবদ্ধ করে রাখার আর প্রয়োজনীয়তা থাকেনি।

ভারতীয় সংগীতশাস্ত্র ও রাগরাগিণীর সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারটি তিনি কত গভীরভাবে বুঝতে চেষ্টা করেছিলেন তা তাঁর 'সংগীত ও ভাব' প্রবন্ধে পূরবী ও ভৈরব রাগের সময় নির্দেশের ব্যাখ্যা থেকেই বোঝা যাবে—সেখানে তিনি বলেছিলেন: "এই মনে করুন—পূরবীতেই বা কেন সন্ধ্যাকাল মনে আসে আর ভেরোঁতেই বা কেন প্রভাত মনে আসে? পূরবীতেও কোমল সুরের বাহুল্য আর ভেরোঁতেও কোমল সুরের বাহুল্য, তবে উভয়েতে বিভিন্ন ফল উৎপন্ন করে কেন? তাহা কি কেবল মাত্র প্রাচীন সংস্কার হইতে হয়? তাহা নহে। তাহার গূঢ় কারণ বিদ্যমান আছে।" এই গূঢ় কারণটি কী তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলেন: "প্রভাত ও সন্ধ্যায় কি বিষয়ে প্রভেদ থাকা উচিত? না, একটাতে সুরের ক্রমশঃ উত্তরোত্তর বিকাশ হওয়া আবশ্যক আর একটাতে অতি ধীরে ধীরে সুরের ক্রমশঃ নিমীলন হইয়া আসা আবশ্যক। ভেরোঁতে ও পূরবীতে সেই বিভিন্নতা রক্ষিত হইয়াছে। এই জন্যই প্রভাত ও সন্ধ্যা উক্ত দুই রাগিণীতে মূর্তিমান!" কী অপূর্ব ব্যাখ্যা! এরূপ সুনিপুণ বিশ্লেষণ বোধ হয় অধিকাংশ শাস্ত্রবিদদের ধারণা ও সাধ্যের বাইরে। অন্তত আমি কোনো সংগীত-শাস্ত্রগ্রন্থে রাগরাগিণীর সঙ্গে সময়ের সম্পর্কের ওপর এরূপ যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা দেখতে পাইনি।

তাঁর 'সংগীতের মুক্তি' প্রবন্ধে ভারতীয় সংগীতে শ্রুতির ব্যবহার ও প্রয়োগ সম্বন্ধে তিনি যে মন্তব্য করেছেন, অর্থাৎ "এই শ্রুতি আমাদের গানের সূক্ষ্ম স্নায়ুতন্ত্র। ইহারই যোগে এক সুর কেবল যে আর এক সুরের পাশাপাশি থাকে তা নয়, তাদের মধ্যে নাড়ীর সম্বন্ধ ঘটে। এই নাড়ীর সম্বন্ধ ছিন্ন করিলে রাগ-রাগিণী যদি বা টেঁকে তাদের ছাঁদটা বদল হইয়া যায়'—তাঁর ভারতীয় সংগীত সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের পরিচয় সূচিত করে। তাছাড়া তাঁর গানে তিনি বিশেষ বিশেষ শ্রুতির ব্যবহার করে গেছেন তা তাঁর ভৈরবীতে রচিত 'অন্ধজনে দেহ আলো' বা তাঁর শেষযুগে রচিত 'দিনান্ত বেলায় শেষের ফসল নিলেম' গানে, যার স্বরলিপি স্বরবিতান-৫৯ খণ্ডে আছে, তার মধ্যেই পাওয়া যাবে।

এ ছাড়া আর একটি বিষয় নিয়েও আলোচনা করা প্রয়োজন। তা হলো

যে, রাগরাগিণীর স্বরগত শাস্ত্রীয় রূপ ছাড়া তাদের আর একটি রূপও তাঁর কাছে ধরা পড়েছিল এবং তা হলো তাদের ভাবব্যঞ্জনাময় রূপ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সংগীত ও ভাব' প্রবন্ধে বলেছেন: "কোন কোন রাগরাগিণীতে কী কী সুর লাগে না লাগে তাহা তো মান্ধাতার আমলে স্থির হইয়া গিয়াছে, তাহা লইয়া আর অধিক পরিশ্রম করিবার কোনো আবশ্যক দেখিতেছিনা। এখন সংগীতবেত্তারা যদি বিশেষ মনোযোগ সহকারে আমাদের কী কী রাগিণীতে কী কী ভাব আছে তাহাই আবিষ্কার করিতে আরম্ভ করেন তবেই সংগীতের যথার্থ উপকার করেন।"

তাঁর 'অন্তর বাহির' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন: "বিশ্বেশ্বরের খাস মহলের গোপন নহবতখানায় যে কালে কালে ঋতুতে ঋতুতে নব নব রাগিণী বাজিতেছে, আমাদের গুণীদের অন্তঃকর্ণে তাহা প্রবেশ করিয়াছে। বাহিরের প্রকাশের অন্তরালে যে একটি গভীরতর অন্তরের প্রকাশ আছে, আমাদের দেশের টোড়ি কানাড়া তাহাই জানাইতেছে।"

মনে হয়, রাগরাগিণীতে কী কী ভাব আছে ও তাদের বাইরের প্রকাশের অন্তরালে যে একটি গভীরতর অন্তরের প্রকাশ আছে, তা কবির নিকট ধরা পড়েছিল, তাইতো ভৈরবী শুধু কোমল 'রে গা ধা নি' যুক্ত সম্পূর্ণ শ্রেণীর রাগ নয়, সে যেন "সঙ্গীবিহীন অসীমের চিরবিরহবেদনা", মুলতান যেন শুধু টোড়ী ঠাটের কোমল রে, গা, ধা ও কড়ি মা যুক্ত রাগ নয়, সে যেন "রৌদ্রতপ্ত দিনান্তের ক্লান্ত নিঃশ্বাস", পূরবী যেন শুধু কোমল রে ধা ও দুই মধ্যম যুক্ত সম্পূর্ণ শ্রেণীর রাগ নয়, সে যেন "শূন্য গৃহচারিণী বিধবা সন্ধ্যার অশ্রুমোচন", ইত্যাদি। অনেক-সময়েই রবীন্দ্রনাথ গানে রাগরাগিণীর প্রয়োগের ব্যাপারে স্বরগত শাস্ত্রীয় রূপের চাইতে তাদের ভাবব্যঞ্জনাময় রূপ, যা তাঁর কাছে ধরা পড়েছিল, তাই বেশী ব্যবহার করেছেন ও তাঁর গানে অনেকসময়েই তিনি এমন সব সুরই খুঁজে বেড়িয়েছেন যা হৃদয়াবেগের বিশেষত্বগুলি প্রকাশ করে—রাগরাগিণীর শাস্ত্রগত ও স্বরগত সাধারণ রূপ নয়। শুধু তত্ত্বের দিকে দিয়েই নয়, প্রায়োগিক (practical) দিক দিয়েও রবীন্দ্রনাথ রাগরাগিণীর ভাবব্যঞ্জনাময় রূপ প্রকাশের ব্যাপারে কত বড় একজন শিল্পী ছিলেন, তা আমাদের অনেকেরই জানা নেই, কারণ তিনি যখন যৌবনে অত্যন্ত সুকণ্ঠ গাইয়ে ছিলেন তখনকার তাঁর গান শুনবার সৌভাগ্য আমাদের অনেকেরই হয়নি। এই বিষয়ে সরলা দেবী বলেছেন:

"ছেলেবেলা থেকেই গান গাই বটে, গান কুড়িয়ে নিই যেখান থেকে পাই—কিন্তু গানের অধিষ্ঠাতা দেবতাকে প্রথম দেখতে শিখি রবিমামার সংস্পর্শে যখন গাজিপুরে তাঁর কাছে থাকি। সত্যি সত্যি গান জিনিষটা যে একটা যান্ত্রিক কিছু নয়—সঙ্গীতের বুকের ভিতর যে একটা দিব্য প্রাণী বিরাজ করেন, সে অনুভূতির

একটা আবছায়া আবছায়া স্পর্শ পেতে থাকি গাজিপুরে—রবিমামার মুখে চোখে সেই সংগীতদেবতার প্রতিচ্ছায়া দেখে। সকালে দুপুরে সন্ধ্যায় যখনি গানের চর্চায় তিনি নিযুক্ত হতেন আমাদের সঙ্গে নিয়ে সে কোন ওস্তাদকে বসিয়ে তবলা পাখোয়াজের চাঁটিতে ধুমধুমাকারের চর্চায় নয়, কিম্বা নিজেরই তৈরী গান আমাদের শেখানোর চর্চা নয়—সেটি সংগীতের রূপ ও রসের পিছনে পিছনে নিজের ঘোরা ও আমাদের ঘোরানোর চর্চা। তখনকার অপরিণত বয়সে তাঁর ক্রিয়াটার শুধু অনুসরণ করেছি মাত্র, কি যে করেছি তা ভাবিনি। মনে পড়ে সে দিনগুলোর কোন কোন দিনে কৃষ্ণধন বাঁড়ুর্যের স্বরলিপির বই ধরে ধরে এক একটি গান বের করা আর ভোগ করা কেমন 'তুঁ কেউঁ রোদিয়া' সেই যে 'রোদিয়া'বা বোরুদ্যমানা মেয়েটি তার রোদনের চেহারাখানি কত ভঙ্গিমায় কত অনুকম্পে কত মধুরিমায় কত ফুটে উঠেছে তার বুকে—যে তাকে দেখে দেখে গাইছে! মরি! মরি! আবার বেহাগে 'সাই তুঁহি…আঁধিরাত বারবার'—এতে কথা ও সুর দুইয়ে মিলিয়ে বেহাগের কত টানটুন কত ঘোরফের।…গানের সুর চিনতে শিখেছিলাম আগে, কিন্তু সুরের রূপ চিনতে শিখলুম গাজিপুরে। রামকেলী বা আসাবরী, ভৈরোঁ বা ভৈরবী, বেহাগ বা ছায়ানট, কেদারা বা কানাড়া, পিলু বা মুলতান—এরা সব জানা গানের উপর কতকগুলো ছাপমারা নাম মাত্র নয়, এদের প্রত্যেকের একটি বিশিষ্ট চেহারা আছে, ছবি আছে—যে ছবিগুলি গাইতে গাইতে আকাশপটে ফুটে উঠে, মানুষের মুখের ছবিরই মত, সুরের সেই ছবিদের একখানির সঙ্গে আর একখানির সম্পূর্ণ মিল হয়না। তারা প্রত্যেকে এক একটি গান-পুরুষ, সুরের ও মাত্রার অদলবদলে তাদের চেহারার অদলবদল হয়ে যায়।"

—'গানের ভিতর দেবদর্শন', সরলা দেবী।

উপরের লেখা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ শাস্ত্রীয় সংগীতের তত্ত্বের দিক থেকে যে শুধু মর্মস্থানেই প্রবেশ করেছিলেন তা নয়, তার প্রায়োগিক দিকটায়ও তাঁর যথেষ্ট দক্ষতা ছিল।

এই প্রসঙ্গে আর একটু ব্যাপারেও একটু আলোচনা করে নেবার প্রয়োজন বোধ করছি, যদিও ধ্রুপদ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে এই বিষয়ে কিছু আলোচনার সূত্রপাত ইতিপূর্বেই করা হয়েছে।

বর্তমান যুগে আমরা শাস্ত্রীয় সংগীত বলতে প্রধানত সুরধর্মী খেয়াল ও ঠুংরী গানকেই বুঝে থাকি, কারণ এদের দাপট ও প্রাধান্যই বেশী। কিন্তু প্রাচীনকালে শাস্ত্রীয় সংগীত বলতে প্রধানত ধ্রুপদী গানকেই বোঝাত ও ধ্রুপদ গানে বাণী খেয়ালের মতো অকিঞ্চিৎকর ছিল না। শোনা যায়, তানসেন যে

শুদ্ধ বাণীর ধ্রুপদ রচনা করেছিলেন তাতে গানের বাণীতে যথেষ্ট কবিত্বশক্তির প্রকাশ দেখা যেতো ও গানের পরিবেশন পদ্ধতিও ছিল সহজ সরল।

চারতুকে গঠিত ধ্রুপদের দীর্ঘ কবিতাকে অবলম্বন করে যে-সুর বা রাগ-রাগিণীর প্রয়োগ করা হ'ত তা শুধু গেয়ে গেলেই নাকি গানে ব্যবহৃত রাগের বিস্তার ও পরিচয়টা অনেকটা স্পষ্ট হয়ে উঠত। ধ্রুপদে আড়ী কুয়াড়ী ও লয়কারীর নানা কসরৎ আমদানি হয় পরবর্তী যুগে খেয়ালের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে। সুতরাং সেই বিচারে রবীন্দ্রনাথের চারতুকে গঠিত, ধ্রুপদের স্থাপত্যে, কথা ও সুরের অপূর্ব সমন্বয়ে রচিত গানগুলিকে প্রাচীন ও অভিজাত শাস্ত্রীয় সংগীতেরই অনুসারী বলা চলে, যদিও তা হয়তো সুরধর্মী খেয়ালের আদর্শে গঠিত নয়।

তবে আমার মতে, রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হলো রাগরাগিণীকে তাদের নৈর্ব্যক্তিক লোক থেকে নামিয়ে নিয়ে এসে মানুষের সুখদুঃখের নানা অনুভূতি প্রকাশের প্রয়োজনে ব্যবহার করা ও তার দ্বারা শাস্ত্রীয় সংগীতে এক বৈপ্লবিক কাণ্ড ঘটানো। এর মূলে হয়তো পাশ্চাত্য সংগীতের প্রভাব কিছু কাজ করে থাকবে, কিন্তু তা হলেও এই ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের অবদান ও কৃতিত্ব তর্কাতীত।

হিন্দুস্থানী গানের মালমশলা ও উপাদানকে গ্রহণ করে বাংলা গানকে এক নতুন রূপ রবীন্দ্রনাথ দিয়ে গেছেন ও বাংলা গানকে কি করে ঐসব উপাদানের সাহায্যে সমৃদ্ধতর করা যায় তার পথের ইঙ্গিত তিনি তাঁর নব নব সৃষ্টির মাধ্যমে দিয়ে গেছেন। কিন্তু তাঁর সেই প্রদর্শিত পথ ধরে মনে হয় আমরা আর অগ্রসর হতে পারিনি; ফলে, রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক রাগরাগিণীর বিচিত্র প্রয়োগ ও মিশ্রণে যে অপূর্ব বাংলা গানের সৃষ্টি হয়েছিল, সেই মানের বাংলা গান এখন আর রচিত হতে বড় একটা দেখা যায় না।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে বহু রাগরাগিণীর মিশ্রণ করে তাদের বিচিত্রভাবে ব্যবহার করে গেছেন। এই অপূর্ব মিশ্রণের ফলে এমন অনেক সুরের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যাতে স্বতন্ত্র ও নতুন নতুন রাগরাগিণীর সম্ভাবনার ইঙ্গিত মেলে। উচ্চাঙ্গ সংগীতশাস্ত্রবিদরা যদি এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে রবীন্দ্রনাথের রাগভিত্তিক গানগুলিকে বিশ্লেষণ করেন, তবে হয়তো অনেক নতুন রাগরাগিণীর সন্ধান দিতে পারবেন। এই বিষয়ে বিস্তৃত গবেষণার অবকাশ আছে ও এতে উচ্চাঙ্গ সংগীতও বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হতে পারে।

রবীন্দ্রনাথও চেয়েছিলেন, শাস্ত্রীয় সংগীতে শিক্ষিত অথচ তার অন্ধসংস্কার থেকে মুক্ত ও বাংলা গানের প্রতি দরদী, এরূপ সংগীতজ্ঞরাই তাঁর গানের প্রচার ও সংরক্ষণের ভার নিন। এ দায়িত্বটা তিনি অশিক্ষিতপটু সংগীতজ্ঞ, যাদের মূলধন

শুধু কণ্ঠলাবণ্য তাদের হাতে ছেড়ে দেবার কখনই পক্ষপাতী ছিলেন না।

কবি বিশ্বাস করতেন যে বাংলা গানকে নব নব সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যেতে পারেন তাঁরাই যারা শাস্ত্রীয় সংগীতে শিক্ষিত এবং বোধহয় এই ধারণার বশবর্তী হয়েই তিনি শান্তিনিকেতনের সংগীতভবনে রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে হিন্দুস্থানী সংগীত-শিক্ষারও ব্যবস্থা করেছিলেন। এই বিষয়ে আলাপ-আলোচনায় দিলীপকুমার রায়ের নিকট তিনি তাঁর মত যেভাবে ব্যক্ত করেছিলেন তা থেকে এই বিষয়টি আরো পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। তিনি বলেছিলেন: "হিন্দুস্থানী গানের সুরকে ত আমরা ছাড়িয়ে যেতে পারিইনা। আমাকে ত নিজের গানের সুরের জন্য ওই হিন্দুস্থানী সুরের কাছেই হাত পাততে হয়েছে। আর এতে যে দোষের কিছুই নেই এ কথাও ত আমি সাহিত্যের উপমা দিয়ে বললাম। কাজে কাজেই হিন্দুস্থানী গান ভালো করে শিখলে তার প্রভাবে যে বাংলা সংগীতে আরও নূতন সৌন্দর্য আসবে এটাই তো আশা করা স্বাভাবিক। তাই তোমরা এ চেষ্টা যদি কর তবে তোমাদের উদ্যোগে আমার অনুমোদন আছে এ কথা নিশ্চয়ই জেনো…বাংলার বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে কেমন করে নূতন সৌন্দর্য বাংলা সংগীতে ফুটানো যেতে পারে এটা একটা সমস্যা। তবে চেষ্টা করলে এ সমস্যার সমাধানও না মিলেই পারেনা। এ কথা স্মরণ রেখে যদি তুমি হিন্দুস্থানী সংগীত assimilate করে বাংলার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য সাধন করতে পার, তা হলে তুমি সগরের মতনই সুরের সুরধুনী বইয়ে দিতে পারবে।"

—আলাপ আলোচনা, ২৯ মার্চ ১৯২৫।

আমার মতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানকে কতখানি হিন্দী গানের আদর্শে গড়তে পেরেছিলেন—এ আলোচনার চাইতে তিনি হিন্দী গানের উপাদান গ্রহণ করে কি-ভাবে বাংলা গানকে সমৃদ্ধতর করে গেছেন—এটাই তাঁর রাগভিত্তিক গানের বিচার্য বিষয় হওয়া উচিত।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে হিন্দুস্থানী গান থেকে অনেক উপাদান ও মালমসলা সংগ্রহ করেছিলেন এ কথা যেমন সত্য, তার চাইতেও বড়ো সত্য বোধহয় যে তিনি শাস্ত্রীয় সংগীত থেকে শুধু গ্রহণই করেননি—তিনি তাকে কিছু দিয়েও গেছেন, আগামী দিনে তার সৃষ্টি কোন্ পথে যাবে বা যাওয়া উচিত, তারও যেন ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন তাঁর নানা লেখা ও সংগীতসৃষ্টির মাধ্যমে। এ কথা নিশ্চিতভাবে সত্য যে, তিনি প্রাচীন ভারতীয় সংগীতকে মোটেই ভাঙেননি; তিনি আঘাত করেছেন ও ভাঙতে চেয়েছেন তার জড়ত্বের সম্ভাবনাকে। সেই বিচারে তাঁকে ভারতীয় সংগীতের মুক্তির অন্যতম পথপ্রদর্শক বলে অভিহিত করলে বোধহয় খুব একটা বাড়িয়ে কিছু বলা হবে না।

অনেকসময়েই রবীন্দ্রনাথকে, তাঁর প্রথমযুগের হিন্দুস্থানী-গান-ভাঙা ও অন্যান্য রাগভিত্তিক গানগুলির জন্যে, একজন শাস্ত্রজ্ঞ ও ওস্তাদ বলে প্রতিপন্ন করে অনেকে তাঁকে ওস্তাদী মহলে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। আমার মতে এই প্রচেষ্টায় রবীন্দ্রনাথকে ছোটই করা হয়। কারণ তিনি ছিলেন স্রষ্টা, ওস্তাদের চেয়ে অনেক বড়ো।

যদুভট্ট সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন: "বাল্যকালে যদুভট্টকে জানতাম, তিনি ওস্তাদ জাতের চেয়ে ছিলেন অনেক বড়ো। তাঁকে গাইয়ে বলে বর্ণনা করলে খাটো করা হয়। তাঁর ছিল প্রতিভা অর্থাৎ সংগীত তাঁর চিত্তের মধ্যে রূপ ধারণ করত····· সম্ভবত তাঁর চেয়ে বড়ো ওস্তাদ তখন হিন্দুস্থানে অনেক ছিল··· ·· কিন্তু যদুভট্টের মতো সংগীতভাবুক আধুনিক ভারতে আর কেউ জন্মেছে কিনা সন্দেহ।" রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও হুবহু এই উক্তি করা যায়।

রবীন্দ্রসংগীত ও তার দুই যুগ

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "প্রথম বয়সে আমি হৃদয়ভাব প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছি গানে, আশা করি সেটা কাটিয়ে উঠেছি পরে। পরিণত বয়সের গান ভাব বাৎলাবার জন্যে নয়, রূপ দেবার জন্যে। তৎসংশ্লিষ্ট কাব্যগুলিও অধিকাংশই রূপের বাহন।"

—সংগীত-চিন্তা, পৃ. ১৭৯।

মনে হয়, রবীন্দ্রনাথেয় এই উক্তির একটু বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন।

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে কবির প্রথমযুগের সংগীতসৃষ্টিতে হৃদয়ের আবেগ প্রকাশই প্রাধান্য পেয়ে আসছে, কল্পনার রূপলীলা তাতে বড়ো একটা স্থান পায়নি। কিন্তু তাঁর শেষযুগের গানগুলির প্রকৃতি কিন্তু একটু ভিন্ন। এই বিষয়ে ইন্দিরা দেবী তাঁর সংগীত-স্মৃতি প্রবন্ধে বলেছেন: "তিনি (অর্থাৎ কবি) নিজে আমাকে বলেছেন, 'আমার আগেকার গানগুলি ইমোশনাল, এখনকারগুলি ইসথেটিক'।"

মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ যখন ১৯৩৫ সালের জুলাই মাসে একটি চিঠিতে ধূর্জটি-প্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন "উচ্চ অঙ্গের আর্টের উদ্দেশ্য নয় দুই চক্ষু জলে ভাসিয়ে দেওয়া, ভাবাতিশয্যে বিহ্বল করা। তার কাজ হচ্ছে মনকে সেই কল্পলোকে উত্তীর্ণ করে দেওয়া যেখানে রূপের পূর্ণতা" তখন শেষযুগের তাঁর গানের এই রূপান্তরের কথাই তাঁর মনে হয়েছিল বা বলতে চেয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের ধারণা ছিল যে তাঁর প্রথমদিককার নাটকের চরিত্রগুলিতে বড়ো বেশী দুর্বল ভাবালুতা প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর জীবনের শেষদিকে তিনি অনেক নাটকের এই কারণে আমূল পরিবর্তন করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর গানেও এর

প্রতিফলন দেখা দিয়েছিল।

তাঁর প্রথমযুগে রচিত গীতিনাট্য মায়ার খেলাতে "আমি কারেও বুঝিনে, শুধু বুঝেছি তোমারে" গানটি বেহাগ রাগিণীতে রচিত। পরবর্তীকালে কবি যখন গীতিনাট্য মায়ার খেলাকে নৃত্যনাট্যে পরিণত করতে উদ্যোগী হলেন তখন এই গানটির ওপরই ভিত্তি করে রচনা করলেন, "যে ছিল আমার স্বপনচারিণী তারে বুঝিতে পারিনি" গানটি। এই দুটি গানের যদি আমরা ভাব, ভাষা ও সুরের গঠনের দিক দিয়ে তুলনা করি তবে বোধ হয় আমরা রবীন্দ্রনাথের দুই যুগের গানের রূপের পার্থক্য এবং কবি তাঁর পরবর্তী সংগীতসৃষ্টিকে কি-ভাবে রূপ দিতে চেয়েছিলেন তা অনেকটা বুঝতে পারব। ভাব ও ভাষাগত পার্থক্য বোঝাবার জন্যে এই দুটি গানের অংশ নিচে উদ্ধৃত করা হলো :

১ আমি কারেও বুঝিনে, শুধু বুঝেছি তোমারে।
তোমাতে পেয়েছি আলো—সংশয় আঁধারে॥
ফিরিয়াছি এ ভুবন, পাইনিতো কারো মন
গিয়েছি তোমারি শুধু মনের মাঝারে। —গীতিনাট্য, মায়ার খেলা।

২ যে ছিল আমার স্বপনচারিণী
তারে বুঝিতে পারিনি।
দিন চলে গেছে খুঁজিতে খুঁজিতে।
শুভখনে কাছে ডাকিলে লজ্জা আমার ঢাকিলে গো—
তোমারে সহজে পেরেছি বুঝিতে। —নৃত্যনাট্য, মায়ার খেলা।

প্রথম গানটির ভাব ও ভাষা অনেকটা সহজ কিন্তু পরের গানটি ভাব ও ভাষার দিক দিয়ে পরিবর্তিত হয়ে কিছুটা নৈর্ব্যক্তিক রূপলাভ করেছে, যা তাকে আগের আবেগপ্রধান গান থেকে কিছুটা পৃথক করে দিয়েছে। এই পরিবর্তনটি আরো বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠবে যদি আমরা প্রথমযুগে রচিত "হৃদয়বেদনা বহিয়া প্রভু, এসেছি তব দ্বারে" বা "অনিমেষ আঁখি সেই কে দেখেছে" ব্রহ্মসংগীত দুটির, সঙ্গে পরবর্তীকালে রচিত পূজার গান "তোমার আমার এই বিরহের অন্তরালে" বা "আমার না-বলা বাণীর ঘন যামিনীর মাঝে" গান দুটির তুলনা করি।

প্রথমযুগের গানগুলি মানুষের সাধারণ জীবন ও চিন্তার সঙ্গে এত সামঞ্জস্যপূর্ণ যে, তাদের বুঝতে আমাদের বিশেষ কষ্ট হয় না বা চিন্তা করতে হয় না; কিন্তু তাঁর শেষযুগের গানগুলি একটু ভিন্ন প্রকৃতির। সেগুলি আর শুধু মানুষের দুঃখ-সুখ, বিরহ-মিলনের মধ্যেই আবদ্ধ নয়। এইসব গান ব্যক্তিগত মানবিক অনুভূতি ছাড়িয়ে আরো বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রসারিত ও এইসমস্ত গান বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কবির ব্যক্তিগত অনুভূতিকে অবলম্বন করে নৈর্ব্যক্তিক

বিশ্বমানবতার দিকে প্রসারিত হয়েছে।

সুসাহিত্যিক প্রমথনাথ বিশী তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন' গ্রন্থে এই দুই যুগের সংগীতরচনার বিভিন্নতাকে এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন : "তাঁহার প্রথমবয়সের গান আবেগপ্রধান, শেষবয়সের গান সৌন্দর্যপ্রধান। প্রথমবয়সের গানের মুখ বিরহমিলনপূর্ণ খণ্ড ক্ষুদ্র সংসারের দিকে; শেষবয়সের গানের মুখ বিরহমিলনাতীত অখণ্ড সৌন্দর্যলোকের দিকে।" যদিও এটা অবশ্যস্বীকার্য যে রচনার বিচারে রবীন্দ্রনাথের শেষযুগের গানগুলি উৎকৃষ্ট এবং সেগুলি পুরোপুরি রাবীন্দ্রিক ও মৌলিক সৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে, কিন্তু তা হলেও এটা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে সাধারণ মানুষ অনেকক্ষেত্রেই তাঁর প্রথম-যুগের রচিত সহজ সরল গানগুলিকেই পছন্দ করে বেশী, তাদের ভাব ও ভাষা সহজ বলে। এমনকি রবীন্দ্রনাথের কাছেও তাঁর এই প্রথমযুগের গানগুলিই বোধ হয় বেশী প্রিয় ছিল, কারণ গাইতে বললে, তিনি এই যুগের গানগুলি, বিশেষ করে "মরি লো মরি, আমায় বাঁশীতে ডেকেছে কে", "কাঙাল আমারে কাঙাল করেছ", "বড়ো বেদনার মতো", "তবু মনে রেখো" এইসব গানই গাইতেন বেশী। প্রথমযুগের এই সহজ সরল গানগুলির এত জনপ্রিয়তার কারণ কি? এর কারণ বোধ হয় এই যে সহজ সরল আবেগপ্রধান এইসব গান আমাদের মনকে যত সহজে নাড়া দেয়, পরবর্তীকালের রূপ ও সৌন্দর্যপ্রধান দার্শনিক তত্ত্বসমন্বিত কিছুটা নৈর্ব্যক্তিক গানগুলি এত সহজে আমাদের মনকে নাড়া দেয় না—এ গানগুলির তাৎপর্য এবং সৌন্দর্যকে ভালোভাবে উপলব্ধি করতে হলে আমাদের একটু চিন্তা করতে হয় বা ভাবতে হয় এবং এগুলি অনেকটা সংস্কৃতিবান মনের খোরাক।

সাধারণত দেখা যায় যে, শিল্প বা সাহিত্যে যে কোনো স্রষ্টার তাঁর প্রথম সৃষ্টির প্রতি মমত্ববোধ থাকে বেশী। রবীন্দ্রনাথের প্রথমযুগের এই সৃষ্টি যা তাঁর প্রথমবয়সের হৃদয়ের অনুভূতিকে আশ্রয় করে অনেকসময় প্রকাশলাভ করেছিল, সেই কথাই তাঁর বিশেষভাবে মনে পড়তো এবং সেইসব গানই তিনি গাইতেন বেশী। এই বিষয়ে মৈত্রেয়ী দেবীর কাছে তাঁর মনোভাব এইভাবে ব্যক্ত করেছিলেন : "আজকাল আমার গানে খুব কারুকলা চারুশিল্প এ আমার মনে থাকেনা—আগেকার সহজ কথার সহজ মিঠে সুরের গানগুলিই মনে আছে আমার······মনে রয়ে গেল মনের কথা—

শুধু চোখের জল প্রাণের ব্যথা

এই সব হলো আমার আগেকার গান—এ গান তোমরা কখনো শোনোনি, এখনকার গানের সঙ্গে এর অনেক প্রভেদ।" — 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, মৈত্রেয়ী দেবী'।

কবির শেষজীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাপঞ্জী

১৯২১—বিদেশ-ভ্রমণ।

১৯২২, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর—দক্ষিণ-পশ্চিম ভারত ও সিংহল ভ্রমণ।

১৯২৩, মার্চ—চীন যাত্রা ;

২৯ মে—জাপানে পেঁছানো ;

২৪ সেপ্টেম্বর—পঞ্চমবার ইউরোপ যাত্রা।

১৯২৬, মে—নটীর পূজা অভিনয় ;

১২ মে—ষষ্ঠবার ইউরোপ যাত্রা।

১৯২৭, জুলাই থেকে অক্টোবর—দ্বীপময় ভারত ভ্রমণ।

১৯২৭-২৮—মহুয়া রচনা।

১৯২৮, জুন—'শেষের কবিতা' রচনা।

১৯২৯—জাপান ও কানাডা ভ্রমণ।

১৯৩০—সপ্তমবার বিলাত যাত্রা ;

মে, হিবার্ট বক্তৃতামালা ;

১৪ জুলাই—আইনস্টাইনের সঙ্গে সাক্ষাৎ।

১৯৩২—ইরাণ যাত্রা।

১৯৩৩, জানুয়ারি—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কমলা বক্তৃতামালা।

১৯৩৪—সিংহল পরিভ্রমণ ;

দিনেন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে কলিকাতা আগমন।

১৯৩৫, জুলাই—দিনেন্দ্রনাথের মৃত্যু।

১৯৩৬, মার্চ—এম্পায়ার থিয়েটারে চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য অভিনয়।

১৯৩৭, ফেব্রুয়ারি—প্রাণসংশয় পীড়া।

১৯৩৮, অক্টোবর—কলিকাতার ছায়া সিনেমা হলে চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্য অভিনয়।

১৯৩৯, জুলাই—কলিকাতার মহাজাতি সদনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন।

১৯৪০, আগস্ট - অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি. লিট. উপাধি প্রদান।

১৯৪১, মে—জন্মদিনের বাণী রূপে 'সভ্যতার সংকট' প্রকাশ।

১৯৪১, ১৩ মে—ত্রিপুরারাজ কর্তৃক কবিকে শান্তিনিকেতনে 'ভারতভাস্কর' উপাধি প্রদান ;

২৫ জুলাই—অসুস্থ অবস্থায় কলিকাতা আগমন ;

৭ আগস্ট—তিরোভাব।

পূর্বোক্ত ঘটনাবলির মধ্যে তাঁর সংগীতসৃষ্টির পক্ষে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও বেদনাদায়ক ঘটনা—১৯৩৪ সালে দিনেন্দ্রনাথের হঠাৎ শান্তিনিকেতনের সংগে সব সম্পর্ক চুকিয়ে কলিকাতায় চলে আসা। দিনেন্দ্রনাথ, যিনি নানা ভাবে আশ্রমের সংগে প্রায় তিরিশ বৎসর যুক্ত ছিলেন ও যিনি ছিলেন শান্তিনিকেতনের "বালক দলের সকল নাটের কাণ্ডারী" এবং রবীন্দ্রনাথের "সকল গানের ভাণ্ডারী" ও যাঁর সম্পর্কে কবি বলেছিলেন : "রবির সম্পদ হত নিরর্থক তুমি যদি তারে না লইতে আপনার করি, যদি না দিতে সবারে।" তাঁর এই কলিকাতায় চলে আসার বিয়োগবেদনা কবির বুকে খুবই বেজেছিল ও তাঁর মৃত্যুর অল্পকাল পরে রবীন্দ্রনাথ বর্ষামঙ্গল উৎসবের যে কয়টি গান লেখেন তার একাধিক স্থলে কথায় ও সুরে এই বিয়োগের প্রচ্ছন্ন বেদনা রয়েছে বলে অনেকে মনে করেন এবং এই প্রসংগে "আমার কী বেদনা সে কি জান" এই গানটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। এই সময়ের তাঁর উল্লেখযোগ্য সংগীতচিন্তা ও সংগীতের উপর রচনার ভিতর দিলীপকুমার রায়ের সংগে মার্চ ১৯২৫ থেকে জুন ১৯৩৮ অবধি আলাপ-আলোচনার ও ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সংগে তাঁর ১৯৩২—৩৫ সাল অবধি পত্রালাপের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

এইসব আলাপ-আলোচনা ও পত্রালাপের ভিতর দিয়ে কবি সংগীত, বিশেষ করে বাংলা গানে হিন্দুস্থানী গানকে কি-ভাবে ও কতখানি গ্রহণ করা যেতে পারে, সে সম্বন্ধে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন। এগুলির গুরুত্ব ও মূল্য অসাধারণ। গীতালী সংগীতায়তনে ১৯৪০ সালের জুন মাসে তিনি যে ভাষণ দেন তার গুরুত্বও অসাধারণ। এই ভাষণে তাঁর গানের পরিবেশন সম্বন্ধে তাঁর মতামত তিনি কিছুটা কঠোর ভাবেই ব্যক্ত করেছিলেন। সেই অভিভাষণে তিনি বলেন : "গান যাতে আমার গান বলে মনে হয় এইটি তোমরা করো। আরও হাজারো গান হয়ত আছে—তাদের মাটি করে দাওনা, আমার দুঃখ নেই। কিন্তু তোমাদের কাছে আমার মিনতি, তোমাদের গান যেন আমার গানের কাছাকাছি হয়, যেন শুনে আমিও আমার গান বলে চিনতে পারি। এখন এমন হয় যে আমার গান শুনে নিজের গান কিনা বুঝতে পারিনা। মনে হয় কথাটা যেন আমার, সুরটা যেন নয়। নিজে রচনা করলাম পরের মুখে নষ্ট হছে এ যেন অসহ্য। মেয়েকে অপাত্রে দিলে যেমন সব কিছু সইতে হয়, এও যেন আমার পক্ষে সেই রকম।" তাঁর গানের পরিবেশনের ধারা সম্বন্ধে কবির এই মতকে শেষ ও চূড়ান্ত নির্দেশ বলে গ্রহণ করা যেতে পারে।

গানের তালিকা (শেষ যুগ)

১৯২১—১৯৪১

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম কলি : রাগ/তাল	রচনাকাল/স্থান	মন্তব্য
১	বাদল-মেঘে মাদল বাজে : দাদরা	১৯২১/শান্তিনিকেতন	
২	ওগো আমার শ্রাবণমেঘের : দাদরা		
৩	তিমির-অবগুণ্ঠনে : হাম্বির/কাহারবা		
৪	এই শ্রাবণের বুকের ভিতর : দাদরা		
৫	মেঘের কোলে কোলে : দাদরা	কলিকাতা	
৬	হৃদয়ে ছিলে জেগে : একতাল	শান্তিনিকেতন	
৭	হায় গো, ব্যথায় কথা : কাহারবা		
৮	আমারে ডাক দিল কে : দাদরা		
৯	কেন যে মন ভোলে আমার : দাদরা		
১০	আমার সুরে লাগে : দাদরা		
১১	আমার হৃদয় তোমার : দাদরা		
১২	আকাশে আজ কোন্ চরণের : দাদরা		
১৩	এই কথাটি মনে রেখো : দাদরা		
১৪	আমার দোসর যে জন : দাদরা		
১৫	কোথা হতে শুনতে যেন পাই : কাহারবা		

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম কলি : রাগ/তাল	রচনাকাল/স্থান		মন্তব্য
১৬	পূর্ণচাঁদের মায়ায় আজি : দাদরা	১৯২১/শান্তিনিকেতন		
১৭	তোমরা যা বল তাই বলো : কীর্তনাঙ্গ/দাদরা	”	”	
১৮	আমি এলেম তারি দ্বারে : কাহারবা	”	”	
১৯	বসন্ত তার গান লিখে যায় : কাহারবা	”	”	
২০	রজনীর শেষ তারা : কাহারবা	”	”	
২১	দীপ নিভে গেছে মম : বেহাগ/অর্ধঝাঁপ	”	”	
২২	সময় কারো যে নাই : দাদরা	”	”	
২৩	আমি মারের সাগর পাড়ি দেব : কাহারবা	”	”	
২৪	তোর শিকল আমায় : দাদরা	”	”	
২৫	শীতের হাওয়ায় লাগল নাচন : দাদরা	”	”	
২৬	ফিরে চল্ মাটির টানে : দাদরা	”	”	
২৭	এনেছ ওই শিরীষ বকুল : কাহারবা	”	”	
২৮	ও মঞ্জরী, ও মঞ্জরী : দাদরা	”	”	
২৯	তোমার সুরের ধারা : কীর্তনাঙ্গ/দাদরা	”	”	
৩০	জয় হোক, জয় হোক : কাহারবা	”	”	

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম কলি : রাগ/তাল	রচনাকাল/স্থান	মন্তব্য
৩১	পূর্বাচলের পানে তাকাই : কাহারবা	১৯২২/শিলাইদহ	
৩২	আসা-যাওয়ার পথের ধারে : ইমন/দাদরা	„ „	
৩৩	কার যেন এই মনের বেদন : ভৈরবী/দাদরা	„ „	
৩৪	নিদ্রাহারা রাতের এ গান : ২/৪ ছন্দ	„ „	
৩৫	দারুণ অগ্নিবাণে : সারং/কাহারবা	„ শান্তিনিকেতন	
৩৬	এসো এসো হে তৃষ্ণার জল : মিশ্র ইমন/কাহারবা	„ ,	
৩৭	বৈশাখের এই ভোরের হাওয়া : দাদরা	„ „	
৩৮	এই সকালবেলার বাদল-আঁধারে : দাদরা	„ „	
৩৯	আজি বর্ষারাতের শেষে : কাহারবা	„ „	
৪০	ক্লান্ত বাঁশির শেষ রাগিণী : কাহারবা	„ „	
৪১	আজ তালের বনের করতালি : কাহারবা	„ „	
৪২	হৃদয় আমার ওই বুঝি তোর : দাদরা	„ „	
৪৩	প্রখর তপনতাপে : মিশ্ররাগ/একতাল	„ „	
৪৪	আজ নবীন মেঘের সুর : মিশ্ররাগ/দাদরা	„ „	
৪৫	বৈশাখ হে, মৌনী তাপস : মিশ্ররাগ/দদরা	„ ,	

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম কলি : রাগ/তাল	রচনাকাল/স্থান	মন্তব্য
৪৬	বহু যুগের ও পার হতে : কাহারবা	১৯২২/শান্তিনিকেতন	
৪৭	নীল দিগন্তে ওই ফুলের : দাদরা	” ”	
৪৮	আমি কান পেতে রই : বাউলাঙ্গ/দাদরা	১৯২২/আত্রাই নদী	
৪৯	ওই যে ঝড়ের মেঘের : কাহারবা	” শান্তিনিকেতন	
৫০	আজ আকাশের মনের কথা : দাদরা	” ”	
৫১	পুব-সাগরের পার হতে : কাহারবা	” ”	
৫২	আজি হৃদয় আমার যায় : দাদরা	” ”	
৫৩	এ কী গভীর বাণী এল : দাদরা	” ”	
৫৪	বাদল-বাউল বাজায় রে : কাহারবা	” ”	
৫৫	বৃষ্টিশেষের হাওয়া : দাদরা	” ”	
৫৬	বাদল-ধারা হল সারা : দাদরা	” ”	
৫৭	তার বিদায়বেলার মালাখানি : দাদরা	” ”	
৫৮	আমার কণ্ঠ হতে গান : দাদরা	” ”	
৫৯	সে দিন আমায় বলেছিলে : কাহারবা	” ”	
৬০	এল যে শীতের বেলা : মিশ্র ইমন/দাদরা	” ”	

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম কলি : রাগ/তাল	রচনাকাল/স্থান	মন্তব্য
৬১	প্রথম আলোর চরণধ্বনি : ভৈরবী/একতাল	১৯২২/শান্তিনিকেতন	
৬২	যতখন তুমি আমায় : দাদরা	” ”	
৬৩	বারে বারে পেয়েছি যে তারে : দাদরা	” ”	
৬৪	এ কী সুধারস আনে : কাহারবা	১৯২৩ ”	
৬৫	ফিরবে না তা জানি : ২/৪ ছন্দের তাল	” ”	
৬৬	হেমন্তে কোন্ বসন্তেরই : দাদরা	” ”	
৬৭	শিউলি-ফোটা ফুরোল যেই : দাদরা	” ”	
৬৮	অনেক দিনের মনের মানুষ : ইমন কল্যাণ/দাদরা	” ”	
৬৯	ঝর-ঝর-ঝর-ঝর ঝরে রঙের : দাদরা	” ”	
৭০	আজ তারায় তারায় : দাদরা	” ”	
৭১	ও আমার চাঁদের আলো : দাদরা	” ”	
৭২	খেলাঘর বাঁধতে লেগেছি : দাদরা	” ”	
৭৩	নিশীথরাতের প্রাণ : তেওড়া	” ”	
৭৪	ও চাঁদ, তোমায় দোলা দেবে : দাদরা	” ”	
৭৫	ভাঙল হাসির বাঁধ : দাদরা	” ’	

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম কলি : রাগ/তাল	রচনাকাল/স্থান	মন্তব্য
৭৬	ধীরে ধীরে ধীরে বও : কাহারবা	১৯২৩/শান্তিনিকেতন	
৭৭	বাকি আমি রাখব না : দাদরা	„ „	
৭৮	ফল ফলাবার আশা আমি : হাম্বির/দাদরা	„ „	
৭৯	সে কি ভাবে গোপন রবে : দাদরা	„ „	
৮০	এ বেলা ডাক পড়েছে : বাউলাঙ্গ/দাদরা	„ „	
৮১	আজ দখিনবাতাসে : দাদরা	„ „	
৮২	সব দিবি কে, সব দিবি পায় : কাহারবা	„ „	
৮৩	বিদায় যখন চাইবে তুমি : ভৈরবী/দাদরা	„ „	
৮৪	শুকনো পাতা কে-যে ছড়ায় : দাদরা	„ „	
৮৫	সহসা ডালপালা তোর : দাদরা	„ „	
৮৬	যদি তারে নাই চিনি গো : তেওড়া	„ „	
৮৭	আজ খেলা-ভাঙার খেলা : কাহারবা	„ „	
৮৮	এবার বিদায়বেলার সুর : দাদরা	„ ,	
৮৯	নারে, নারে, ভয় করবনা : দাদরা	„	
৯০	না, যেয়ো না, যেয়োনা কো : কাহারবা	,	

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম কলি : রাগ/তাল	রচনাকাল/স্থান	মন্তব্য
৯১	তোমার বাস কোথা-যে : তেওড়া	১৯২৩/শান্তিনিকেতন	
৯২	এখন আমার সময় হল : দাদরা	” ”	
৯৩	ওরে পথিক, ওরে প্রেমিক : কাহারবা	” ”	
৯৪	গানগুলি মোর শৈবালেরই দল : কাহারবা	” ”	
৯৫	দখিনহাওয়া, জাগো জাগো কাহারবা	” ”	
৯৬	নাই বা এলে যদি . অখণ্ড ৬ মাত্রার তাল	” ”	
৯৭	তোমার শেষের গানের রেশ : ভৈরবী/দাদরা	১৯২৩/লক্ষ্ণৌ থেকে বোম্বাই যাবার পথে	অনুমান, লক্ষ্ণৌতে অতুল প্রসাদ সেনের গৃহ-বাসের স্মৃতিতে রচিত
৯৮	তোমায় গান শোনাব দাদরা	১৯২৩/আমেদাবাদ	
৯৯	যুগে যুগে বুঝি আমায় : কাহারবা	” শান্তিনিকেতন	
১০০	দ্বারে কেন দিলে নাড়া : দাদরা	” ”	
১০১	তোমার বীণায় গান ছিল : দাদরা	” কাঠিয়াবাড়	
১০২	ওরে বকুল, পারুল ওরে : দাদরা	” ”	
১০৩	দুই হাতে কালের মন্দিরা যে কাহারবা	” শান্তিনিকেতন	
১০৪	ভরা থাক্ স্মৃতিসুধায় : দাদরা .	” ”	আঁদ্রে কার্পেলেস এর শান্তিনিকেতন থেকে বিদায় উপলক্ষে

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম কলি : রাগ/তাল	রচনাকাল/স্থান		মন্তব্য
১০৫	অগ্নিশিখা, এসো এসো : ইমন কল্যাণ/কাহারবা	১৯২৩/শান্তিনিকেতন		সহায়িকা বা গার্ল-গাইডের জন্যে গানটি রচিত হয়
১০৬	আজি মর্মরধ্বনি কেন : ত্রিতাল	"	"	
১০৭	দূর-দেশী সেই রাখাল ছেলে : দাদরা	"	"	
১০৮	আকাশ-তলে দলে দলে : মিশ্র কেদার/দাদরা	"	"	
১০৯	পথিক মেঘের দল জোটে ওই : দাদরা	"	"	
১১০	আষাঢ়, কোথা হতে আজ : দাদরা	"	"	
১১১	ছায়া ঘনাইছে বনে বনে পিলু/কাহারবা	"	"	
১১২	কদম্বেরই কানন ঘেরি : দাদরা	"	"	
১১৩	পুব-হাওয়াতে দেয় দোলা : কাহারবা	"	"	
১১৪	ভেবেছিলেম আসবে ফিরে : দাদরা	"	"	
১১৫	আমার যাবার বেলায় : কাহারবা	"	"	
১১৬	তোমার হাতের রাখীখানি : দাদরা	"	"	
১১৭	আজি সাঁঝের যমুনায় গো : কাহারবা	"	"	
১১৮	যখন এসেছিলে অন্ধকারে : তেওড়া	১৯২৪/শান্তিনিকেতন		
১১৯	আমি সন্ধ্যাদীপের শিখা : ইমন/দাদরা	"	শ্রীনিকেতন	

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম কলি : রাগ/তাল	রচনাকাল/স্থান	মন্তব্য
১২০	আমার মন চেয়ে রয় : আশাবরী/তেওড়া	১৯২৪/শান্তিনিকেতন	
১২১	পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে : লোকসংগীতের সুরে/ দাদরা	„ „	
১২২	আমার ভুবন তো আজ : ২/৪ ছন্দ	১৯২৪/শ্রীনিকেতন	
১২৩	কণ্ঠে নিলেম গান : কাহারবা	„ কলিকাতা	
১২৪	ওগো বধূ সুন্দরী : মিশ্র ভৈরব/কাহারবা	„ শান্তিনিকেতন	
১২৫	দিনশেষের রাঙা মুকুল : পূরবী/কাহারবা	„ „	
১২৬	এবার অবগুণ্ঠন খোলো : দাদরা	১৯২৪ „	
১২৭	যে কেবল পালিয়ে বেড়ায় : দাদরা	„ „	
১২৮	যখন ভাঙল মিলন-মেলা : ভৈরবী/কাহারবা	„ „	
১২৯	মধ্যদিনের বিজন বাতায়নে : ২/৪ ছন্দ	„ „	
১৩০	আজ কিছুতেই যায় না : কাহারবা	„ „	
১৩১	হায় হায় হায়, দিন চলি যায় : কাহারবা	„ „	শান্তিনিকেতনের চা-চক্রের জন্যে রচিত
১৩২	শ্রাবণ-বরিষন পার হয়ে : কাহারবা	„ „	
১৩৩	ধরণীর গগনের মিলনের : ২+২ ছন্দ	„ „	
১৩৪	মোর স্বপন-তরীর কে তুই নেয়ে : দাদরা	„ শিলং	

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম কলি : রাগ/তাল	রচনাকাল/স্থান	মন্তব্য
১৩৫	ও চাঁদ, চোখের জলের : কাহারবা	১৯২৪/শিলং	
১৩৬	ভালোবাসি, ভালোবাসি : দাদরা	„ „	
১৩৭	আকাশ-ভরা সূর্য তারা : দাদরা	„ শান্তিনিকেতন	
১৩৮	মাটির বুকের মাঝে : দাদরা	„ „	
১৩৯	আমার এ পথ তোমার : দাদরা	„ „	
১৪০	আনমনা আনমনা : দাদরা	„ দক্ষিণ আমেরিকার পথে, জাহাজে	
১৪১	গানের ঝরনাতলায় ; দাদরা	„ শান্তিনিকেতন	
১৪২	তার হাতে ছিল হাসির : দেশ/দাদরা	„ আমেরিকা হতে ইতালির অভিমুখে জাহাজে রচিত	
১৪৩	লহো লহো, তুলে লহো : তেওড়া	„ শান্তিনিকেতন	
১৪৪	ফিরে ফিরে ডাক্ দেখি রে : দাদরা	„ „	
১৪৫	রুদ্রবেশে কেমন খেলা : কাহারবা	„ „	
১৪৬	কুসুমে কুসুমে চরণচিহ্ন : দাদরা	১৯২৫ „	
১৪৭	আজ কি তাহার বারতা : মিশ্র ইমন/কাহারবা	„ „	
১৪৮	ও কি এল, ও কি এল না : দাদরা	„ „	
১৪৯	এবার উজাড় ক'রে লও হে : দেশ/ত্রিতাল	„ „	

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম কলি : রাগ/তাল	রচনাকাল/স্থান	মন্তব্য
১৫০	আমায় থাকতে দে-না : কাহারবা	১৯২৫/শান্তিনিকেতন	
১৫১	মরুবিজয়ের কেতন উড়াও : হাম্বীর/দাদরা	„ „	
১৫২	জয়যাত্রায় যাও গো : দাদরা	„ „	
১৫৩	না ব'লে যায় পাছে সে : দাদরা	„ „	
১৫৪	মরণের মুখে রেখে : ভৈরবী/কাহারবা	„ „	
১৫৫	গান আমার যায় ভেসে যায় : দাদরা	„ „	
১৫৬	গহন রাতে শ্রাবণধারা : ছায়ানট/দাদরা	„ „	
১৫৭	বজ্রমানিক দিয়ে গাঁথা : দাদরা	„ „	
১৫৮	এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে : ২+২ ছন্দ	„ „	
১৫৯	ঝরে ঝর ঝর ভাদর-বাদর : মল্লার/কাহারবা	„ „	
১৬০	কোথা যে উধাও হল : মিশ্রমল্লার/আড়াঠেকা	„ „	মূলগান : বোল রে পাপিয়ারা
১৬১	আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে : দাদরা	„ „	
১৬২	অশ্রুভরা বেদনা দিকে দিকে : মিশ্রকাফি/ত্রিতাল	„ „	মূলগান : তনমন ধন ভয় পরবারে
১৬৩	বন্ধু, রহো রহো সাথে : ভৈরবী/মধ্যমান	„ „	মূলগান : সঙ্গে চলা দিয়া হাওয়ে

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম কলি : রাগ/তাল	রচনাকাল/স্থান	মন্তব্য
১৬৪	একলা ব'সে বাদলশেষে : দাদরা	১৯২৫ শান্তিনিকেতন	
১৬৫	শ্যামল শোভন শ্রাবণ তুমি : দাদরা	„ „	
১৬৬	দেখো দেখো, দেখো, শুকতারা : দাদরা	„ „	
১৬৭	ওলো শেফালি, ওলো শেফালি : দাদরা	„ „	
১৬৮	যে ছায়ারে ধরব ব'লে : দাদরা		
১৬৯	এসো শরতের অমল মহিমা : গান্ধারী/যৎ	„ „	মূলগান : বাজে ঝনন ঝনন বাজে।
১৭০	তোমার নাম জানি নে : ভৈরবী/দাদরা	„ „	
১৭১	কার বাঁশি নিশিভোরে : গান্ধারী/ত্রিতাল	„ „	মূলগান : মোরে কান ভণকবা।
১৭২	হে ক্ষণিকের অতিথি : ভৈরবী/কাহারবা	„ „	
১৭৩	আমার রাত পোহালো : দাদরা	„ „	
১৭৪	ও আষাঢ়ের পূর্ণিমা আমার : ২+৪ ছন্দ	„ „	
১৭৫	বাজো রে বাঁশরি, বাজো : ইমন/কাহারবা	„ „	
১৭৬	ওই মরণের সাগরপারে : দাদরা	„ „	
১৭৭	যৌবনসরসীনীরে মিলনশতদল : ভৈরবী/কাহারবা	„ „	

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম কলি : রাগ/তাল	রচনাকাল/স্থান	মন্তব্য
১৭৮	শ্যামল ছায়া, নাইবা গেলে : ২।৪ ছন্দ	১৯২৫/শান্তিনিকেতন	
১৭৯	তুমি খুশি থাক : দাদরা	” ”	
১৮০	আমার যে গান তোমার : দাদরা	” ”	
১৮১	আমার জ্বলে নি আলো : ২+৪ ছন্দ	” ”	
১৮২	ও আমার ধ্যানেরই ধন : ২+৪ ছন্দ	” ”	
১৮৩	এবার দুঃখ আমার : দাদরা	” ”	
১৮৪	তুমি তো সেই যাবেই চলে : শ্রী/একতাল	” ”	
১৮৫	সে আমার গোপন কথা : কীর্তনাঙ্গ/দাদরা	” ”	
১৮৬	কে বলে ‘যাও যাও’ : বেহাগ/দাদরা	” ”	
১৮৭	তুমি মোর পাও নাই পরিচয় : ভৈরবী/কাহারবা	” ”	
১৮৮	আছ আকাশ-পানে তুলে মাথা : ভৈরবী/দাদরা	” ”	
১৮৯	না, না গো না, কোরো না : পিলু/দাদরা	” ”	
১৯০	পাগল যে তুই, কণ্ঠ ভ'রে : কাহারবা	” ”	
১৯১	নাই রস নাই, দারুণ দাহনবেলা : মুলতান/কাহারবা	” ”	
১৯২	সখী, আঁধারে একেলা ঘরে : খাম্বাজ/খেমটা	” ”	

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম কলি : রাগ/তাল	রচনাকাল/স্থান	মন্তব্য
১৯৩	চৈত্রপবনে মম চিত্তবনে : কাহারবা	১৯২৫-২৬/শান্তিনিকেতন	
১৯৪	ধ্বনিল আহ্বান মধুর গম্ভীর : তেওড়া	” ”	
১৯৫	পরবাসী, চলে এসো ঘরে : ইমন/কাহারবা	” ”	'প্রবাসী' পত্রিকার ২৫-তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে রচিত
১৯৬	বনে যদি ফুটল কুসুম : কাহারবা	” আগরতলা	
১৯৭	দোলে দোলে দোলে প্রেমের দোলন-চাঁপা : দাদরা	” ”	
১৯৮	ফাগুনের নবীন আনন্দে : কাফি/কাহারবা	” ”	
১৯৯	তোমার বীণা আমার মনোমাঝে : ঝম্পক/৩।২ ছন্দ	” কলিকাতা	
২০০	নূপুর বেজে যায় রিনিরিনি : কাহারবা	” শান্তিনিকেতন	
২০১	লিখন তোমার ধুলায় : দাদরা	” ”	
২০২	আমার লতার প্রথম মুকুল : দাদরা	” ”	
২০৩	কেন রে এতই যাবার ত্বরা : দাদরা	” ”	
২০৪	কী পাই নি তারি হিসাব মিলাতে : কাহারবা	” ”	
২০৫	সেই ভালো সেই ভালো : দাদরা	” ”	
২০৬	অনেক কথা যাও যে ব'লে : ভৈরবী/দাদরা	” ”	

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম কলি : রাগ/তাল	রচনাকাল/স্থান	মন্তব্য
২০৭	দে পড়ে দে আমায় তোরা : দাদরা	১৯২৫-২৬/শান্তিনিকেতন	
২০৮	পাতার ভেলা ভাসাই নীরে : কাহারবা	„ „	
২০৯	আধেক ঘুমে নয়ন চুমে : দাদরা	„ „	
২১০	আমার প্রাণে গভীর গোপন : সারং/তেওড়া	„ „	
২১১	এ পথে আমি যে গেছি বার বার : বেহাগ/দাদরা	„ „	
২১২	দিন-পরে যায় দিন : মুলতান/কাহারবা	„ „	
২১৩	আপনাকে দিয়ে রচিলি : জৌনপুরী/দাদরা	„ „	
২১৪	কাহার গলায় পরাবি গানের : ভৈরবী/দাদরা	„ „	
২১৫	হে চিরন্তন আজি এ : ভৈরবী/কাহারবা	„ „	
২১৬	হে মহাজীবন, হে মহামরণ : কাহারবা	„ „	
২১৭	আর রেখো না আঁধারে আমায় : দাদরা	„ „	
২১৮	নিশীথে কী কয়ে গেল মনে : কাহারবা	„ „	
২১৯	পথে যেতে ডেকেছিলে মোরে : কাহারবা	„ „	
২২০	এ পারে মুখর হল কেকা ওই : কাফি/২+২ ছন্দ	„ „	
২২১	বিরস দিন, বিরল কাজ 3+২ ছন্দ	„	

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম কলি : রাগ/তাল	রচনাকাল/স্থান	মন্তব্য
২২২	আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো : ভৈরবী/দাদরা	১৯২৫-২৬/শান্তিনিকেতন	
২২৩	মরণসাগরপারে তোমরা অমর : কাহারবা	” ”	
২২৪	কার চোখের চাওয়ার : ২।৪ ছন্দ	১৯২৬/হামবুর্গ	
২২৫	রয় যে কাঙাল শূন্যহাতে : কাহারবা	” ”	
২২৬	ছুটির বাঁশি বাজল যে ওই : দাদরা	” ”	
২২৭	নাই নাই ভয়, হবে হবে জয় : কাহারবা	” ”	
২২৮	আমার মুক্তি আলোয় আলোয় : তেওড়া	” ন্যুনবর্গ	
২২৯	সকাল বেলার আলোয় বাজে : ভৈরবী/দাদরা	” ”	
২৩০	মধুর, তোমার শেষ যে না পাই : বেহাগ/দাদরা	” স্টুটগার্ট	
২৩১	চাহিয়া দেখো রসের স্রোতে : কাহারবা	” কলোন	
২৩২	তুমি উষার সোনার বিন্দু : দাদরা	” ”	
২৩৩	ওগো সুন্দর, একদা কী জানি : দাদরা	” প্রাগ	
২৩৪	গানে গানে তব বন্ধন যাক টুটে : আশাবরী/দাদরা	” ডুসেলডর্ফ	
২৩৫	কোথায় ফিরিস পরম শেষের : দাদরা	” প্রাগ	
২৩৬	দিনের বেলায় বাঁশি তোমার : বেহাগ/কাহারবা	” বুডাপেস্ট	

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম কলি : রাগ/তাল	রচনাকাল/স্থান		মন্তব্য
২৩৭	অরূপ, তোমার বাণী : দাদরা	১৯২৬/বুডাপেস্ট		
২৩৮	যা পেয়েছি প্রথম দিনে : দাদরা	"	পিরিউস	
২৩৯	যে ধ্রুবপদ দিয়েছ বাঁধি : ৩+২ ছন্দ	১৯২৭/শান্তিনিকেতন		
২৪০	ওরে কী শুনেছিস ঘুমের ঘোরে : কাহারবা	"	"	
২৪১	পুরানো জানিয়া চেয়ো না : দাদরা	"	"	
২৪২	কেন পান্থ, এ চঞ্চলতা : কাহারবা	"	"	
২৪৩	গগনে গগনে আপনার মনে : মল্লার/দাদরা	"	"	
২৪৪	নির্মল কান্ত, নমো হে নমো : ভৈরবী/কাহারবা	"	"	
২৪৫	হায় হেমন্তলক্ষ্মী, তোমার : কাহারবা	"	"	
২৪৬	মনে রবে কি না রবে আমারে : কাহারবা	"	"	
২৪৭	চরণরেখা তব যে পথে : ভৈরবী/দাদরা	"	"	
২৪৮	জানি তুমি ফিরে আসিবে আবার : দাদরা	"	"	
২৪৯	এসো এসো, এসো, হে বৈশাখ : ইমন/কাহারবা	"	"	
২৫০	মধ্যদিনে যবে গান বন্ধ করে পাখি : হাম্বীর/কাহারবা	"	"	
২৫১	হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী : ভৈরবী/দাদরা	"	"	বুদ্ধদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে রচিত

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম কলি : রাগ/তাল	রচনাকাল/স্থান	মন্তব্য
২৫২	ছিন্ন পাতার সাজাই তরণী কাহারবা	১৯২৭/শান্তিনিকেতন	
২৫৩	হে সন্ন্যাসী, হিমগিরি ফেলে : অখণ্ড ৬ মাত্রার তাল	” ”	
২৫৪	নৃত্যের তালে তালে নটরাজ : তালফেরতা	” ”	
২৫৫	হিমের রাতে ওই গগনের : দাদরা	” ”	
২৫৬	ওগো কিশোর আজি : তেওড়া	” ”	
২৫৭	রাঙিয়ে দিয়ে যাও : দাদরা	” ”	
২৫৮	আলোর অমল কমলখানি : ভৈরব/দাদরা	” ”	
২৫৯	শীতের বনে কোন্ সে কঠিন : কাহারবা	” ”	
২৬০	তপের তাপের বাঁধন কাটুক : দাদরা	” ”	
২৬১	মুখখানি কর মলিন বিধুর : দাদরা	” ”	
২৬২	যাবার বেলা শেষ কথাটি : মুলতান/তেওড়া	” ”	
২৬৩	ডাকিল মোরে জাগার সাথি : দাদরা	” ”	
২৬৪	তোমার গীতি জাগালো স্মৃতি : ৩/৪ ছন্দ	” ”	
২৬৫	ওরে যায় না কি জানা : ভৈরব/দাদরা	” ”	
২৬৬	কাছে যবে ছিল : ভৈরব/দাদরা	” ”	

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম কলি : রাগ/তাল	রচনাকাল/স্থান	মন্তব্য
২৬৭	এবার মিলন হাওয়ায়-হাওয়ায় : দাদরা	১৯২৭/শান্তিনিকেতন	
২৬৮	লুকালে ব'লেই খুঁজে বাহির করা : দাদরা	„ „	
২৬৯	মুখপানে চেয়ে দেখি : কাহারবা	„ „	
২৭০	জয় ক'রে তবু ভয় কেন : ২/৪ ছন্দ	„ „	
২৭১	আরো একটু বসো তুমি : ভৈরবী/দাদবা	„	
২৭২	সকরুণ বেণু বাজায়ে কে যায় : ভৈরবী/দাদরা	১৯২৭/মারার জাহাজ। জাভা থেকে পিনাঙের পথে রচিত	
২৭৩	সে দিন দুজনে দুলেছিনু বনে : পিলু/কাহারবা	১৯২৭/ট্রেনে পিনাঙের পথে রচিত	
২৭৪	গোধূলিগগনে মেঘে ঢেকেছিল : দাদরা	„ „	
২৭৫	খর বায়ু বয় বেগে : কাহারবা	„ পিনাঙ	
২৭৬	তুমি আমায় ডেকেছিলে : দাদরা	„ শান্তিনিকেতন	
২৭৭	নমো নমো, নমো করুণাঘন : কাহারবা	„ „	
২৭৮	ওই কি এলে আকাশপারে : কাহারবা	„	
২৭৯	শ্রাবণ, তুমি বাতাসে কার : কাহারবা	„	
২৮০	রঙ লাগালে বনে বনে : ২/৪ ছন্দ		

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম কলি : রাগ/তাল	রচনাকাল/স্থান		মন্তব্য
২৮১	তোমার সুর শুনায়ে : আশাবরী/দাদরা	১৯২৭/শান্তিনিকেতন		
২৮২	তোমার প্রেমে ধন্য কর যারে : সারং/তেওড়া	১৯২৮	”	
২৮৩	তোমার আমার এই বিরহের : ২/৩ ছন্দ	”	”	
২৮৪	অনেক দিনের শূন্যতা মোর : তেওড়া	”	”	
২৮৫	পথে চলে যেতে যেতে : ২/৩ ছন্দ	”	”	
২৮৬	আমার না-বলা বাণীর : কীর্তনাঙ্গ/দাদরা	”	”	
২৮৭	দিন যদি হল অবসান : মুলতান/কাহারবা	”	”	
২৮৮	দিয়ে গেনু বসন্তের এই : কাহারবা	”	”	
২৮৯	হে মাধবী, দ্বিধা কেন : দাদরা	”	”	
২৯০	একটুকু ছোঁওয়া লাগে : অখণ্ড ৬ মাত্রার তাল	”	”	
২৯১	বাহির পথে বিবাগী হিয়া : ৩/৬ ছন্দ	”	”	
২৯২	প্রাঙ্গণে মোর শিরীষশাখায় : ভৈরবী/দাদরা	”	চৌরঙ্গী, কলিকাতা	
২৯৩	আজি এ নিরালা কুঞ্জে : দাদরা	”	শান্তিনিকেতন	
২৯৪	আমরা দুজনা স্বর্গ-খেলনা : দাদরা	”	”	
২৯৫	আমার নয়ন তব নয়নের : দাদরা	”		

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম কলি : রাগ/তাল	রচনাকাল/স্থান	মন্তব্য
২৯৬	তুমি বাহির থেকে দিলে : দাদরা	১৯২৯/শান্তিনিকেতন	
২৯৭	আমার পথে পথে পাথর ছড়ানো : দাদরা	" "	
২৯৮	তুমি হঠাৎ হাওয়ায় ভেসে-আসা ধন : দাদরা	" "	
২৯৯	কাঁদালে তুমি মোরে : ঝাঁপতাল	" "	
৩০০	আমার নয়ন তোমার নয়নতলে : পিলু/দাদরা	" "	
৩০১	ফুল তুলিতে ভুল করেছি : কাহারবা	" "	
৩০২	চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে : দাদরা	" "	
৩০৩	ওরে ঝড় নেমে আয় : কাহারবা	" "	
৩০৪	কোন্ পুরাতন প্রাণের টানে : কাহারবা	" "	
৩০৫	নীল অঞ্জনঘন পুঞ্জছায়ায় : দাদরা	" "	
৩০৬	চলে যায় মরি হায় : কাহারবা	" "	
৩০৭	দিনের পরে দিন যে গেল : বাউলাঙ্গ/দাদরা	" "	
৩০৮	সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধদাহ : ইমন/দাদরা	" "	বিপ্লবী যতীন দাসের মৃত্যু উপলক্ষে রচিত
৩০৯	প্রলয়নাচন নাচলে যখন : দাদরা	" "	
৩১০	তোমার আসন শূন্য আজি : দাদরা	" "	

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম কলি : রাগ/তাল	রচনাকাল/স্থান		মন্তব্য
৩১১	মন যে বলে, চিনি চিনি : কাহারবা	১৯২৯	শান্তিনিকেতন	
৩১২	জাগো হে রুদ্র জাগো : হাম্বীর/দাদরা	”	”	
৩১৩	জাগ আলসশয়নবিলগ্ন : কাহারবা	”	”	
৩১৪	শুভ্র নবশঙ্খ তব : ঝম্পক	”	”	
৩১৫	নীলাঞ্জনছায়া, প্রফুল্ল কদম্ববন : ভৈরবী/কাহারবা	”	”	মূলগান : বৃন্দাবন লোলা
৩১৬	সংকোচের বিহ্বলতা : দাদরা	”	”	
৩১৭	ওই শুনি যেন চরণধ্বনি রে : কাহারবা	”	”	
৩১৮	নীল আকাশের কোণে কোণে : দাদরা	”	”	
৩১৯	সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে : দাদরা	১৯৩০	”	
৩২০	স্বপনে দোঁহে ছিনু কী মোহে : কাহারবা	”	”	
৩২১	বাসন্তী, হে ভুবনমোহিনী : কাহারবা	১৯৩০-৩১	”	মূলগান : মীনাক্ষী মে মুদম
৩২২	সুরের গুরু, দাও গো : দাদরা	”	”	
৩২৩	ফাগুন, হাওয়ায় হাওয়ায় : দাদরা	”	”	
৩২৪	ওরে গৃহবাসী, খোল্ দ্বার খোল্ : কাহারবা	”	”	
৩২৫	ওরা অকারণে চঞ্চল : কাহারবা	”	”	

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম কলি : রাগ/তাল	রচনাকাল/স্থান		মন্তব্য
৩২৬	মোর পথিকেরে বুঝি এনেছ :			
	ইমন/কাহারবা	১৯৩০-৩১/শান্তিনিকেতন		
৩২৭	বেদনা কী ভাষায় রে :			
	কাহারবা	”	”	দক্ষিণী-সুর-ভাঙা
৩২৮	বসন্তে বসন্তে তোমার কবিরে :			
	দাদরা/কাহারবা	”	”	দুইরকমের সুর আছে
৩২৯	আমার মল্লিকাবনে যখন প্রথম :			
	দাদরা	”	”	
৩৩০	ঝরা পাতা গো, আমি তোমারি দলে :			
	ভৈরবী/দাদরা	”	”	
৩৩১	কখন দিলে পরায়ে :			
	পিলু বারোঁয়া ২/৪ ছন্দ	”	”	
৩৩২	ক্লান্ত যখন আম্রকলির কাল :			
	দাদরা	”	”	
৩৩৩	তুমি কিছু দিয়ে যাও :			
	কাহারবা	”	”	মূলগান : কৈ কছু কহরে
৩৩৪	বাজে করুণ সুরে :			
	কাহারবা	”	”	মূলগান : নিতু চরণ মূলে
৩৩৫	মিলনরাতি পোহালো :			
	২+৩ ছন্দ অর্ধঝাঁপ	”	”	
৩৩৬	শুভ্র প্রভাতে পূর্বগগনে :			
	তালমুক্ত	”	”	
৩৩৭	একলা ব’সে হেরো তোমার ছবি :			
	দাদরা	১৯৩১	”	
৩৩৮	আমি যখন ছিলেম অন্ধ :			
	তেওড়া	”	”	
৩৩৯	দেখা না-দেখায় মেশা :			
	দাদরা	”	”	

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম কলি : রাগ/তাল	রচনাকাল/স্থান	মন্তব্য
৩৪০	চক্ষে আমার তৃষ্ণা ওগো : সারং ১২/১২৩ ছন্দ	১৯৩৩/শান্তিনিকেতন	
৩৪১	ফুল বলে, ধন্য আমি : ইমন কল্যাণ/কাহারবা	” ”	
৩৪২	না না না, ডাকব না, ডাকব না : দাদরা	” ”	
৩৪৩	হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমরু : ৩/৪ ছন্দ	” ”	
৩৪৪	দুঃখ দিয়ে মেটাব : কাহারবা	” ”	
৩৪৫	পথের শেষ কোথায় : কাহারবা	” ”	
৩৪৬	হে নবীনা : ভৈরবী/দাদরা	” ”	
৩৪৭	আমার মন বলে, চাই : ভৈরবী/দাদরা	” ”	
৩৪৮	এলেম নতুন দেশে : কাহারবা	” ”	
৩৪৯	হে বিরহী, হায়, চঞ্চল হিয়া তব : কাহারবা	” ”	
৩৫০	তোমায় সাজাব যতনে : কাহারবা	” ”	
৩৫১	না চাহিলে যারে পাওয়া যায় : দাদরা	” ”	
৩৫২	ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা : দাদরা	” ”	
৩৫৩	হে সখা, বারতা পেয়েছি : কাহারবা	১৯৩৪ ”	এর দুইরকম সুর আছে
৩৫৪	বঁধু, কোন্ মায়া লাগল চোখে : ভৈরবী/কাহারবা	” ”	

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম কলি : রাগ/তাল	রচনাকাল/স্থান		মন্তব্য
৩৫৫	দূরের বন্ধু সুরের দূতীরে : দাদরা	১৯৩৪/শান্তিনিকেতন		
৩৫৬	ওরে চিত্ররেখাডোরে : কাহারবা	”	”	
৩৫৭	মায়াবনবিহারিণী হরিণী : ইমন কল্যাণ/কাহারবা	”	”	
৩৫৮	কাছে থেকে দূর রচিল : দাদরা	”	”	
৩৫৯	মম মন-উপবনে চলে : মল্লার/কাহারবা	”	”	
৩৬০	আজি বরিষন-মুখরিত : কাহারবা	১৯৩৫	”	
৩৬১	মনে হল যেন পেরিয়ে এলেম : দাদরা	”	”	
৩৬২	জানি জানি তুমি এসেছ : দেশ/কাহারবা	”	”	
৩৬৩	কী বেদনা মোর জান : দাদরা	”	”	এই গানটিতে দিনেন্দ্রনাথের মৃত্যুর শোকের ছায়া আছে অনুমান
৩৬৪	কাঁটাবন বিহারিণী সুরকানা : কাহারবা	”	”	
৩৬৫	আমরা না-গান-গাওয়ার দল রে : স্বরলিপি নাই	”	”	হৈহৈ সঙ্ঘের জন্যে রচিত হাস্যরসাত্মক গান
৩৬৬	পায়ে পড়ি শোনো ভাই : স্বরলিপি নাই	”	”	”
৩৬৭	ও ভাই কারে জানাই : স্বরলিপি নাই	”	”	”
৩৬৮	আমার অন্ধপ্রদীপ শূন্য-পানে : দাদরা	”	”	

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম কলি : রাগ/তাল	রচনাকাল/স্থান	মন্তব্য
৩৬৯	বঁধু, কোন্ আলো লাগল চোখে : ভৈরবী/কাহারবা	১৯৩৫/শান্তিনিকেতন	তুলনীয় : বঁধু, কোন্ মায়া লাগল চোখে
৩৭০	ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে শুনি : মুলতান/কাহারবা	” ”	
৩৭১	দে তোরা আমায় : কাহারবা	” ”	
৩৭২	রোদনভরা এ বসন্ত : কীর্তনাঙ্গ/কাহারবা	” ”	
৩৭৩	আমার এই রিক্ত ডালি : দাদরা	” ”	
৩৭৪	আমার অঙ্গে অঙ্গে কে বাজায় : বেহাগ/কাহারবা	” ”	
৩৭৫	কেটেছে একেলা বিরহের বেলা : কাহারবা	” ”	
৩৭৬	তৃষ্ণার শান্তি সুন্দরকান্তি : কাহারবা	” ”	
৩৭৭	প্রভু, বলো বলো কবে : ভৈরবী/দাদরা	” ”	
৩৭৮	এবার ভাসিয়ে দিতে হবে : দাদরা	১৯৩৬ ”	
৩৭৯	ওই মালতীলতা দোলে : কাহারবা	” ”	
৩৮০	আঁধার অম্বরে প্রচণ্ড ডম্বরু : কাহারবা	১৯৩৬-৩৭ ”	
৩৮১	শুভ কর্মপথে ধর নির্ভয় গান : কাহারবা	” ”	
৩৮২	চলো যাই চলো : কাহারবা	” ”	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেনিং-কোরের জন্যে রচিত

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম কলি : রাগ/তাল	রচনাকাল/স্থান	মন্তব্য
৩৮৩	দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে : দাদরা	১৯৩৬-৩৭/শান্তিনিকেতন	
৩৮৪	ওরে নূতন যুগের ভোরে : আশাবরী/দাদরা	১৯৩৭ ”	
৩৮৫	এসো শ্যামলসুন্দর : দেশ/ত্রিতাল	” ”	সেতারের গৎ ভেঙে রচিত
৩৮৬	আমি শ্রাবণ আকাশে ওই : কাহারবা	” ”	
৩৮৭	চিনিলে না আমারে কি : ইমন/কাহারবা	” ”	
৩৮৮	মনে কী দ্বিধা রেখে গেলে চলে : ইমন/২+২ ছন্দ	” ”	
৩৮৯	আজি গোধূলিলগনে এই : বেহাগ/দাদরা		
৩৯০	থামাও রিমিকি ঝিমিকি বরিষন : কাহারবা		
৩৯১	বর্ষণমন্দ্রিত অন্ধকারে : ২+২ ছন্দ	” ”	
৩৯২	আমি তখন ছিলেম মগন : দাদরা	” ”	
৩৯৩	ওগো আমার চির অচেনা : অর্ধঝাঁপ ২/৩ ছন্দ	” ”	ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর স্মরণে রচিত বলে অনুমান
৩৯৪	মেঘছায়ে সজল বায়ে : মল্লার/২+২ ছন্দ	” ”	
৩৯৫	গোধূলিগগনে মেঘে : দাদরা	” ”	
৩৯৬	মধুগন্ধে-ভরা মৃদুস্নিগ্ধছায়া : তালফেরতা	” ”	

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম কলি : রাগ/তাল	রচনাকাল/স্থান		মন্তব্য
৩৯৭	আমার প্রাণের মাঝে সুধা : কীর্তনাঙ্গ সুর, দাদরা	১৯৩৭/শান্তিনিকেতন		
৩৯৮	শ্রাবণের পবনে আকুল : কেদার/ঝাঁপতাল	”	”	
৩৯৯	নব বসন্তের দানের ডালি : ৬ মাত্রা তাল, ১২।১২৩৪ ছন্দ	”	”	
৪০০	এক দিন চিনে নেবে তারে : দাদরা	১৯৩৮	”	
৪০১	প্রথম যুগের উদয়দিগঙ্গনে : দাদরা	”	”	
৪০২	আমার প্রিয়ার ছায়া : কানাড়া/দাদরা	”	”	
৪০৩	যায় দিন শ্রাবণদিন যায় : কাহারবা	”	”	
৪০৪	যে ছিল আমার স্বপনচারিণী : দাদরা	”	”	
৪০৫	জীবনে পরম লগন কোরো না হেলা : ভৈরবী/দাদরা	”	”	
৪০৬	ডেকোনা আমারে ডেকোনা : দাদরা	”	”	
৪০৭	গোপন কথাটি রবে না গোপনে : কাহারবা	১৯৩৮-৩৯	”	
৪০৮	ফিরে যাও কেন ফিরে ফিরে যাও : কাফি ১২।১২৩।১২ ছন্দ	”	”	
৪০৯	ন্যায় অন্যায় জানি নে : দাদরা	”	”	
৪১০	এত দিন তুমি সখা : ভৈরবী/কাহারবা	”	”	
৪১১	আমার জীবনপাত্র উছলিয়া : ভৈরব/দাদরা	”	”	

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম কলি : রাগ/তাল	রচনাকাল/স্থান		মন্তব্য
৪১২	আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি : বাহার/দাদরা	১৯৩৮-৩৯/শান্তিনিকেতন		অমিতা সেনের উদ্দেশ্যে রচিত
৪১৩	এই উদাসী হাওয়ার পথে : ইমন/দাদরা	”	”	
৪১৪	বসন্ত সে যায় তো হেসে : ভৈরবী/কাহারবা	”	”	
৪১৫	আজি দক্ষিণ পবনে : ২+২ ছন্দ	”	”	
৪১৬	আমার আপন গান : কানাড়া/কাহারবা	”	”	
৪১৭	ওগো স্বপ্নস্বরূপিণী : পরজ/দাদরা	১৯৩৯	”	
৪১৮	ওরে জাগায়োনা ও যে : কাহারবা	”	”	
৪১৯	দিনান্তবেলায় শেষের ফসল : ভৈরবী/কাহারবা	”	”	
৪২০	অধরা মাধুরী ধরেছি : দাদরা	”	”	
৪২১	ধূসর জীবনের গোধূলিতে : কাফি/কাহারবা	”	”	
৪২২	আমার যেতে সরে না মন : দাদরা	”	”	
৪২৩	তুমি কোন্ ভাঙনের পথে : ২+২ ছন্দ	”	”	
৪২৪	বাদলদিনের প্রথম কদম ফুল : দাদরা	”	”	
৪২৫	এসো গো জ্বেলে দিয়ে যাও : ইমন।২+২ ছন্দ	”	”	
৪২৬	মোর ভাবনারে কী হাওয়ায় মাতালো : গোড়মল্লার/ত্রিতাল	”	”	গানটি সেতারের গৎ ভেঙে তৈরি

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম কলি : রাগ/তাল	রচনাকাল/স্থান		মন্তব্য
৪২৭	রিমিকি ঝিমিকি ঝরে : ইমন/২+২ ছন্দ	১৯৩৯/শান্তিনিকেতন		
৪২৮	ওগো সাঁওতালি ছেলে : দাদরা	”	”	
৪২৯	আমি কী গান গাব যে : দেশ/দাদরা	”	”	
৪৩০	কিছু বলব ব'লে এসেছিলেম : কাহারবা	”	”	
৪৩১	মন মোর মেঘের সঙ্গী : কাহারবা	”	”	
৪৩২	আজি তোমায় আবার চাই শুনাবারে : বেহাগ/২+২ ছন্দ	”	”	
৪৩৩	আজি ঝরো ঝরো মুখর : ২+২ ছন্দ	”	”	আরো একটি সুর আছে। সুরান্তরটি কাহারবা তালে নিবদ্ধ।
৪৩৪	স্বপ্নে আমার মনে হল : হাম্বীর/২+৪ ছন্দ	”	”	
৪৩৫	শ্রাবণের গগনের গায় : ত্রিতাল	”	”	
৪৩৬	শেষ গানেরি রেশ নিয়ে যাও : মুলতান/দাদরা	”	”	
৪৩৭	এসেছিলে তবু আস নাই : ভৈরবী/২+২ ছন্দ	”	”	
৪৩৮	এসেছিনু দ্বারে তব শ্রাবণ : ২+৪ ছন্দ	”	”	
৪৩৯	নিবিড় মেঘের ছায়ায় : মল্লার/২+৪ ছন্দ	”	”	
৪৪০	পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে : লোকসংগীতের সুর/দাদরা		”	
৪৪১	আজি মেঘ কেটে গেছে : কাহারবা	”	”	

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম কলি : রাগ/তাল	রচনাকাল/স্থান	মন্তব্য
৪৪২	সঘন গহন রাত্রি : বাগেশ্রী/কাহারবা	১৯৩৯/শান্তিনিকেতন	
৪৪৩	ওগো তুমি পঞ্চদশী : কাহারবা	” ”	
৪৪৪	সবারে করি আহ্বান : ২+২ ছন্দ	” ”	
৪৪৫	মম দুঃখের সাধন : কাহারবা	” ”	
৪৪৬	বাণী মোর নাহি : কাহারবা	” ”	
৪৪৭	দেবে তুমি কখন নেশায় : দাদরা	” ”	
৪৪৮	যদি হায় জীবন পূরণ : ভীমপলশ্রী/কাহারবা	” ”	
৪৪৯	সমুখে শান্তিপারাবার : পূরবী/কাহারবা	” ”	
৪৫০	শুনি ওই রুনুঝুনু পায়ে পায়ে : কাহারবা	” ”	
৪৫১	একদিন যারা মেরেছিল তাঁরে গিয়ে : দাদরা	” ”	খৃষ্টদিবসের উদ্‌যাপন উপলক্ষে রচিত
৪৫২	প্রেম এসেছিল নিঃশব্দচরণে : কাহারবা	” ”	
৪৫৩	এসো এসো ওগো শ্যামছায়াঘন দিন : কাহারবা	১৯৪০ ”	
৪৫৪	ওই মহামানব আসে : ভৈরবী/কাহারবা	১৪ এপ্রিল, ১৯৪১/শান্তিনিকেতন	
৪৫৫	হে নূতন, দেখা দিক আরবার : ভৈরবী/কাহারবা	৬ মে, ১৯৪১ ”	

উপসংহার

আমি এর আগে আলোচনার সময় দেখিয়েছি, কি করে রবীন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে তাঁর সংগীত-রচনায় সার্থকতা ও পরিপূর্ণতা লাভ করেছেন এবং কি করে বাংলা গানের বিভিন্ন ধারা ও গীতশৈলীর নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিতর দিয়ে শেষ-যুগে তাঁর প্রতিভার যাদুস্পর্শে এদের এক স্বতন্ত্র ও মৌলিক সৃষ্টিতে পরিণত করেছেন। কিন্তু ঐ আলোচনার পরও যেন মনে একটা অতৃপ্তি ও প্রশ্ন থেকে যায়। মনে হয়, রবীন্দ্রসংগীত সম্বন্ধে শেষকথা যেন বলা হলো না, যেন আরো কিছু বলার অবকাশ রয়ে গেল।

রবীন্দ্রসংগীত সম্বন্ধে ভাবতে গেলে মনে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে: রবীন্দ্রসংগীতের ঐ যে অসাধারণ সাফল্য ও জনপ্রিয়তা, এর চাবিকাঠিটি কি? একটু গভীর ভাবে এ-নিয়ে চিন্তা করলেই এর উত্তর মেলে যে, রবীন্দ্র-সংগীতের এই অসাধারণ সাফল্যের মূলে হলো এর কথা ও সুরের অপূর্ব সমন্বয়। এটিকে আর এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেলে বলা চলে যে, শুধু কথা ও সুরের সমন্বয়ই নয়, কথার সামান্যীকরণ থেকে সুরের অসামান্যতায় উত্তরণই হলো রবীন্দ্রসংগীতের অসামান্য জনপ্রিয়তার মূলে। এটাই একে কালজয়ী করেছে ও বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ধারার গান রচনা, হোক তা রাগাভিত্তিক, লৌকিক বা কীর্তনাঙ্গ—সবের ভিতর দিয়েই রবীন্দ্রনাথ এই আদর্শকে সার্থকতা ও পরিপূর্ণতার দিকে পৌঁছে দিতে চেষ্টা করেছেন।

গানের এই অসামান্যতায় উত্তরণের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "যাহা কোনমতেই বলিবার যো নাই, এই সংগীত দিয়াই তাহা বলা চলে। অর্থ বিশ্লেষ করিয়া দেখিলে যে কথাটা যৎসামান্য এই সংগীতের দ্বারাই তাহা অসামান্য হইয়া ওঠে।" —সংগীতচিন্তা।

এ ব্যাপারে তাঁর শিক্ষানবিশী সুরু হয়েছিল অতি অল্পবয়সে ও এতে তাঁর অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অবদান ছিল যথেষ্ট। এর সূচনা হয়েছিল যখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পিয়ানো-বাদনের মারফত গান-রচনার ব্যাপারে নানা ধ্বনির পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিম্নোক্ত বর্ণনা বিশেষ প্রাসঙ্গিক হবে বলে তা আবার উদ্ধৃত করছি:

"জ্যোতিদাদা তখন প্রত্যহই প্রায় সমস্তদিন ওস্তাদি গানগুলাকে পিয়ানো যন্ত্রের মধ্যে ফেলিয়া তাহাদিগকে যথেচ্ছা মন্থন করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন, তাহাতে

ক্ষণে ক্ষণে রাগিণীগুলির এক একটি অপূর্ব মূর্তি ও ভাবব্যঞ্জনা প্রকাশ পাইত। যে সকল সুর বাঁধা নিয়মের মধ্যে মন্দগতিতে দস্তুর রাখিয়া চলে তাহাদিগকে প্রথাবিরুদ্ধ বিপর্যস্তভাবে দৌড় করাইবামাত্র সেই বিপ্লবে তাহাদের প্রকৃতিতে নূতন নূতন অভাবনীয় শক্তি দেখা দিত এবং তাহাতে আমাদের চিত্তকে সর্বদা বিচলিত করিয়া তুলিত। সুরগুলা যেন নানাপ্রকার কথা কহিতেছে এইরূপ আমরা স্পষ্ট শুনিতে পাইতাম। আমি ও অক্ষয়বাবু অনেক সময় জ্যোতিদাদার সেই বাজনার সঙ্গে সঙ্গে সুরে কথাযোজনার চেষ্টা করিতাম।"

—'জীবনস্মৃতি', পৃঃ ১০৮-১০৯।

"সাহিত্যের ক্ষেত্রে স্বর নয়টি, অ ই উ ঋ ৯ এ ঐ ও ঔ।... এই স্বরগুলি স্বতন্ত্রভাবে বা ব্যঞ্জনের সঙ্গে মিলিতভাবে বিভিন্ন শব্দ ও বাক্য গঠন করে, বিভিন্ন ভাব প্রকাশ করে। আবার সংগীতের ক্ষেত্রেও প্রাচীন ষড়জ গ্রামে স্বর নয়টি (৯)—ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, অন্তর গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ ও কাকলী নিষাদ। এই স্বরগুলিও বিভিন্নভাবে মিলিত হয়ে বিভিন্ন বিভিন্ন স্বরবিন্যাস ও সুর গঠন করে এবং তদনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন ভাব প্রকাশ করে। এই উভয় প্রকার স্বরাবলীর প্রত্যেকটি এক একটি বিশেষ ভাবের বাহক। যে গানে সাহিত্যের স্বরাবলীর ভাব ও সংগীতের স্বরাবলীর ভাব সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে মিলিত হয় সেই গানই সার্থক।'

—'রবীন্দ্রসংগীত প্রসঙ্গ', ২য় খণ্ড—প্রফুল্লকুমার দাস।

রবীন্দ্রসংগীতে এই সমন্বয় ঘটেছে বলেই কথা ও সুরের অর্ধনারীশ্বর রূপে গঠিত রবীন্দ্রসংগীতের এত সাফল্য ও সার্থকতা।

উদাহরণস্বরূপ, "এই উদাসী হাওয়ার পথে পথে মুকুলগুলি ঝরে" গানটির সঞ্চারী অর্থাৎ "বউ কথা কও তন্দ্রাহারা, বিফল ব্যথায় ডাক দিয়ে হয় সারা/ আজি বিভোর রাতে' অংশের স্বরলিপির মাধ্যমে সাহিত্য ও সুরের সমন্বয়ের ব্যাপারটি তুলে ধরবার চেষ্টা করবো।

{গা -া গা | র্রা সা -রা ! গা -া গা | রা সা -া I সা ঋা ঋা | ঋা ঋা -গা I
ব উ ক | থা ক ও ত ন্ দ্রা হা রা ০ বি ফ ল | ব্য থা য়্

I সা -া গা | গা রা -গা I র্রা সা -া | সা সা -রা I গা গমা র্গা | রা সা (-রা)}
ডা ক্ দি | য়ে হ য়্ সা রা ০ | আ জি ০ বি ভো০ র | রা তে

এই অংশের 'বিফল' শব্দটিতে আন্দোলন বর্জিত অতিকোমল ঋষভের ব্যবহার হয়েছে। স্বরের গুণ ধর্ম অনুসারে উক্ত স্বরটি করুণ রসের বাহক। 'বিফল' শব্দটিও একই রসের আওতায় পড়ে। অন্যদিকে 'বিভোর' শব্দটিতে শুধু মধ্যম ব্যবহৃত হয়েছে। বিভোর শব্দের অর্থের সহিত গভীরতা ও ব্যাপ্তির ভাব সংশ্লিষ্ট। শান্তরসের দ্যোতক শুদ্ধ মধ্যম গাম্ভীর্যের সঙ্গে গভীরতার ভাবও পোষণ করে।"

—'রবীন্দ্রসংগীত প্রসঙ্গ', (২য় খণ্ড)—প্রফুল্লকুমার দাস।

সাহিত্যের ও সংগীতের এই বিচারে 'বিফল' শব্দটিতে আন্দোলন-বর্জিত অতিকোমল ঋষভের প্রয়োগ ও 'বিভোর' শব্দে শুদ্ধ মধ্যমের প্রয়োগ সার্থক ও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

রবীন্দ্রনাথের গান বিশ্লেষণ করলে এরূপ সাহিত্যের স্বরাবলী ও সংগীতের স্বরাবলীর সামঞ্জস্যের অসংখ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ যখন গানে রাগের ব্যবহার করেছেন তখনও এই স্বর ও সুর সংগতির সাহায্যে একই রাগের গানে নানা বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে পেরেছেন। এর কারণ কী? এর কারণ এই যে, স্বর-বিন্যাসের গঠন-বৈচিত্র্যে ও প্রয়োগ-বৈবিত্র্যে একই রাগের বিচিত্র ধ্বনিরূপ বা আবহাওয়া (atmosphere) সৃষ্টি করা যায় ও প্রতিভাবান সংগীত-রচয়িতা দ্বারা গঠিত সংগীতে এর প্রতিফলন দেখা যায়, যেমন আমরা দেখি বিভিন্ন যুগে একই রাগের ওপর রচিত রবীন্দ্রনাথের নানা গানে। উদাহরণস্বরূপ, প্রথমযুগে ভৈরবীতে রচিত "আজ তোমারে দেখতে এলেম" গানের সঙ্গে পরবর্তীকালে ভৈরবীতে রচিত "ঝরা পাতা গো, আমি তোমারি দলে" বা গোড়ার দিককার ইমন কল্যাণে "ভুবনেশ্বর হে" গানটির সঙ্গে শেষযুগে রচিত একই রাগে "এসো গো জেবলে দিয়ে যাও" গান, বাগেশ্রীতে রচিত "যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে"-র সঙ্গে একই রাগে পরবর্তীকালে রচিত "সঘন গহন রাত্রি" বা বেহাগ রাগে "ভয় হতে তব অভয়-মাঝে" গানটির সঙ্গে পরবর্তীকালে বেহাগে রচিত "আজি তোমায় আবার চাই শুনাবারে" গানগুলির কথা উল্লেখ করা যায় এবং এই গানগুলির তুলনামূলক ভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করলেই এর তাৎপর্য পরিস্ফুট হয়ে উঠবে।

রবীন্দ্রসংগীতে স্বর-সংগতি ও সুর-বৈচিত্র্যের এই সার্থকতা একদিনে হয়নি —তা দীর্ঘদিনের সাধনার ফলে তাঁর আয়ত্তে এসেছিল।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গোড়ার সংগীত-সৃষ্টিতে সুরের ভাবরূপের কল্পনা করে সুরের ওপর নানা গীতশব্দকে স্থাপনা করেছেন এবং সুর ও কথা সেই সময় কিছুটা ভিন্নই ছিল। তাঁর শেষযুগের সংগীত-সৃষ্টিতে গীত শব্দগুলির অন্তর্নিহিত

ভাবরূপকে প্রাধান্য দিয়ে সুরের সঙ্গে সেই ভাবরূপকে মিশিয়ে তাকে আরো উজ্জ্বল করে তুলবার চেষ্টা করেছেন। শ্রোতার অন্তরে যে যে ভাবব্যঞ্জনা তার নিজের অজান্তে গীত শব্দগুলির ভেতর প্রচ্ছন্ন থাকে, সুর সেই সুপ্ত ভাবগুলিকে বের করে নিয়ে আসতে সাহায্য করে। সেজন্যে সুর সহযোগে গীত শব্দগুলি শোনার পর শ্রোতার মন সঙ্গে সঙ্গে সেই সুপ্ত ভাবগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়ে ওঠে। তার মনে হয় : "এই কথাই তো আমার মনে ছিল। কিন্তু তা পরিষ্কার ভাবে ব্যক্ত বা প্রকাশ করতে পারছিলাম না।" ফলে, গানটি শোনার পর শ্রোতার মন ও গানের ভাব একাত্ম হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

"একাকী গায়কের নহে তো গান,
মিলিতে হবে দুই জনে—
গাহিবে একজন খুলিয়া গলা,
আরেক জন গাবে মনে।"

তাঁর গানে গায়ক ও শ্রোতার মনের ভাবের এই সেতুবন্ধনে উপরোক্ত কথাটি যেন বাস্তবে রূপায়িত হয় ও তা সম্ভব হয় গানের সুররূপ ও কথার ভাবরূপের ওই ঐক্যবন্ধনে।

প্রথম ও কিছুটা মধ্যযুগের সংগীত-সৃষ্টির কালে রবীন্দ্রনাথের গান রচনার এই অসাধারণ ক্ষমতা বা দক্ষতা পরিলক্ষিত হয় না। গীতশব্দগুলি ভাব ও ব্যঞ্জনায় অপরূপ হলেও সুর তার কাছে এসেছে কিছুটা আলাদা অস্তিত্ব নিয়ে। সেজন্যে তাঁর গোড়ার দিককার রচিত গানগুলি কানে শুনতে ভালো লাগলেও সেগুলির ভেতর এই বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় না।

রবীন্দ্রনাথ তখন ভালো গাইয়ে ছিলেন, ভালো গীতিকার ও সুরকারও ছিলেন ; কিন্তু প্রকৃত রবীন্দ্রসংগীত, যার বৈশিষ্ট্য হলো কথা ও সুরের মিলিত অর্ধনারীশ্বর রূপ, তার তখনো জন্ম হয়নি। প্রস্তুতি চলছিল মাত্র।

এইবার আলোচনা করা যাক, কী কী বৈশিষ্ট্যের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রসংগীতের এই সার্থকতায় উত্তরণ। 'জীবনস্মৃতি'তে কবি বলেছেন যে হার্বার্ট স্পেনসারের একটি লেখা তাঁর ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। সেই লেখাটির মূলকথা হলো এই যে, সুর জিনিসটা আমাদের কথাবলার 'টোন' বা উচ্চতা-নিম্নতা থেকেই বের হয়ে এসেছে। এর প্রথম পরীক্ষা তিনি করেন কালমৃগয়া ও বাল্মীকি-প্রতিভা গীতিনাট্যে। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ এর আরো সার্থক প্রয়োগ করেছেন। "ভাবগুলিকে সোজাসুজি শ্রোতার মনে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করেছেন সুরের সাহায্যে······দূরে কাছে উচ্চতা নীচতা, দুঃখ সুখ, শান্তি উত্তেজনা, বিরহ মিলন, অতীতের প্রতি আকর্ষণ, আত্মমগ্নতা এবম্বিধ নানা ভাবরূপকে সব সময়

বিভিন্ন সুরের প্রক্ষেপণ দ্বারা ধরবার চেষ্টা করেছেন।"

—'রবীন্দ্রসংগীতে স্বরসংগত ও সুরবৈচিত্র্য'—অরুণ ভট্টাচার্য।

শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষ তাঁর 'রবীন্দ্রসংগীত' গ্রন্থে বলেছেন: "গান রচনায় আমাদের ব্যবহারিক জীবন থেকে মনের অনেক রকমের অভ্যেসকে গ্রহণ করেছেন এবং সেই কারণেই গানগুলো এত প্রাণে ধাক্কা দেয়, মনে হয় কথা বলছে।"

এখানে আমি কিছু গানের বাণীর ও তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সুরপ্রয়োগের বিশ্লেষণ করে এই ব্যাপারটি পরিস্ফুট করবার চেষ্টা করব।

কোনো কোনো গানে, কাব্যে যে চিত্ররূপ ফুটে ওঠে, সুর তাকে আরো উজ্জ্বলরূপ দান করে। উদাহরণস্বরূপ, "নীল দিগন্তে ওই ফুলের আগুন লাগল" গানটির কথা উল্লেখ করা যায়।

এই গানে বসন্তের স্বাভাবিক বর্ণনাকে অতিক্রম করে সৌন্দর্যের কল্পনার অসামান্য রূপ ফুটেছে দুটি অসাধারণ চিত্রকল্প 'ফুলের আগুন' এবং 'সৌরভের শিখা' শব্দে। এই দুটি অসামান্য শব্দকে অবলম্বন করে সুরের পাখনায় ভর করে গাইয়ে বা শ্রোতার স্বাভাবিক মন ও কল্পনা বহুদূরগামী হয়।

এ ছাড়া কথা ও সুরের সামঞ্জস্যর ক'টি উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে।

"অনেক দিনের মনের মানুষ" গানটিতে 'অনেক' কথার সুরবিন্যাস হলো—

II {র্গা ক্ষা -র্সা I

অ নে ক্

এতে ক্ষ থেকে তারার গা অবধি স্বর উল্লঙ্ঘন করে 'অনেক' কথাটির ব্যাপ্তি বোঝানো হয়েছে।

"বহুযুগের ওপার হতে" গানটিতে 'বহুযুগের' কথাটিতে এমন সুর যোজনা করা হয়েছে:

II পা ক্ষর্সা র্সা র্না | ধপা -া -া ক্ষ I

ব ০০ হু যু | গে০ ০ ০ র্

যাতে সুরের উল্লঙ্ঘন দ্বারা শুধু কথাতেই নয়, সুরেও যেন আমরা পিছনে ফেলে আসা আর এক যুগে পৌঁছে যাই।

"আমার আপন গান" গানটিতে 'তরী আমার টলোমলো' শুধু কথাই নয়, সুরও যেন টলমল করছে :

I	র্রা	-া	র্রা	-র্সা	|	র্রা	-র্সর্রা	র্রা	-র্মা	I
	ট	০	লো	০	|	ম	০ ০	লো	০	

"এল যে শীতের বেলা" গানটিতে স্বরের ও লয়ের পরিবর্তনের মাধ্যমে কথা ও সুরের অপূর্ব সামঞ্জস্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

এই গানটি ইমন রাগের ওপর ভিত্তি করে বাঁধা হয়েছে। সঞ্চারীতে 'বাহিরে কাজের পালা হইবে সারা / আকাশে উঠিবে যবে সন্ধ্যাতারা' অংশে হঠাৎ কোমল ঋষভ ও কোমল ধৈবতের ও দুই মধ্যমের প্রয়োগে ইমন রাগ পূরবী রাগে পরিবর্তিত হয়েছে—কারণ এখানে 'সন্ধ্যাতারা' কথায় সন্ধ্যা সূচিত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, গানটির অন্তরাতে, 'করো ত্বরা করো ত্বরা' অংশে লয়ের আড়ীতে যে তাড়াহুড়োর ভাব ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, সঞ্চারীর "বাহিরে কাজের পালা" অংশে লয়ের আর সেই তাড়াহুড়োর বা ত্বরান্বিত করার আর ইঙ্গিত নেই ও গানের লয়ও যেন অনেকটা শ্লথ বা মন্থর হয়ে এসেছে, কারণ এই অংশে কাজ শেষ করার পর একটা অবকাশের ইঙ্গিত আছে।

উপরে যে ব্যাখ্যা করা হলো, তাকে আরো ভালোভাবে বোঝাবার জন্যে উল্লিখিত অংশের স্বরলিপি দেওয়া হলো :

অন্তরা

-া গা গা II পা পা -া | -া পা ধা I র্সা র্সা -া | -া -া -া I
০ ক রো ত্ব রা ০ | ০ ক রো ত্ব রা ০ | ০ ০ ০

I {পা পা -গা | পা পা -ধা I ধর্সা র্সা -া | -া -া -া I
ত্ব রা ০ | ক রো ০ ত্ব০ রা ০ | ০ ০ ০

সঞ্চারী

-া -া -া II সা ঋা ঋা | ঋা ঋা -া I ঋা সা -ধ্া -সা -া -া I
০ ০ ০ বা হি রে | কা জে র্ পা লা ০ ০ ০ ০

I সা -ঋা ঋা | ঋা সা -া I সপা পা পা | পা পা পক্ষা I
হ ই বে | সা রা ০ আ০ কা শে | উ ঠি বে০

I পা দা -া | -ক্ষা -া -া I গা -মা মা | মা গা -া I
য বে ০ | ০ ০ ০ স ন্ ধা | তা রা ০

—তাঁর গানে ভাবের সঙ্গে সংগতি রেখে একই শব্দের ওপর বিভিন্ন সুরপ্রয়োগ গানকে এক দুর্লভ বৈচিত্র্য প্রদান করেছে।

"রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে 'ওগো' ও 'না' শব্দটিকে বিচিত্র ভাবে ভিন্ন ভিন্ন স্বরবিন্যাসের মাধ্যমে প্রয়োগ করেছেন। ওগো আমার শ্রাবণমেঘের খেয়াতরীর মাঝি, ওগো আমার চির অচেনা পরদেশী, ওগো শোনো কে বাজায়, ওগো তোরা কে যাবি পারে, ওগো সাঁওতালি ছেলে, ওগো স্বপ্নস্বরূপিণী, ওগো বধূ সুন্দরী, ওগো তুমি পঞ্চদশী—এইসব গানে 'ওগো' কথাটিকে তিনি ভাবের সঙ্গে সংগতি রেখে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে স্বরপ্রয়োগ করেছেন।

আর 'না' কথাটিও তিনি তাঁর গানে বিচিত্র ভাবে প্রয়োগ করেছেন। সহজ সুরে 'না নাগো না, কোরোনা ভাবনা' গানের আশ্বাস, 'না যেয়ো না, যেয়ো নাকো' গানটির 'না' ধ্বনিতে ত্রস্ত আকুতি, বিভ্রান্ত আবেদনের ভঙ্গি, 'শ্যামল ছায়া, নাইবা গেলে' গানটির মধ্যে 'না [illegible]' বলে সুরের আবদার, 'গোপন কথাটি রবে না গোপনে' গানের 'না না না' বোলের গানের দৃঢ়ভঙ্গী, সবই গানের কথা সুরকে ছাপিয়ে অন্য এক রসের ইঙ্গিতময় জগতে উত্তীর্ণ হয়েছে।"

—'রবীন্দ্রসংগীতে কথা ও সুর' : বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই 'মেঘের' শব্দটির কথাই ধরা যাকনা কেন। 'মেঘের পরে মেঘ জমেছে' ও 'মন মোর মেঘের সঙ্গী' গান দুটিতে 'মেঘের' শব্দটিকে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে সংগতি রেখে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সুরারোপ করা হয়েছে।

" 'মেঘের পরে মেঘ জমেছে' গানটির প্রথম কলি গীত হবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতার মনে মেঘ-পরিব্যাপ্ত স্নিগ্ধ ছায়া ঘনিয়ে আসে—একটি একাকিত্বের বিরহ আচ্ছন্ন করে। কিন্তু 'মন মোর মেঘের সঙ্গী' গানটির 'মেঘ' সেভাবে আসে না। সেখানে বিরহ নির্জনতা এসব কিছু নেই—আছে উদ্দাম বেগময়তা, প্রকৃতির নৃত্যমুখর আসরের ছন্দদোলা।"

—'রবীন্দ্রসংগীত প্রসঙ্গ' : শৈলজারঞ্জন মজুমদার।

সুতরাং এ-দুটি গানে 'মেঘের' শব্দটির সুরারোপ ভাবের সঙ্গে সংগতি

রেখে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে করা হয়েছে।

কথা ও সুরের সামঞ্জস্যের জন্য রাগ-রাগিণীর শাস্ত্রীয় রূপের পরিবর্তন ও তাদের মিশ্রণের উদাহরণ তো আগেই দেওয়া হয়েছে। এখানে আরো একটি উদাহরণ দেওয়া যাচ্ছে।

চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্যে প্রযুক্ত "ফুল বলে ধন্য আমি" গানটি ইমন কল্যাণ রাগের ওপরে ভিত্তি করে রচিত। কিন্তু সঞ্চারীতে "নয়ন তোমার নত করো" অংশে কোমল ঋষভের ব্যবহার হয়েছে :

II {সা -া ঋ -া ঋা া সা -ন্া I সা -া স্পা -া | ঋা -া সা -া I

ন ০ য় ন্ তো ০ মা র্ ন ০ ত ০ | ক ০ রো ০

কারণ এই অংশে একটি আত্মনিবেদনের ভাব আছে এবং কোমল ঋষভের প্রয়োগে সেই আত্মনিবেদন ও আকুতির ভাব ফোটানো হচ্ছে।

সুরের সঙ্গে গানের বাণীর ধ্বনিরূপের সামঞ্জস্যের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো হাম্বীর রাগে রচিত "তিমির অবগুণ্ঠনে" গানটি। এই গানের 'নদীর জলে ঝঝরি ঝরি ঝরি' বা 'তমালবন মর্মরি মরি মরি' অংশগুলির বাণীর ধ্বনিরূপ ও তার সঙ্গে সংগতি রেখে সুরপ্রয়োগের কথা উল্লেখ করা যায়।

একই রাগকে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন রসের দ্যোতক হিসেবে ব্যবহার করেছেন ও ভৈরবী রাগিণীকে কি-ভাবে তিনি তাঁর গানে বিভিন্ন ভাব ও রস ব্যক্ত করার কাজে ব্যবহার করেছেন তা তাঁর গানে শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা করার সময় বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে।

রবীন্দ্রসংগীতে রাগ-রাগিণীগুলি ততদিনই আলাদাভাবে চিহ্নিত ও উল্লিখিত হয়েছে যতদিন তাঁর সংগীত-সৃষ্টি পরিপূর্ণতায় পৌঁছায়নি—কিন্তু যতই তাঁর সংগীত-সৃষ্টি পরিণতির দিকে এগিয়েছে তখন কোনো সময়েই রাগের প্রয়োগে বা মিশ্রণে শুদ্ধতা ইত্যাদি নিয়ে চিন্তা করেননি ও সেজন্যে পরে তিনি তার গানে রাগ-রাগিণী উল্লেখ করতে চাননি। সামগ্রিকভাবে যে রূপচিন্তা তাঁর মনে এসেছে তাকেই তিনি রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন ও তাতে ইমন-ভৈরব-বেহাগের শুদ্ধরূপ বজায় রইল কিনা তা নিয়ে তিনি মাথা ঘামাননি। তিনি বিভিন্ন শৈলীর সংগীতের, হোক তা রাগভিত্তিক বা লোকসংগীতের আদর্শে গঠিত, যা কিছু তাঁর গানে গ্রহণ করেছিলেন, তাকেই তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারায় ও সংগীততত্ত্বের আলোকে পরিশীলিত করে নিয়েছিলেন এবং সব রীতির গানকেই নিজস্ব প্রতিভার আলোকে এক স্বকীয় রূপ দান করে তাকে রবীন্দ্রসংগীতে পরিণত করেছেন।

এখানে এটা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, রবীন্দ্রসংগীত যতই তার সৃষ্টিতে পরিণতির দিকে এগিয়েছে ততই এর শ্রেণী বা পর্ব-বিভাগ কমে এসেছে। প্রথম ও মধ্য যুগে যেমন এই ধারার গান ব্রহ্ম পূজাসংগীত, ঋতুসংগীত, রাগাশ্রয়ী সংগীত, প্রেমসংগীত ইত্যাদি পর্যায়ে বিভক্ত ছিল, শেষযুগের সংগীত-সৃষ্টিতে সেটা অনেকটা কমে এসেছে, কারণ তখন যা ঋতুসংগীত তাই হয়তো প্রেম-সংগীত ও রাগভিত্তিক সংগীত, আর যা পূজাসংগীত তাই হয়তো প্রেম সংগীত বা রাগাশ্রয়ী গান। তখন সকল পর্ব, বা শ্রেণীবিভাগ এক হয়ে একটা শ্রেণীতেই দাঁড়াচ্ছে এবং তা হলো রবীন্দ্রসংগীত।

আর একটা কথা বলা প্রয়োজন যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে রাগ-রাগিণীর ব্যবহারে তাদের শাস্ত্রীয় রূপের চাইতে রাগ-রাগিণীর ভাবকে করলেন মুখ্য ও তাঁর গান সুরলোকে রূপ থেকে রূপান্তরে বিচরণ করছে রাগ-রাগিণীর রসলোক বা ভাবলোকের ওপর দাঁড়িয়ে। তাঁর গানে ভাব অনুযায়ী স্বরপ্রয়োগ যে রবীন্দ্রনাথ খুব একটা consciously বা সচেতনভাবে ও খুব একটা চেষ্টা করে করেছেন তা মনে হয় না। তাঁর যে স্বাভাবিক সৌন্দর্যবোধ ছিল এবং সুর ও স্বরের ওপর দখল ছিল তার দরুন কাব্যের ভাব অনুযায়ী ধ্বনিগত ভাবে স্বরসমূহ আপনিই এসে তাঁর কাছে ধরা দিত। এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের উক্তি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ : "দিনুকে যখন আমার গান শেখাতুম, তিনি হঠাৎ বলে উঠতেন 'এইখানে কোমল নিষাদ লেগেছে'—আমি অবাক হয়ে বলতুম 'তাই নাকি ?' "

প্রাচীন যুগে ভারতবর্ষের সংগীতের ক্ষেত্রে কলাকার ও শাস্ত্রকার ছিলেন একই ব্যক্তি। অর্থাৎ যিনি সংগীত পরিবেশন করতেন বা সংগীত শিক্ষাদান করতেন তিনিই সংগীতশাস্ত্র রচনা করতেন। এজন্যে সংগীতের ক্রিয়াসিদ্ধ এবং তত্ত্বসিদ্ধ অংশে কোনো গরমিল দেখা দিত না—কিন্তু পরবর্তী যুগে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কলাকার ও শাস্ত্রকার ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি হয়ে পড়েন, ফলে সংগীতশাস্ত্রের সংগে প্রত্যক্ষ গায়ন-বাদন-ক্রিয়ার অসামঞ্জস্য ঘটতে দেখা যায়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে এইটুকু বলা চলে যে সংগীতকার হিসেবে রবীন্দ্রনাথের এই যে অসামান্য সাফল্য তার মূলে একটা ব্যাপার বিশেষভাবে কাজ করেছিল এবং সেটা হলো এই যে, রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি ও সুরকারই ছিলেন না, তিনি নিজে সুগায়কও ছিলেন এবং রবীন্দ্রসংগীতের তত্ত্বের ব্যাপারেও রবীন্দ্রনাথই হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার।

সুরের সাহায্যে ও স্বরসংগতি নিয়ে একটা গানের কাঠামো বা অবয়ব তৈরি করা একজন গায়কের পক্ষে যতটা সহজ, অন্যদের পক্ষে তা নয়। গাইয়ে যখন

সংগীতস্রষ্টা হন তখন সংগীতে সুরারোপ বা গানের গঠন অন্তরের তাগিদে আর সৌন্দর্যবোধ থেকে সৃষ্টি হয়—তখন রাগ-রাগিণীর বিচার হয় না বা সুর-প্রয়োগ বাঁধাধরা শাস্ত্রীয় পদ্ধতির পথে চলে না।

রবীন্দ্রনাথের গানে সুরের প্রয়োগ যে তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করেছে তা সম্ভব হয়েছে তিনি নিজে গাইয়ে ছিলেন বলেই। অন্য সুরকে গ্রহণ বা বর্জন, বিভিন্ন সুর বা রাগ-রাগিণীর মিশ্রণ, কোথাও নানা গায়ন শৈলীকে আত্মস্থ করে তাদের নিজস্ব মৌলিক রূপ দেওয়া—যেমন কীর্তনের কথা ও সুরের সামঞ্জস্যের আদর্শ, ধ্রুপদের ৪ তুকের স্থাপত্য, বাউল গানের আদর্শে জীবনের গভীর তত্ত্বসমূহের সহজ সরল ভাবে নানা রাগের অপরূপ ছোঁয়ায় ব্যক্ত করা রাগ রাগিণীতে মানবমনের নানা অভিব্যক্তি প্রকাশের কাজে ব্যবহার ও শাস্ত্রীয় সংগীতকে তার অলংকরণের আতিশয্য বর্জন করে গ্রহণ—এসবই সম্ভব হয়েছে রবীন্দ্রনাথ নিজে একজন গাইয়ে ছিলেন বলে।

তাছাড়া গানে এই যে স্বর থেকে স্বরান্তরে যাবার কৌশল ও কাব্যের ভাব অনুসারে স্বরপ্রয়োগ যা তাঁর গানে এত বৈচিত্র্য এনে দিয়েছে এবং কথা ও সুরের এত সার্থক ও পরিপূর্ণ মিলন ঘটিয়েছে, তাও সম্ভব হয়েছে ওই একই কারণে। তিনি তাঁর গানে যা কিছু উপাদান গ্রহণ করেছেন তাকেই একটা নিজস্ব রূপ দিয়েছেন। এমনকি বহুযুগ ধরে যেসকল রাগ-রাগিণী তাদের স্বাতন্ত্র্য এবং অনড় রূপ নিয়ে বিরাজ করছিল, সেইসকল সুর-কাঠামো বা সংগীতকেও তিনি তাঁর নিজস্ব চিন্তা ও সৌন্দর্য অনুভূতিতে এক স্বতন্ত্র এবং মৌলিক রূপদান করেছেন। তাঁর গানে যদি রাগ রাগিণীর মিশ্রণ হয়ে থাকে, তবে তা ব্যাকরণ বা শাস্ত্রের নিয়মে হয়নি, তা হয়েছে তাঁর নিজস্ব শিল্পচিন্তা ও সৌন্দর্য-অনুভূতি থেকে।

রবীন্দ্রনাথও বলেছেন: "আমি যে শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে থাকি সে বিশেষভাবে সংগীতশাস্ত্রও নয়, কাব্যশাস্ত্রও নয়, তাকে বলে ললিতকলাশাস্ত্র, সংগীত ও কাব্য দুই তার অন্তর্গত।" তাঁর গানে বাণীর মাধুর্য, বা সুরের মিষ্টত্ব বা ছন্দের বৈচিত্র্য কোনটাই আলাদা ভাবে বিচার্য নয়। সামগ্রিকভাবে তাঁর গান কথা, সুর এবং ছন্দের একত্রীকরণে কতখানি পরিপূর্ণতা ও সার্থকতা লাভ করেছে সেই ধরেই তাদের বিচার করতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ 'ছন্দ' গ্রন্থে বলেছেন: "মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী অতি আশ্চর্য যন্ত্র, সৃষ্টিকর্তা তাদের স্বাতন্ত্র্য ঢেকে দিয়েছেন, দেহ তাহাদেরকে ব্যবহার করে প্রকাশ করে না।

"গানে ছন্দ তাল বাণী সুর উচ্চারণ ভাব ইত্যাদি এক একটি উপকরণ।

সংগীতের চরমরূপের প্রকাশ হয় এই উপকরণসমূহের সুসমন্বয়ে। এর কোনটা যদি বিদ্রোহ ঘোষণা করে যে অন্য উপকরণ সংগে মিলবে না, স্বতন্ত্র থাকবে তাহলে সংগীতের গভীরতম রূপ প্রকাশে বাধার সৃষ্টি হয়।"

—'রবীন্দ্রসংগীত প্রসংগ' : শৈলজারঞ্জন মজুমদার।

আগেই বলা হয়েছে যে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন গায়ন শৈলীর স্বারা প্রভাবান্বিত হলেও তিনি যা কিছু গ্রহণ করেছেন তাকেই একটা নিজস্ব রূপ দিয়েছেন। ভারতীয় সংগীতের ও বাংলাগানের সবরকম গীতরীতি—যথা, ধ্রুপদ খেয়াল টপ্পা কীর্তন বাউল রামপ্রসাদী সারিগান, এমনকি পাশ্চাত্য সংগীতের উপাদানকেও তাঁর গানে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সব কিছু গ্রহণ করেও তাকে একটা নিজস্ব ও মৌলিক সৃষ্টিতে পরিণত করেছিলেন। সেজন্যে এটা স্বচ্ছন্দে বলা চলে যে ভারতীয় সংগীতের সব কিছু উপকরণ গ্রহণ করেও রবীন্দ্রসংগীত ভারতীয় সংগীতের ধারার মধ্যে আর একটি স্বতন্ত্র ও মৌলিক সৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে এবং এই ধারার গানের মধ্যে এমন এক বিশিষ্ট ঢং বা গায়কী গড়ে উঠেছে যে কোনো অজানা রবীন্দ্রসংগীত শুনলেও তার বৈশিষ্ট্যের জন্যে সহজেই চিনে নিতে পারা যায় যে এটি একটি রবীন্দ্রসংগীত। রবীন্দ্রনাথও দিলীপকুমার রায়ের সংগে আলাপ-আলোচনা প্রসংগে বলেছিলেন . "আমার আধুনিক গানকে সংগীতের একটা বিশেষ মহলে বসিয়ে তাকে একটা বিশেষ নাম দাওনা আপত্তি কী?" আর এক জায়গায় নিজস্ব সংগীত-সৃষ্টি সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আমার চিত্তক্ষেত্রে বসন্তের হাওয়ায় শ্রাবণের জলধারার মেঠো ফুল ফোটে, বড়ো-বড়ো বাগানওয়ালাদের কীর্তির সংগে তার তুলনা করোনা"।

কবির এই যে সংগীতের ফুল যা তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে অনন্য, তা কিন্তু তার সৃষ্টির ও সৌরভের উপাদান ভারতীয় মাটী থেকেই গ্রহণ করেছে, বিদেশী কোনো ভূখণ্ড থেকে নয়।

রবীন্দ্রনাথের জীবনব্যাপী সাধনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এই : তিনি সুন্দরকে, মহৎকে আপন আপন গণ্ডী থেকে মুক্ত করে এনে মানুষের নিত্যকার জীবনের সংগে যুক্ত করে দিয়েছেন। তিনি যেমন শিক্ষাকে বইয়ের গণ্ডী থেকে, ধর্ম্মকে শাস্ত্র ও অনুশাসনের গণ্ডী থেকে, রাজনীতিকে বক্তৃতা ও স্লোগানের কচকচি থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন, তেমনি সংগীতকে ওস্তাদী ও কালোয়াতির কবল থেকে মুক্ত করে এনে তাকে মানুষের সহজ জীবনযাত্রার সংগে মিলিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রসংগীতের আমাদের জীবনে এই সর্বাত্মক প্রভাব একজন কৃতী সমালোচক এইভাবে ব্যক্ত করেছেন : "সংস্কৃতির সংগীত বাহনটির ক্ল্যাসিক্যাল ধারাকে সর্বসাধারণের অনধিগম্য করে তাকে যে দরবারী আসন দেওয়া হয়েছিল

রবীন্দ্রনাথ এ যুগে প্রথম তাকে সে অনধিগম্যতা থেকে উদ্ধার করে আমাদের দৈনন্দিন ভালো-লাগা মন্দ-লাগার সঙ্গে যুক্ত করেছেন। প্রেমের অন্তরতম প্রকাশকে মার্গসংগীতের সুরের যোগে গভীরতম করে তুলেছেন। প্রকৃতির নিত্য নৃত্যলীলায় এই সুরগুলির সঙ্গে সমন্বিত করে বিশ্বের সৃষ্টি-মাধুর্যকে নূতনতর ভাষা দিয়েছেন আর ভগবৎপ্রীতিকে সাম্প্রদায়িক গণ্ডী থেকে মুক্তি দিয়ে তার অনন্তরূপটিকে আমাদের চোখে উদ্ভাসিত করে তুলেছেন। রবীন্দ্রসংগীতের এই নূতন সংস্কৃতির জগতে বিদেশী সংগীত অপরিচিত বলে উপেক্ষিত হয়নি।"

—'সুরের গুরু', অমিয় সেন ও নীলিমা সেন।

রবীন্দ্রসংগীতকে কখনো বৈঠকী সংগীতের মতো বিশেষ কোনো এক আনুষ্ঠানিক ব্যাপার যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রক্ষিপ্ত, তা মনে হয় না। রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশনের জন্যে কোনো আয়োজনের প্রয়োজন নেই—একে কণ্ঠে ধারণ করলেই হলো। এই গানকে পথ চলতে কাজ করতে সব সময়ই গাওয়া চলে। মনের এমন কোনো অনুভূতি নেই যা তাঁর গানে স্থান পায়নি ও সে-বিচারে গীতবিতান গ্রন্থকে মানবমনের অভিধান বলা চলে।

কবির গানের ভাবের সঙ্গে আমাদের সহজেই এমন একটা আত্মিক যোগ (integration) হয়ে যায় যে তাঁর গান গাইলে মনে হয় যেন আমাদেরই মনের ভাব তাঁর গানের ভেতর দিয়ে আমরা ব্যক্ত করছি।

গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে কবি বলেছিলেন: "জীবনের আশি বছর অবধি চাষ করেছি অনেক। তবে সব ফসলই যে মরাইতে জমা হবে তা বলতে পারিনে। কিছু ইঁদুরে খাবে, তবু বাকী থাকবে কিছু। জোর করে বলা যায় না। যুগ বদলায়, কাল বদলায়, তার সঙ্গে সব কিছুই বদলায়। তবে সবচেয়ে স্থায়ী হবে আমার গান, এটা জোর করে বলতে পারি। বিশেষ করে বাঙালীর শোকে দুঃখে সুখে আনন্দে আমার গান না গেয়ে তাদের উপায় নেই। যুগে যুগে তাদের এই গান গাইতে হবেই।"

কবিগুরুর এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। আজ রবীন্দ্রসংগীত আমাদের জীবনে এমনভাবে একাত্ম হয়ে মিশে গিয়েছে যে তাকে স্বচ্ছন্দে আজ আমাদের, বাঙালীদের জীবনসংগীত বলা চলে।

পৃথিবীর অন্য কোনো কবি বা সংগীত-রচয়িতার নজীর আমাদের জানা নেই, যার কবিতা বা সংগীত একটা গোটা জাতিকে উদ্বুদ্ধ করে এইভাবে তার জীবন-সংগীতে পরিণত হয়েছে।

আমরা অনেকসময়েই দেখে থাকি যে, কোনো যুগের কোনো এক বিশেষ ধারার গান সেই যুগেই চালু ও জনপ্রিয় থাকে, কিন্তু পরবর্তী যুগে তার

আবেদন ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে আসে। সেইভাবে এককালের বহুল প্রচারিত ও জনপ্রিয় অনেক বাংলা গান আজ শ্রোতাদের দ্বারা পরিত্যক্ত এবং তা আর এখন আমাদের মনকে টানে না। কিন্তু রবীন্দ্রসংগীতের মধ্যে এমন এক অসাধারণ গুণ আছে যা তাকে রচনার পরবর্তী যুগেও সমভাবে আকর্ষণীয় করে রেখেছে ও যা সমকালকে গ্রহণ করেও সমকালোত্তীর্ণ। রবীন্দ্রসংগীতের এই যে বিশেষ গুণ তাকে ক্লাসিক্যাল সাহিত্য, যা যুগে যুগে সমভাবে মানবসমাজকে আনন্দ দিয়ে থাকে, তার সঙ্গেই তুলনা করা চলে।

"ভারতের প্রাচীন সাংগীতিক উত্তরাধিকারকে তিনি সংহত ও সমৃদ্ধ করেছেন, বর্তমানের সাংস্কৃতিক জীবনকে তাঁর সংগীত নূতন উপলব্ধি দিয়েছে—সুদূর ভবিষ্যতের সম্ভাবনাময় জাগতিক মহামিলনের দিকে তাঁর সংগীত প্রসারিত।"

—'সুরের গুরু', অমিয় সেন ও নীলিমা সেন।

—

গ্রন্থপঞ্জী

১ আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ—রাণী চন্দ
২ গীতবিতান—কালানুক্রমিক সূচী (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
৩ গীতবিতান—রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী জয়ন্তী সংখ্যা
—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
৪ গীতসূত্রসার—কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়
৫ ঘরোয়া—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৬ ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ—প্রবোধচন্দ্র সেন
৭ ছিন্নপত্রাবলী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৮ জীবনস্মৃতি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৯ জীবনের ঝরাপাতা—সরলা দেবী
১০ জোড়াসাঁকোর ধারে—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুব
১১ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
১২ নৃত্য—প্রতিমা দেবী
১৩ প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ—অমিয়কুমার সেন
১৪ মংপুতে রবীন্দ্রনাথ—মৈত্রেয়ী দেবী
১৫ রবীন্দ্রকাব্য পরিক্রমা—ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
১৬ রবীন্দ্রজীবন কথা—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
১৭ রবীন্দ্রজীবনী—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
১৮ রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন—প্রমথনাথ বিশী
১৯ রবীন্দ্রনাথ গৃহে ও বিশ্বে—মৈত্রেয়ী দেবী
২০ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—ডঃ সুকুমার সেন
২১ রবীন্দ্রসংগীত—ডঃ প্রিয়ব্রত চৌধুরী
২২ রবীন্দ্রসংগীত—শান্তিদেব ঘোষ
২৩ রবীন্দ্রসংগীত প্রসঙ্গ—প্রফুল্লকুমার দাস
২৪ রবীন্দ্রসংগীত প্রসঙ্গ—শৈলজারঞ্জন মজুমদার
২৫ রবীন্দ্রসংগীতে কাব্য ও সুর—বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও কণিকা
বন্দ্যোপাধ্যায়
২৬ রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীসংগম—ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী
২৭ রবীন্দ্রসংগীতে প্রতিভার দান—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

২৮ রবীন্দ্রসংগীতে স্বরসংগতি ও সুরবৈচিত্র্য—অরুণ ভট্টাচার্য
২৯ রবীন্দ্রসংগীতের ধারা—শুভ গুহঠাকুরতা
৩০ রবীন্দ্রসাহিত্যে পদাবলীর স্থান—ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার
৩১ রবীন্দ্রস্মৃতি—ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী
৩২ সংগীতচিন্তা/রবীন্দ্র রচনাবলী চতুর্দশ খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩৩ সুর ও সংগতি—ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
৩৪ সুরঙ্গমা গবেষণা গ্রন্থমালা (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
—প্রফুল্লকুমার দাস
৩৫ সুরছন্দা পত্রিকা—রামমোহন রায় ও সেকালের সংগীত প্রসংগ
—দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়
৩৬ সুরের গুরু—অমিয়কুমার সেন ও নীলিমা সেন

উল্লিখিত ও আলোচিত গানের তালিকা

নির্দেশিকা

ডঃ দেবজ্যোতি দত্ত মজুমদার

জন্ম ১৯২২, নেত্রকোণা (বাংলাদেশ)। পিতা ৺রমণীকিশোর ছিলেন প্রখ্যাত আইনজীবী। শিক্ষা এম. এ. (ইংরেজি সাহিত্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৫)।

সংগীতচর্চা পড়াশোনার সংগেই চলে। উচ্চাংগ সংগীতে প্রথম পাঠ গৌরীপুররাজ ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর কাছে। পরে যথাক্রমে সংগীতাচার্য নগেন্দ্রনাথ দত্ত, আগ্রা ঘরানার ওস্তাদ বসির খাঁ সাহেব এবং সংগীতরত্নাকর ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছে তালিম নেন।



উচ্চাংগ সংগীতের ঔপপত্তিক শিক্ষা পান সংগীতশাস্ত্রী সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর কাছে। প্রয়াগ সংগীত সমিতি থেকে 'সংগীত প্রভাকর' ডিগ্রী লাভ করেন।

রবীন্দ্রসংগীতে শিক্ষা পান প্রয়াত অনাদিকুমার দস্তিদার ও অগ্রজ শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদারের কাছে।

রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে গবেষণা করে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ. ডি. ডিগ্রী পান ১৯৮১-তে। এই গবেষণাপত্রের পরিমার্জিত রূপ বর্তমান গ্রন্থ।

প্রথম গ্রন্থ 'সংগীত সম্বন্ধ' (১৯৭৭) পণ্ডিত রবিশংকর, বনফুল প্রমুখ গুণিজনের প্রশংসাধন্য এবং সংগীতরসিকমহলে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। সংগীত সম্পর্কে বিভিন্ন সাময়িকপত্রেও অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

১৯৮৬-র আগস্টে বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হয়ে বাংলাদেশ সফরে যান অগ্রজ শৈলজারঞ্জনের সংগে। ঢাকা, ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা ও চট্টগ্রামে নানা অনুষ্ঠান পরিচালনা করে বিপুলভাবে সংবর্ধিত হন।

সংগীতের উপপত্তি ও প্রয়োগ দুদিকেই সমান অধিকারী। উচ্চগানের কলাকার হিসেবেও সুপ্রতিষ্ঠিত।

শাস্ত্রীয় সংগীত ও রবীন্দ্রসংগীত এই দুই ধারার এক দুর্লভ সমন্বয় ঘটেছে তাঁর মধ্যে—যা তাঁকে দিয়েছে বিশেষজ্ঞের মর্যাদা।

কলিকাতার প্রখ্যাত সংগীত প্রতিষ্ঠান 'সুরংগমা'র প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও তার উচ্চাংগ সংগীত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক।